অতসীর লেখা

জওহরীর লেখা

পরিকল্পনা	--	সরোজ আচার্য্য
সম্পাদনা	--	সন্তোষ বসু
সহ-সম্পাদনা	--	শান্তি রায়
রূপ-সম্পাদনা	--	গৌরী ঘোষ



6, COLLEGE SQUARE,
CALCUTTA

প্রকাশক :
শরৎ দাস
মডার্ণ পাবলিশার্স
৬ কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

সাড়ে তিন টাকা

মুদ্রাকর :
কালীপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস
৮ই, ডেকার্স লেন,
কলিকাতা
চিত্রমুদ্রণ ও ব্লক নির্মাণ :
ইণ্ডিয়ান ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং লিঃ
২১৭, কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট্‌
কলিকাতা

আশ্বিন ১৩৫৩

গ্রন্থ বিবরণী

কথারম্ভ

তিনশ বছর আগের কথা। সৃষ্টিরহস্য আলোচনা হচ্ছিল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্বয়ং ভাইস-চান্সেলার ডাঃ লাইটফুট বললেন—ভগবান মানুষ সৃষ্টি করলেন খৃষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে সকাল ন'টায়। আজ একথা শুনলে ছোট ছেলেরাও হাসবে। মাত্র তিনশ বছরে মানুষের মন এত বদলে গেছে। এই শতাব্দীর কথাই বলি। বছর দশবারো আগে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড বলেছিলেন—আণবিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব নয়। অথচ এক বছর আগেই যুদ্ধের দাপটে আণবিক শক্তির ব্যবহারও সম্ভব হল—রাদারফোর্ডের ভবিষ্যদ্বানী হল মিথ্যে। কিন্তু কেন এমন হয়? কেন পাঁচশো বছর আগে ইউরোপে লোক বিশ্বাস করত সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে—আর আজ ঠিক উল্টো কথা বলছে? তার কারণ—মানুষের চিন্তাধারা বদলায়। সমাজ বদলায়। সংগে সংগে মানুষের চিন্তাও বদলায়। আরো সোজা করে বলি কথাটা। মানুষ চিন্তা করে কেন? চিন্তা করে সমাজকে ভাল ভাবে চালাবার জন্য। যখনই পুরোণো চিন্তাধারা চারপাশের দুনিয়াকে বোঝাতে পারে না, তখনই সেই চিন্তাধারা বদলাতে হয়। আজও সেই অবস্থায় পৌঁছেছি আমরা। পুরোণো চিন্তাধারার সোজা সড়ক বেয়ে চলতে গিয়ে পদে পদে খাচ্ছি হোঁচট। এগিয়ে যাবার পথ মিলছে না। বৈজ্ঞানিক বলেন—চার ঘণ্টা পরিশ্রম করলেই সমাজের সমস্ত অভাব দূর হবে। কিন্তু কাজের বেলায় কী দেখছি আমরা? দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করছি অথচ পেট ভরে খেতে পাচ্ছি না। বৈজ্ঞানিক ত' ধাপ্পা দিচ্ছেন না। নিশ্চয়ই কোথাও গোলমাল দেখা দিয়াছে। সে গোলমাল দেখা দিয়াছে আমাদের পুরোণো চিন্তাধারায়। ঠিক এমনি অবস্থা দেখা দিয়েছিল দুশো বছর আগে ফ্রান্সে। সমাজ ভাঙনের দিকে এগিয়ে চলেছিল। পুরোণো চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তাই আন্দোলন দেখা দিল। তাদের নেতা শুধু ডিডেরো প্রভৃতি দার্শনিকরাই ছিলেন না—এই দার্শনিকদের সংগে ছিলেন বণিক, পুঁজিপতি, উকীল, ডাক্তার ইত্যাদি ভদ্র শ্রেণীর লোকেরা। এমন কঠিন সমালোচনা শুরু হল যে সমাজ ব্যবস্থা পালটে গেল, পুরোণো চিন্তাধারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আবার পালাবদলের দিন এসেছে। আজকের সমাজ মানুষের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। সমাজের যারা মালিক তারা ইতিহাসের চাকাকে পিছন দিকে ঘোরাতে চাইছে। এরা আজ ভুলে গেছে যে দুশো বছর আগে এরাই জেহাদ ঘোষণা করেছিল পুরোণো চিন্তাধারার বিরুদ্ধে। এরা সংখ্যায় কম হলেও দুর্বল নয়। শাসন ও শোষণের নানা হাতিয়ার এদের হাতে। খবরের কাগজের মালিক এরা—বই ছাপানো এদের মর্জির ওপর নির্ভর করে। লোকের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে এরা বা এদের ভক্ত—ভণ্ড বুদ্ধিজীবির দল। এদিক দিয়ে হিটলারের জার্মানী ছিল সবার সেরা। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ করা—ফলে যুদ্ধের জয়গানে তারা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। ছেলেদের ঘুমপাড়ানী গল্পেও যুদ্ধের প্রচার শুরু হল। প্রতিদিন মাছি আর মাকড়সার আজগুবী গল্প শোনানো হত ছেলেমেয়েদের। মা শুরু করতেন—"এক

ছিল মাকড়সা আর এক ছিল মাছি। মাছিকে খেয়ে ফেলল মাকড়সা। চড়ুইপাখী শিকার করল মাকড়সাকে। চড়ুইপাখী গেল বাজের পেটে। শিয়াল মারল বাজকে। নেকড়ে বাঘের কবলে পড়ল শিয়াল। নেকড়ে বাঘকে মারল মানুষ।" খোকা প্রশ্ন করে—"মানুষ কেন বাঘকে মারল ?" মা উত্তর দেন— "এই চলে আসছে। যার গায়ের জোর বেশী সেই তুনিয়াকে ভোগ করবে।" এই ভাবে ছোট শিশুর মনও দেওয়া হত বিষিয়ে। অন্যান্য দেশ এতটা না এগোলেও ঠিক পিছিয়ে নেই। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কোথাও নেই বললেই চলে। এই তুঃখেই আইনবিশারদ এগেলস্টোন বলেছেন— আইনের উদ্দেশ্য হল সমাজে যে কোন পরিবর্তনের বাধা সৃষ্টি করা। কিন্তু সত্যিকারের স্বাধীনতা কী করে আসবে ? মানুষ স্বাধীন হয় তখনই যখন তার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নেয় আর সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্য এগিয়ে যায়। যেমন জ্বর যদি হয় তখন মানুষের প্রয়োজন হল চিকিৎসা করা। চিকিৎসা করলে মানুষ জ্বরের হাত থেকে পায় মুক্তি। কাজেই তোমরা পুরোণো চিন্তাধারা বদলানোর প্রয়োজন অনুভব করলেই মুক্তির পথও খুঁজে পাবে।

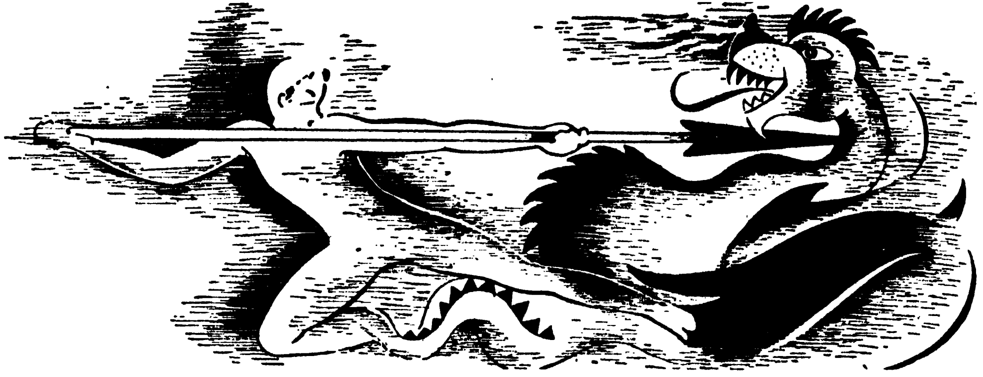
এখন তোমরা প্রশ্ন করবে— আচ্ছা নতুন চিন্তাধারার রূপ কী হবে ? এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়—তবে উত্তরের আভাস দিতে পারা যায়। আজকের সমাজে কোন কিছু করতে গেলেই দেখি সহযোগিতার একান্ত দরকার। অথচ আমাদের সমাজে প্রতিযোগিতার রাজত্ব— ভাইয়ে ভাইয়ে প্রতিযোগিতা, বন্ধুতে বন্ধুতে প্রতিযোগিতা। মানুষের উন্নতির পথও রুদ্ধ। কাজেই নতুন চিন্তাধারায় মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সন্ধান মেলা চাই। তাতে থাকবে পরস্পরকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে বাঁধার মন্ত্র। শুধু তাই নয়—নতুন চিন্তাধারায় বলিষ্ঠ কর্মের প্রেরণা থাকবে। তবেই গড়ে উঠবে নতুন সমাজ—যেমন গড়ে উঠেছে সোভিয়েট রাশিয়ায়। সে সমাজে শোষণ থাকবে না—মানুষের কল্যাণই হবে তার লক্ষ্য। শতাব্দীর লেখায় সেই চিন্তাধারার আভাস দেওয়া হয়েছে। তবে একটা কথা। অতীতকে সরাসরি বাদ দিতে আমি বলছি না। সভ্যতার ইতিহাস বিচিত্র ও জটিল। বর্তমানকে বুঝতে হলে অতীতের সাহায্য নিতে হয়। তাই দরকার ভ্রান্ত ধারণার হাত থেকে মুক্তি। তোমাদের ভ্রান্তধারণার মোহ কাটুক। অতীতের সিড়ি ভেঙে ভাবীকালের প্রাসাদ রচনা কর—শতাব্দীর লেখার উদ্দেশ্য হল তাই।

একটি কথা না বলে পারলাম না। ইচ্ছা ছিল আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা। কিন্তু ১৬ই আগস্ট তাতে বাদ সেধেছে। শয়তানী ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। ফলে আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস আলোচনা সম্ভব হল না। সে আলোচনা না হলে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব—বারান্তরে সে আলোচনা শুরু হবে। আবার বলি তোমাদের মন নির্মোহ হয়ে ভাবীকালের মুক্ত প্রাসাদ রচনা করুক।

সন্তোষ বসু

কিশোর শহীদদের স্মরণে





এ্যাসিলাক ও ড্রাগন

ঠিক কোথায় তা কেউ জানে না এক দেশে এক ড্রাগন এসে দেখা দিয়েছিল। নিজের জমি চাষ করার জন্য সে যত সব চাষীদের ধরে নিয়ে যেতো। ড্রাগনের জমি প্রকাণ্ড বড়—সে জমির আর শেষ নেই।

চাষীদের পাহারা দেবার জন্য ড্রাগন একদল বিশ্বাসী চাকর রেখেছিল। চাকরদের ওপর হুকুম ছিল চাষীদের প্রত্যেককে চোখে চোখে রাখবার। যদি চাষীদের মধ্যে কেউ কাজ করতে না চাইতো কিম্বা অসুস্থ হয়ে পড়তো তাহলে ড্রাগনের চাকররা তাকে সেখানেই মারতে মারতে মেরে ফেলতো।

এইভাবে চাষীরা নিজেদের হাড় দিয়ে ড্রাগনের জমিতে সার দিতো আবার সেই জমিই চাষ করতো।

আজ পর্য্যন্ত হয়তো এমনি ভাবেই চলে আসতো যদি না সেই সময়ে গভীর জঙ্গলের ভেতর সীমাহীন জলাভূমির মাঝে গরীব বাপ মায়ের কুঁড়ে ঘরে এ্যাসিলাকের জন্ম হোত।

এ্যাসিলাক জঙ্গলের বিশাল ওক গাছের মতই বেড়ে উঠতে লাগলো। তার বাবার কাছ থেকে এ্যাসিলাক শয়তান ড্রাগনের হাতে চাষীদের দুর্দ্দশার অনেক গল্প শুনতো।

তাই সে মনে মনে ঠিক করলে যে ক'রেই হোক ড্রাগনটাকে শাস্তি দিয়ে চাষীদের এই দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে আনবে। এই সঙ্কল্প করে সে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলো। তার বাবা তো যাওয়া বন্ধ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন।

তিনি বললেন, "বাবা এ্যাসিলাক, তুমি কোথায় যাবে? এর মধ্যে নিশ্চয়ই তুমি

এমন ক্লান্ত হয়ে পড়োনি যে অকালেই স্যাঁৎস্যাঁতে কবরের মধ্যে বিশ্রাম নিতে চাও। ড্রাগনের খপ্পরে পড়ার জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন?"

এ্যাসিলাক বললো, "আমি আর বসে বসে চাষীদের দুঃখের কথা শুনতে পারছিনা। বাপহারা শিশুদের কান্না আমার অসহ্য লাগছে। আমি ড্রাগনের দাসত্ব থেকে তাদের মুক্ত করতে যাচ্ছি।"

"হাজার হাজার লোককে যে ক্রীতদাস করে রাখতে পেরেছে তুমি একা কি তার সঙ্গে যুদ্ধ করে পেরে উঠবে?"

কিন্তু এ্যাসিলাক অটল। "যতদিন না সেই ড্রাগনটাকে মেরে ফেলা হবে ততদিন পর্য্যন্ত আমরাই বলো, আমাদের ছেলেরাই বলো আর আমাদের নাতিরাই বলো কেউই হেসে খেলে বাঁচতে পারবে না।"

তার বাবা বললেন, "বেশ তোমার যা ইচ্ছে হয় করো। অবশ্য আমিও বুঝি যে এইভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। এই কি চাষীর জীবন!"

তখন এ্যাসিলাক সেই ভয়ঙ্কর ড্রাগনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো।

এ্যাসিলাক অনেক ঘুরলো কিন্তু কোথাও ড্রাগনের দেখা পেলো না। ড্রাগন যেন তার রাজ্য শুদ্ধ কোথায় মিলিয়ে গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে এ্যাসিলাকের সঙ্গে এক বুড়োর দেখা হোলো।

বুড়োটী বেশ বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁগা বাবা, কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে? আমায় দিয়ে তোমার কি কোন কাজ হতে পারে?"

এ্যাসিলাক তাকে সব কথা খুলে বললে।

"ঘুরে ঘুরে আমার পা ভেরে গেলো ঠাকুর্দ্দা! তিন জোড়া জুতো ক্ষয়ে গেল তবু ড্রাগনের দেখা মিললো না।"

বুড়ো বললে, "সোজা পশ্চিম দিকে চলে যাও বাবা—যেতে যেতে একটা প্রকাণ্ড পাথরের দেওয়ালের সামনে গিয়ে পৌঁছাবে। সেই দেওয়ালের পেছনে হচ্ছে ড্রাগনের রাজ্য। কিন্তু একটা কথা শুধু মনে রেখোঃ তুমি যদি ড্রাগনকে হারাতে পারো তবে তার ওপর আর কোনো রকম দয়া দেখিও না। সে তোমাকে অনেক ভালো ভালো জিনিষের লোভ দেখাবে কিন্তু তার কথা বিশ্বাস কোরোনা। সে তোমাকে সোনা রূপোর লোভ দেখাবেঃ কিন্তু সে সোনা রূপো নিওনা। মনে রেখো ওই ধন সম্পত্তির মূলে আছে চাষীদের রক্ত জল করা খাটুনি। যদি তুমি তাকে হারাতে পারো তবে তাকে তার প্রাসাদের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে, তারপর তাকে প্রাসাদের মধ্যে রেখে প্রাসাদের চার ধারে আগুন লাগিয়ে দেবে—ওই প্রাসাদ

মানুষের হাড় দিয়ে তৈরী। সব যখন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তখন ছাইটা নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেবে যাতে ড্রাগনের অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন পর্য্যন্ত না থাকে।"

এ্যাসিলাক বুড়োর উপদেশের জন্য অনেক ধন্যবাদ দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে লক্ষ্য করে চলতে লাগলো। কত গভীর বন, কত কর্দ্দমাক্ত জলাভূমি, কত খরস্রোতা নদী, কত গভীর হ্রদ পার হোলো কিন্তু তবুও ড্রাগনের রাজ্যের দেখা মিললো না। অবশেষে এ্যাসিলাক একটা মস্ত উঁচু দেওয়ালের সামনে এসে হাজির হোলো। দেওয়ালের গায়ে কোন দরজা নেই দেখে এ্যাসিলাক দেওয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু দেওলালের গা এতই মসৃন যে সেটা বেয়ে ওঠাই যায় না। এ্যাসিলাক ঠিক করলে দেওয়ালের চার পাশে ঘুরে সে ভেতরে ঢোকবার পথ বার করবে। কিন্তু তিনদিন তিনরাত্রি ধরে হেঁটেও দেওয়াল শেষ হবার কোন লক্ষণই দেখতে পেল না। তখন এ্যাসিলাকের হোলো ভীষণ রাগ—একটা তিনমণি পাথর না তুলে নিয়ে সজোরে দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারলো। দেওয়ালটা থর থর ক'রে কেঁপে উঠে বালির ঘরের মত ভেঙ্গে পড়লো—কে বলবে সেটা পাথর দিয়ে তৈরী ছিল। এ্যাসিলাক পাথরের স্তূপ টপকে ঢুকতে না ঢুকতে ড্রাগনটা তার দিকে হুহু শব্দে তেড়ে এলো। বাজ পাখী যেমন ক'রে মুরগীকে তাড়া করে তেমনি ক'রে মস্ত বড় হাঁ করে এ্যাসিলাককে গিলে ফেলতে এলো। এ্যাসিলাক তাড়াতাড়ি একমুঠো বালি কুড়িয়ে নিয়ে ড্রাগনের চোখে ছুঁড়ে মারলে। ড্রাগন তো বন্য জন্তুর মত বিকট চীৎকার করতে লাগলো ; তারপর থুতু ফেলতে ফেলতে তার প্রকাণ্ড জিব বের ক'রে দিলে।

এ্যাসিলাক তার জিবটা বেশ ক'রে মুচড়ে না ধরে তাকে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চললো।

ড্রাগনটা তো ভীষণ চীৎকার করতে লাগলো।

এ্যাসিলাক তার জিবটা ছেড়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা ওক গাছ শেকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে তাই দিয়ে ড্রাগনের মাথায় এক ঘা বসালো।

ড্রাগন তখন মানুষের মত গলায় বললে, "এ্যাসিলাক, আমাকে বাঁচাও। তুমি যা চাও তাই দেবো। তুমি যদি চাও তবে আমি তোমাকে আমার অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়ে দেবো আর তোমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সোনা রূপোয় মুড়ে দেবো।"

এ্যাসিলাক হেসে বললে, "আমি তোমার কাছে সোনা রূপোর লোভে আসিনি। চাষীদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দিয়ে এ সোনা তৈরী। আমি এসেছি তোমার নীচ কাজের উপযুক্ত শাস্তি দিতে আর তোমার দাসত্ব বন্ধন থেকে চাষীদের মুক্ত করতে।"

ড্রাগন বলতে যাচ্ছিল যে এ্যাসিলাকের হাতে সমস্ত চাষীদের ছেড়ে দেবে, কিন্তু তার আগেই এ্যাসিলাক এক ঘায়ে তার মাথা গুঁড়িয়ে দিলো।

তারপর সে ড্রাগনের পা ধরে তাকে প্রাসাদের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। ঘরের মাঝখানে তাকে রেখে এ্যাসিলাক প্রাসাদের চারধারে আগুন লাগিয়ে দিলে। আগুন দেখে ড্রাগনের চাকর বাকর ছুটে এসে এ্যাসিলাকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো। এ্যাসিলাক তাদের মধ্যে থেকে সব চেয়ে জোয়ান লোকটাকে বেছে নিয়ে তার পা ধরে এত জোরে ঘোরাতে লাগলো যে মনে হ'লো যেন একটা ধুলোর ঘুর্ণি ঘুরছে।

যখন এ্যাসিলাক ঘুরে তাকালো তখন অন্য চাকরেরা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে—তাদের একজনেরও টিকি দেখা গেল না।

ড্রাগনের প্রাসাদ পুড়ছে দেখে এ্যাসিলাক চাষীদের খুঁজতে গ্রামের ধারে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে চাষীরা ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে আগুনের দিকে তাকাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কি বলা বলি করছে।

তারা বলছে, "ড্রাগন যদি আমাদের দিয়ে নতুন প্রাসাদ তৈরী করায় তবে আমাদের খুব খাটতে হবে। কিন্তু যদি সেও পুড়ে মরে থাকে তাহলে আমাদের বেঁচে থাকা অনেক বেশী সহজ হবে।"

এ্যাসিলাক তাদের দিকে এগিয়ে গেল; কিন্তু তারা এ্যাসিলাককে শয়তান ড্রাগনের নতুন চাকর ভেবে চুপ করে গেল।

"আমাকে দেখে ভয় পেওনা। আমি তোমাদের মতই একজন চাষী। আমার নাম এ্যাসিলাক।"

তাদের মধ্যে একজন বললে, "তার মানে আজ থেকে তোমাকেও সারাজীবন আমাদের মত কষ্ট ভোগ করতে হবে।"

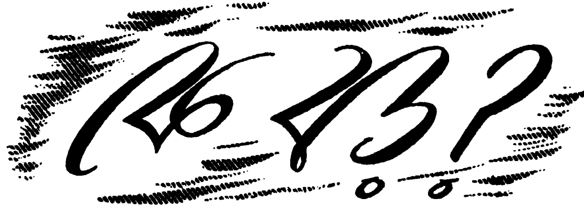
এ্যাসিলাক বললে, "না, না, তোমাদের কষ্টের আজ শেষ হয়েছে। আর ড্রাগনের ভয় কোরো না, আজ তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। এমন কি তার ছাই শুদ্ধ ধোঁয়ার সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেছে। কাজ কর্ম্ম ফেলে রেখে যে যার দেশে ফিরে যাও।"

একথা শুনে চাষীরা তো আনন্দে আত্মহারা। তারা এ্যাসিলাককে বুকে জড়িয়ে ধরলো—তারপর আনন্দের ঝোঁকে নাচ গান করতে লাগলো।

তারপর চাষীরা যে যার গ্রামে ফিরে গেল। এবার তারা মনের আনন্দে চাষ করবে নিজেদের সুখের জন্যে ছেলে মেয়েদের মুখের জন্যে।

আর এ্যাসিলাক গেল অন্য এক দেশে—যেখানে তখনও শয়তান ড্রাগন আর তার চাকররা চাষীদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। এমন দিন আসছে যখন পৃথিবীর সব চাষী পরের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে।

সুপ্রিয়া আচার্য্য



মাওরি কাহিনী

জ্ঞান আর ঐশ্বর্য্য; পথ চলছিল তারা। পথে তুজনের দেখা হ'তে তাদের মধ্যে কে বড়—তাই নিয়ে তুমুল তর্ক বেঁধে গেল।

জ্ঞান বলে 'আমি বড়', ঐশ্বর্য্য বলে 'আমি'। এমনি ভাবে ঝগড়া করতে করতে তারা এক সহরে এসে হাজির হ'ল। এখন হয়েছে কি, সেই সহরে ভারী চোরের উপদ্রব, মানুষ জন সব তটস্থ। রাজার ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া চুরি হয়ে গেল। তাই রাজা ছদ্মবেশে নিজেই বেরিয়ে ছিলেন চোর ধরতে। রাত্রির অন্ধকার চারদিকে, আর তার সাথে শুরু হয়েছিল ঝমঝম করে বৃষ্টি। রাজা তখন এক সাওতাল বাড়ীর দাওয়ায় আশ্রয় নিলেন। সাওতাল বৌ জল ফেলতে বেড়িয়েছিল, রাজাকে অমন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে 'ওগো, চোর এসেছে গো চোর' বলে চীৎকার শুরু করলে। মানুষ জন দৌড়ে এসে রাজাকে ধরে ফেললে আর তাঁকে চোর বলে বেদম প্রহার করতে শুরু ক'রলে। রাজা ব্যথায় চীৎকার করে বলতে থাকলেন, 'আমি চোর নই গো, তোমাদের রাজা'। কিন্তু তার কথায় কেউ বিশ্বাস করলে না। প্রায় আধমরা করে রাজাকে রাস্তায় ফেলে চলে গেল তারা।

এমনি সময় জ্ঞান আর ঐশ্বর্য্য তর্ক ক'রতে ক'রতে যাচ্ছিল সেই পথে। ব্যথায় গোঙাতে দেখে রাজাকে জিজ্ঞেস ক'রলে তারা—"কি হয়েছে তোমার, কে তুমি?" রাজা

বললেন তাঁর দুরবস্থার কথা। ঐশ্বর্য্য শুনে বললে, "তুমিই রাজা, তবে আমাদের তর্কের বিচার করে দাও, ব'লতো ঐশ্বর্য্য বড় না জ্ঞান বড়।"

রাজা বললেন, "দুজনেই বড়"। ঐশ্বর্য্য বলে, "এ কেমন বিচার? আচ্ছা, রাজা, ভাঙ্গা পা যে জোড়া লাগাতে পারবে তাকেই তুমি বড় বলবে কেমন?"

রাজা ঐশ্বর্য্যের প্রস্তাবে রাজী হলেন। তখন ঐশ্বর্য্য করলে কি—অনেক সোনা রূপো দিয়ে রাজার পা জোড়া দিতে বসলো। কিন্তু সোনা রূপোতে পা জোড়া লাগবে কেন?

রাজা ব্যথায় "আহা উহু" করে চীৎকার করে উঠলেন।

এবার জ্ঞানের পালা—সে অনেকগুলো লতাপাতা এনে রাজার পায়ে বেঁধে দিলে আর পা সুন্দর জোড়া লেগে গেল। রাজা জ্ঞানকেই বড় বলে প্রাসাদে ফিরলেন।

ঐশ্বর্য্য কিন্তু এতে হার মানলে না, বললে, "ভাঙ্গা পা জোড়া লাগান এ আর এমন কি।"

আবার সেই পুরানো ঝগড়া। দুজনে পথ ধরে যায় আর তাদের তর্কের মীমাংসা কেউ মেনে নেয় না।

পথে এবার তাদের এক সাওতাল ছেলের সাথে দেখা। না খেতে পেয়ে পেয়ে তার সারা শরীরে হাড় জির জির ক'রছিল। ঐশ্বর্য্য ছেলেটিকে দেখিয়ে জ্ঞানকে বললে—"পার তুমি এর সাথে রাজকন্যার বিয়ে দিতে?"

ঐশ্বর্য্যের এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে জ্ঞান হাসলে। তখন ঐশ্বর্য্য বললে—"আমি পারি সাওতাল ছেলের সাথে রাজকন্যার বিয়ে দিতে। তখন আমাকে বড় বলে মেনে নেবে নিশ্চয়ই"।

জ্ঞান বললে, "আচ্ছা হোক দেখি বিয়ে"।

সাওতাল ছেলেটি গমের চাষ করেছিল। ঐশ্বর্য্য করলে কি—গমের দানাগুলো সব সোনা মুড়ে দিলে।

ছেলেটি বোঝেনি প্রথমে ব্যাপারটা, তাই যেমন তেমন দরে বিক্রী করে দিলে সেই গম বাজারে। ব্যাপারীরা গম কিনে দেখে সব সোনা।

রাজার কানে পৌঁছল সেই খবর। রাজা সাওতাল ছেলেটিকে ডেকে বললেন, "এনে দাও আমাকে তোমার সোনার গম।" ছেলেটি তো শুনে অবাক। ঘরে ফিরে দেখে সত্যিই দানাগুলো সব সোনা।

তাই নিয়ে সে গেল রাজার বাড়ী। রাজা সোনা পেয়ে খুব খুসী। নিজের মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন সাওতাল ছেলেটির।

সাওতাল ছেলে রাজকন্যার সাথে সহরে রাজপ্রাসাদে এসে উঠল।

রাজার বাড়ীর বেজায় জাক-জমক—চারদিক ঝলমল করছে। হলে কি হয়—সাওতাল

ছেলের কিছুতেই মন বসে না। আগের জীবনই তার ছিল ভাল—খুসী মত কাজ করতে পেত সে।

তাই তার দিন রাত উড়ো উড়ো মন। হাত ঘুরিয়ে মুখে কেবল শব্দ করে, 'টাকরুস টুকরুস', যেন সে তাঁত বুনছে। রাজকন্যার মন তাই গেল ভেঙ্গে।

রাজার জামাই সে—কোথায় দরবারে রাজকার্য্য চালাবে আর সে কিনা কেবল ঘরে বসে 'টাকরুস টুকরুস' করছে।

রাজকন্যা মনে মনে ভারী বিরক্ত, এমন বিয়ে না হ'লেই সুখী হ'ত সে।

জ্ঞান তাই ঐশ্বর্য্যকে বললে—"সাওতাল ছেলে রাজকন্যার মনে ধরেনি, আর ধরবেই বা কেন বল, রাজার গুণতো ছেলের নেই।"

জ্ঞান বললে, "আমিই পারি ওর মনে বুদ্ধির সঞ্চার করতে—এ বিষয়ে আমি তোমার থেকে বড়।"

এই বলে জ্ঞান ছেলেটির মনে আশ্রয় নিলে। সাওতাল ছেলেটি তারপর থেকে যেতে শুরু করলে রাজ দরবারে; আর কিছুদিনের মধ্যেই রাজকার্য্যে বেশ কুশলী হয়ে উঠল সে। রাজা তাকে রাজ্যের দেওয়ান করে দিলেন।

রাজকন্যার মনে তাই খুসী ধরেনা। ঐশ্বর্য্যের কিন্তু এতে ভারী হিংসা হ'ল। জ্ঞানের কাছে সে এমন ভাবে ঠকতে রাজী নয়। জ্ঞানকে এই বলে শাসিয়ে গেল, যে সে দেওয়ানকে রাজ্য ছাড়া করে ছাড়বে।

সহরে থাকতেন খুব বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ঐশ্বর্য্য অনেক অনেক সোনা রূপো নিয়ে গেল সেই পণ্ডিতের কাছে। সোনা রূপোর উপহারে খুসী করলে পণ্ডিতকে। দেওয়ানকে রাজ্য ছাড়া করার জন্যে যুক্তি দিলে।

ব্রাহ্মণ তাই রাজ দরবারে এসে হাজির হ'ল। রাজাকে বললে—"মহারাজ, সাওতাল ছেলেকে কন্যা দান করে আর তাকেই রাজ্যের দেওয়ান করে ঘোরতর অধর্ম্ম হয়েছে, ওকে নির্ব্বাসিত করুন।" রাজা বিপদে পড়লেন, বললেন, "ঠাকুর মশায়, তা কেমন করে হবে?"

ব্রাহ্মণ তখন রাজাকে অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে বললে—"মহারাজ ওকে মাকড়সার জালের কাপড় বুনে আনতে বলুন। তাঁত বোনা ওর জাত ব্যবসা, না পারলে ওকে দেবেন মৃত্যুদণ্ড।" এই বলে ব্রাহ্মণ বিদায় নিলে।

রাজা ব্রাহ্মণের কথা ফেলতে পারলেন না।

দেওয়ানকে ডেকে বললেন, "আমার মাকড়সার জালের কাপড় চাই। না আনতে পারলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।"

দেওয়ান রাজার কথা শুনে ভয়ে শুকিয়ে গেল। ঘরে এসে ভাবতে লাগল—কি করে কি হবে। খায় না, ঘুমোয় না, কেবল ভাবে আর ভাবে। কিন্তু দেওয়ানের পুত্রবধূ ছিল ভারী বুদ্ধিমতী। ব্যাপার শুনে দেওয়ানকে বললে, "আপনি ভাববেন না। আমি আনবো আপনার মাকড়সার জালের কাপড়।"

তারপর দেওয়ানকে সাথে করে সে গেল রাজ দরবারে।

রাজার হাতে মাটির একটি হাড়ি দিয়ে মেয়েটি বললে, "মাকড়সার জালের কাপড় চেয়েছেন, আগে ফুঁ দিয়ে দিয়ে বাতাসে ভরে দিন তো হাড়িটা।"

ব্যাপারটা অসম্ভব জেনে রাজা অপ্রস্তুত।

মেয়েটি তখন রাজাকে বললে—"মাকড়সার জালের কাপড় তাহলে আপনি পেতে পারেন না।" রাজা আর কি করেন, বলতে বাধ্য হলেন—কাপড় তাঁর চাই না।

দেওয়ান আশ্বস্ত হয়ে ঘরে ফিরল।

ঐশ্বর্য্য দমবার পাত্র নয়, ব্রাহ্মণকে আবার পাঠালে রাজদরবারে। ব্রাহ্মণ দরবারে এসে বললে—"মহারাজ, সাওতালের কথায় আপনি ভুলবেন না। ওকে বলুনতো ৫ সের মশার হাড় এনে দিতে, দেখবেন এবার আর ফাঁকি দিতে পারবে না বাছাধন।"

রাজা ব্রাহ্মণের কথামত দেওয়ানকে পাঁচসের মশার হাড় এনে দিতে বললেন—না দিতে পারলে প্রাণ দিতে হবে।

দেওয়ানের আবার ভয় আর ভাবনা। পুত্রবধূ রাজার প্রস্তাব শুনে দেওয়ানকে বল্লে—"এ আর এমন কি?"

অনেকগুলো ধানের তুষ বেঁধে নিলে কাপড়ে। তারপর দেওয়ানকে নিয়ে গেল সে রাজ দরবারে।

রাজা তাদের দেখে বললেন—"কই মশার হাড় এনেছ, পাঁচ সেরের কম হলে কিন্তু চলবে না।"

দেওয়ানের পুত্রবধূ তখন বললে—"মহারাজ নিক্তি আনুন, মেপে দি। নিক্তির কাঁটাটি কিন্তু, মহারাজ, বাতাসের হওয়া চাই।"

মহারাজ ভারী মুস্কিলে পড়লেন, কোথায় পাবেন বাতাসের পাল্লা? কিন্তু বলতে তো পারেন না যে বাতাসের পাল্লা রাজার ঘরে নেই।

তাই গম্ভীর ভাবে বললেন—তাঁর মশার হাড়ের দরকার নেই।

দেওয়ান এবারও এমনি ছাড়া পেতে ব্রাহ্মণের ভারী রাগ হ'ল। রাজাকে এসে বললে,—"মহারাজ দেওয়ানকে শাস্তি পেতেই হবে। বাজারে লোকে জলাভাবে খুব কষ্ট পাচ্ছে। দেওয়ানের বাড়ীর পাতকুয়াটা তুলে বাজারে বসিয়ে দেবার আদেশ দিন।"

রাজা তাই আবার দেওয়ানকে এই নোতুন প্রস্তাব জানালেন।

দেওয়ান দেখলে এ যাত্রা আর কিছুতেই রক্ষে নেই, ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। পুত্রবধূ তবু দেওয়ানকে সাহস দেয়, বলে, "আপনি মিছে ভয় করছেন। এবারও মহারাজকে আমি ঠকিয়ে দেব- ঠিক দেখবেন।"

সেই মেয়ে, তার পর করলে কি, গায়ে খুব খানিকটা কাদা মেখে হাতে প্রকাণ্ড দড়ি নিয়ে দেওয়ানের সাথে দরবারে এসে হাজির হ'ল।

রাজা মেয়েটিকে অমন কাদা মাখা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলে—"ব্যাপার কি। অত বড় দড়ি নিয়ে এসেছ কেন?" মেয়েটি বললে,—"মহারাজ, চেষ্টা অনেক করলাম কুঁয়ো খুঁড়ে তুলতে, কিন্তু কি শক্ত, কিছুতেই উঠল না। এখন এক কাজ করুন—এই দড়ির একমাথা বাঁধুন আপনার বাড়ীর কুঁয়োতে আর এক মাথা আমাদের বাড়ীর কুঁয়োতে বাঁধা হবে। আপনারটা যদি তুলে বসান বাজারে আমাদেরটাও উঠে আসবে সাথে সাথে।"

এই বলে মেয়েটি থামলে। রাজা মেয়েটির বুদ্ধি দেখে অবাক হলেন। এমনি বার বার মেয়েটির কাছে হেরে গিয়েও কিন্তু মনে মনে ভারী খুসী হলেন তিনি। দেওয়ানকে বললেন, "এমন বুদ্ধিমতী মেয়ের কাছে আমি হার মানলুম দেওয়ান, আর তোমাকে পরীক্ষা ক'রব না।"

দেওয়ান তারপর সুখে ঘরকন্না ক'রতে লাগল।

*　　*　　*　　*

এদিকে ঐশ্বর্য্যের আর মুখ রইল না, মুখ ভোঁতা ক'রে পথ চলে সে। জ্ঞান বলে—"কি ভাই, ঐশ্বর্য্য, কে বড়?" ঐশ্বর্য্য মিন মিন ক'রে বলে—"তুমিই বড়।"

সন্তোষ গাঙ্গুলী



আজ শনিবার তো! কাল রবিবার। সারাদিন ছুটী, আর আসছে শনিবার পূজো। পূজোর ছুটী তো আরম্ভ হয়ে গেল। তাছাড়া কাল পড়ার বই থেকে সকালে সন্ধ্যায়ও কিছু পড়তে হবে না।

সানু সন্ধ্যাবেলা বই রেখে উঠে পড়ে। বই রেখেই খেতে যেতে হবে। বই গুছিয়ে রাখতে রাখতে সানু ভাবতে থাকে। আগেরবার দাদা আসবার সময় কত কী এনেছিল। এক পাতা টীপ, এতগুলো কাঁচের চুড়ি, ছবির বই আরও সব জিনিষ। আচ্ছা! দাদা কবে আসবে! দাদাটা ভারী দুষ্টু, কতদিন চিঠি দেয় না। ওর ভাবনা হয় না বুঝি? সানুও এবার থেকে দাদাকে আর চিঠি দেবে না—একদম আড়ি আড়ি আড়ি, জন্মের মত আড়ি। হঠাৎ সানুর কান্না পেয়ে যায়। ঝি এসে ডাকে, "সানুদিদি খেতে এসো গো!" সানু খেতে যায়।

খাবার ঘরে যেতেই পিন্টু হাততালি দিয়ে বলে, "এই দিদি জানিস? কাল দাদা আসবে। কাল সকাল হবে না? তারপর রাত্তির, তারপর আমরা ঘুমিয়ে পড়ব। তারপর অনেক অনেক রাত্তিরে দাদা আসবে।"

পিন্টু চোখ বড় বড় করে তাকায়। খাবার ঘরের অনুজ্জল আলোতে ওর ফ্যাকাসে ফরসা রঙটায় লাল আভা পড়ে, অদ্ভুত সুন্দর দেখায় ওকে। মা' বলেন ওর আট বছর বয়স। বাবা

বলেন কিন্তু ওর চেয়েও সান্নু দু বছরের বড়। সান্নু আর পিণ্টুকে সবাই দেখে বুঝতে পারে যে ওরা দুই বোন। মাথার লালচে লালচে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো দুই হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সান্নু মাকে জিজ্ঞেস ক'রে, "হ্যাঁ মা! সত্যি?" মা মাথা নেড়ে জানান সত্যি।

সান্নুর ভারী মজা লাগে। পিণ্টু ওদেরও মজা লাগে খুব। পিণ্টুর জন্যে দাদা ছবির বই আনবে। মণ্টু এবার ক্লাস নাইনে উঠেছে তার জন্য ওয়ার্ড মেকিং খেলা আনবে। কিন্তু সান্নুর জন্যে দাদা আনবে অন্য জিনিষ। দেশবিদেশ থেকে গল্পের ঝুরি। ওদের জন্যে ত পয়সা দিয়ে কিনে আনলেই হল। কিন্তু সান্নু? সান্নুর জন্যে দাদাও আর কিনে আনতে পারেনা—পাবে কোথায়? সেই কোথায় কোলকাতার গংগার পারে যেখানে লুসি গ্রের বাবা মা থাকেন সেখানে যেয়ে তার কথা জিজ্ঞেস করে আসতে হবে। অভিমন্যু ত মারা গেছে। উত্তরাও। ওরা দেবতা হয়ে গেছে কিনা, চাঁদ তাই বালিগঞ্জের লেকের কাছেই পূর্ণিমার রাত্তিরে আসে। দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সত্যি অভিমন্যুটা ভারী দুষ্টু। এখানে একদিনও আসে না। কেন, চাঁদ এখানেও আছে। কতদিন সান্নু জানলার ফাঁক দিয়ে রাত্তির বেলা তাকিয়ে দেখেছে, একদিন ও দেখেনি অভিমন্যুকে।

মা এসে তাড়া দেন, "এই সান্নু তাড়াতাড়ি খা", সান্নু খেতে থাকে তাড়াতাড়ি। পিণ্টু সান্নু সবাই খেয়ে আস্তে আস্তে ঘরে যেয়ে শুয়ে পড়ে। মা এসে লণ্ঠনটা দরজার কাছে রেখে কি যেন সেলাই করতে থাকেন। বাবা গ্রামে রুগী দেখতে গেছেন। যতক্ষণ না ফিরবেন ততক্ষণ মা সেলাই করবেন। মফঃস্বল-সহর এর ভেতরেই সব নিঝুম হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে পাশের রাস্তা দিয়ে দু একটা লোক গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। অন্ধকার রাত্তির, হয় তো ভয় করে ওদের। আর তা ছাড়া এদিকটা সহরের একপ্রান্তে। একটু বাদেই সান্নুর ঘুম ভেঙে যায়। পাশেই পিণ্টুটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। দরজার কাছে আলোটা কমানো রয়েছে। তার ওপরে লম্বা লম্বা সব অদ্ভুত ছায়া। জানলা দিয়ে ওপাশের পুকুরটা সব দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য্য, পুকুরের পারের তালগাছ, রজনীগন্ধার ঝোপ, এমন কী ঐপাশের সাপলাগুলো পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মৃদু মৃদু হাওয়ায় ফুলের কুঁড়িগুলো একটু একটু দুলছে। আচ্ছা ওপারে পুকুর-পাড়ে কে একজন ঘুরে বেড়াচ্ছে না? পরণে মাল-কোছা মেরে কাপড় পরা। কাপড়টা সবুজ রংএর। তার ওপরে হলদে রংএর একটা অদ্ভুত ধরণের জামা, পিছনে তারের জন্যে তূণ বাঁধা। হাতে একটা ধনুক। কে লোকটা? সান্নু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে প্রকাণ্ড গোল একটা চাঁদ উঠেছে। সান্নু অবাক হয়ে যায়—এ কী রকম হল, আজকে তো অমাবস্যা ছিল?

সান্নু তাকিয়ে দেখে আসে পাশে কেউ নেই। পিণ্টুটা ঘুমুচ্ছে। মা ও পাশের ঘরে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে দরজা খুলে সান্নু বেরিয়ে আসে। পিছনে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই।

ঘরের পাশ দিয়ে আমগাছের পেছন দিয়ে ঠাকুরঘরের কাছ দিয়ে এসে দেখে একজন রাজপুত্র পুকুর পাড়ে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাতে ধনুক, কোমরে তলোয়ার, পিঠে তূণ, পায়ে এত বড় এক একটা নাগরা। সানু অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করে, "তুমি কে?" ও উত্তর দেয়···বলে ও অভিমন্যু, উত্তরাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। অভিমন্যু এখন চাঁদের রাজা কিনা তাই উত্তরা এখন সেখানকার রাণী। তা হয়েছে কী, একদিন অভিমন্যু অনেক দূরে অই পূব দিকে যে প্রকাণ্ড তারাটা আছে সেইখানে শিকারে গেছে। মাসের পনেরো দিন অভিমন্যু সেখানে যায় কিনা তাই। আর অই জন্যেই ত মাসের মধ্যে পনের দিন চাঁদ সব সময় দেখা যায় না। রাজা থাকেনা কিনা তাই ওখানকার চাকররাও নিয়মমত আলো জ্বালায় না আর পৃথিবীর লোকরাও নিয়মমত চাঁদের আলো দেখতে পায় না। তা একবার এসে দেখে একটা দৈত্য উত্তরাকে নিয়ে পালিয়েছে। তাই অভিমন্যু ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সানু অভিমন্যুকে বললে, "ওই যে আমাদের বাড়ির পেছনে যে সাহাদের ধানের গোলা আছে না, তার পরে একটা জংগল; তার পরে একটা পোড়ো বাড়ি, সেই বাড়িতে অনেক ভূত থাকে। আমাদের বুড়ি ঝি আছে, সে দেখেছে। তা তুমি ওখানে খোঁজ করে দেখতে পার।" অভিমন্যু খুঁজে দেখতে চলে গেল। বলে গেল ওখানে উত্তরাকে পেলে যাবার সময় সানুকে চাঁদের দেশে নিয়ে যাবে। পুকুরটার ওপাশে যে জংলা জায়গা সেখানে ওরা কেউ যায় না। ওখানে নাকি কত কী বাসা করে থাকে। আর সানু আস্তে আস্তে ওপাশে এগোয়।

খানিকটা এগিয়েছে, এমন সময় হুস হুস করে একটা শব্দে ও চমকে উঠে। সামনে ভাল করে তাকিয়ে দেখে আর ও একজন রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আস্তে আস্তে আকাশ থেকে নেমে এসেছে। সামনে এসে সানুকে জিজ্ঞেস করে, "রক্তগংগার দেশ কোথায় বলতে পার?"···সানু বলে, "রক্তগংগা? রক্তগংগা ত নেই আমাদের এখানে। কালিগংগা আছে, ওই ওপাশটায় ডাইনে খানিকটা গেলেই দেখতে পাবে।" তারপর জিজ্ঞেস করে, "তুমি কে? কোথাকার রাজপুত্র?" রাজপুত্র নিজের পরিচয় দেয়। ও অচিন দেশের রাজপুত্র। ওর মা দুয়োরাণী। ওর সৎ মা একজন রাক্ষুসী। ওকে খেতে চায়, তাই ত চলেছে রক্তগঙ্গার দেশে। সেখানে রাক্ষসদের দেশ আর সেখানে স্ফটিক স্তম্ভে আছে রাক্ষসদের প্রাণ-ভোমরা। সেইটেকে হাত করবার জন্যে রাজপুত্র চলেছে। ওই রাক্ষসী রাণীকে মারতে পারলে দুয়োরাণীর দাসীবৃত্তি ঘুচবে। রাজপুত্র পক্ষীরাজে চড়ে আবার বেরিয়ে যায়। সানু প্রসংশমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

আরও কতলোকের সঙ্গে দেখা হয় ওর। সত্যকাম এক বোঝা কাঠ মাথায় নিয়ে

গুরুগৃহে চলেছে। মণ্টুর সমান হবে অনেকটা দেখতেও প্রায় মণ্টুরই মত। সানুর ইচ্ছে করে দৌড়ে ওর মার কাছে চলে যেতে। সত্যকামের সংগে কত আলাপ হয়, সানু ওকে ওর মার কথা জিজ্ঞেস করে। সত্যকামের মা খুব ভাল। তাঁর নাম জবালা। ওর গুরুর নাম গৌতম। তিনি ওকে খুব ভালবাসেন। আশ্রমের অন্যান্য ছাত্ররা ওর পেছনে লাগতে এলে গুরুদেব ওকে রক্ষা করেন।

তারপর লুসি গ্রের সংগে দেখা হয়। ও একটা আলো নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কী অদ্ভুত লুসির মুখ, ফরসা ধবধবে, একটা ফ্রক পড়া, চুলগুলো কোঁকড়া কোঁকড়া সোনালী রঙএর। সানু জিজ্ঞেস করে, "তুমি কে গো মেয়ে?" "আমি লুসী গ্রে—আমার বাবার কাছে যাচ্ছি—" মেয়েটি উত্তর দেয়। লুসির গায়ের রঙটা কী সুন্দর।

খানিকটা দূর থেকে ভেসে আসছিল একটা করুণ বেহালার সুর। ওই পোড়ো জায়গাটা ছাড়িয়ে ত আগে বুড়ো শিবতলা ছিল। কই এখন ত নেই। ওখানে চারিদিকে ঘেরা একটা বাগান বাড়ী। বাগানের বেড়াটা অনেকটা পূজোর সময় বেনে বাড়ীর যাত্রার আসর যে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয় সে রকম বাঁশের নানা কারুকার্য্য করা। বেড়ার ধার দিয়ে পার্কএর চারপাশে যে রকম গাছ আছে সেই রকম মেহেদী গাছের বেড়া। মাঝখান থেকে চাঁদের আলোর মতই স্নিগ্ধ কিন্তু উজ্জ্বল আলো ভেসে আসছে।

সানু গুটী গুটী এগিয়ে যায়। বাড়ীটার সামনে লতা আর গাছের তোরণ কী সুন্দর দেখতে হয়েছে। সানু অবাক হয়ে যায়। এই রকম লতার তোরণ তো ওই সেই লাটসাহেব না কে যখন এসেছিলেন তখন কোরেছিল ওর বাবা, তারপর ওর বন্ধু লীলার বাবা সবাই গেছল লাট সাহেবকে অভ্যর্থনা করতে। বেশ মনে আছে। ওদের স্কুল ছুটী ছিল। দরজার পরে সুন্দর রাস্তা একটা বাড়ী অবধি গিয়েছে। দুপাশ দিয়ে বাগান। মাঝে মাঝে ওগুলো কী ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকটা ছাগলের মত দেখতে না? সানু "আয় আয়" করে ডাক দিতেই একটা আস্তে এগিয়ে এসে সানুর ফ্রক চাটতে সুরু করে দিল। সানু দেখে সোনার মত ওদের গায়ের রঙ, মাঝে মাঝে কালো কালো বুটি বুটি, শিং দুটো কী সুন্দর নানাভাবে গাছের ডালের মত এঁকে বেঁকে উঠে গেছে। সানু চিনতে পারে না এ কী জন্তু। কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়ে যায় ওর কালো কালো টানা টানা চোখের দিকে। তখন বুঝতে পারল ওরা হরিণ, সেই যে ছবি দেখেছে বইএ, কণ্ব মুনির আশ্রমে হরিণ শকুন্তলার সংগে ভাব করছে ঠিক সেই রকম দেখতে হরিণটা।

সানু এগিয়ে যায়। দেখে একটা কুঁড়ে ঘরের বারান্দায় সাদা দাড়ীওলা একজন ভদ্রলোক বসে রয়েছেন আর তার সামনে দুটী ছেলে বেহালা বাজিয়ে গান করছে। কী সুন্দর

দেখতে ছেলে দুটীকে। আর ওই বুড়ো ভদ্রলোককে দেখতে ঠিক যাত্রাদলের বাল্মীকি ঋষির মত।

এইবার সানুর মনে পড়ে যায়—তাই ত ওরা দুজন লব-কুশ আর উনি—উনি নিশ্চয়ই বাল্মীকি মুনি। সানু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের গান শোনে। আশ্চর্য্য ত ছেলে দুটী প্রায় ওর সমানই হবে কিন্তু কী সুন্দর গান গাইতে পারে। আর ও একটুও পারে না। সেবারে প্রাইজের সময়ে থিয়েটারে ওকে গান গাইতে বলেছিল। কত শিখিয়ে পড়িয়ে তবু ও একখানা গানই ভাল করে গাইতে পারল না। এরা এতক্ষণ ধরে গান গেয়ে চলেছে। আর বেহালার বাজনা আরও সুন্দর। ওদের বাড়ীতে যে রেকর্ড আছে তার চেয়েও সুন্দর।

অনেকক্ষণ বাদে গান থামলে বাল্মীকি বলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ? সানু বলে, "আমি? আমি যে সেনেদের বাড়ীর মেয়ে গো? ওই ত ওখানে আমাদের বাড়ী।" পরে বলে, "আমি আপনাকে চিনি, আপনি ত বাল্মীকি না? আর ওরা লবকুশ তাই না!" মুনি মাথা নেড়ে জানায়, "হ্যাঁ"। "আচ্ছা কে লব কে কুশ চিনতে পারছি না যে, বলে দিন না"—সানু বাল্মীকি মুনিকে বলে। মুনি বলেন, "ডাইনের জন লব আর বাঁয়ে কুশ। ওরা রামায়ণ গান করছে।" সানু তাকিয়ে দেখে ওদের দেখতে ঠিক এক রকম।

একটু সময়েই ওদের সংগে ভাব হয়ে যায় সানুর। ওরা কত গল্প করে। লবের আর কুশের দুজনের দুটো হরিণ আছে। খুব সুন্দর। সেই দুটো ওরা সানুকে দেখালো। তারপর ওকে বেহালা শেখাবে বললে। সানু ভাবছে কি মজা! বাবাও জানে না মাও জানে না যে ওরা এখানে থাকে। ও যখন একদিন বেহালা বাজানো শিখে মাকে শোনাবে মা অবাক হয়ে চেয়ে থাকবেন। এর ভেতরেই সানু একটু একটু শিখে ফেলে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা লবকুশদের ঘরে এসে পড়ে। সেখানে দেখে লবকুশের মা সীতা দেবী বসে আছেন। সানু অবাক হয়ে দেখে সীতা দেবীকে দেখতে ঠিক মার মত। মা যখন দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর সেলাই করতে বসেন ঠিক এই রকম দেখতে হয়। সীতা দেবী ওকে কত আদর করেন। ওকে লবকুশদের সংগে থাকতে বলেন। কিন্তু হঠাৎ সানুর কেমন ভয় ভয় করে। লবকুশদেরও এখানে মা আছে কিন্তু ওর, ওর ত মা নেই। এখানে ও কী করে থাকবে! ও লবকুশকে বলে, "না, আমি কি করে থাকব? আমার ত মা নেই এখানে। আমাকে একটা হরিণ দেবে। আমি নিয়ে যেতে চাই।" লব বলে, "হরিণ? আমাদের অনেক আছে নেবে? আচ্ছা দাঁড়াও আমি এনে দিচ্ছি। এইখেনটায় দাঁড়াও, যেও না কিন্তু।" সানু দাঁড়িয়ে থাকে। লব একদিকে আর কুশ একদিকে চলে যায়।

অনেকক্ষণ থাকতে থাকতে হঠাৎ সানু দেখে কী রকম ফর্সা হয়ে যাচ্ছে পুব দিকের

আকাশ। তাইত যদি মা রাগ করেন। সানু সীতাদেবীকে বলে, "আমি যাই এ্যাঁ? ফর্সা হয়ে গেলে মা আমাকে না দেখলে রাগ করবেন যে!" বলেই সানু দৌড়তে থাকে।

পোড়ো জায়গাটা ছাড়িয়ে বুড়ো শিবতলা পার হয়ে জংগলা জায়গাটায় এসে দেখে পুকুর পাড়ে কারা যেন দুজন দাঁড়িয়ে আছেন না? আরও কাছে এসে দেখে একজন অভিমন্যু, ও চেনে, কিন্তু আর একজন? ও মেয়েটী কে? মণিদিদির মত দেখতে? ও নিশ্চয়ই উত্তরা। সানুর খুব মজা লাগে উত্তরাকে নিয়ে যেতে পারেনি দত্যিটা। সানু দৌড়ে চলে যায় অভিমন্যুর কাছে বলে, "ওকে কোথায় পেলে?" "ও তো ওই পোড়ো জায়গাটায় ছিল। দত্যিটা নিয়ে গিয়েছিল। দত্যিটাকে মেরে ওখানে রেখে এসেছি আর ওকে নিয়ে এসেছি। তোমার জন্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, তোমাকেত আমাদের ওখানে নিয়ে যাবার কথা ছিল না? চল—যাবে ত?" "কিন্তু, কিন্তু মা বকবে যে। আজকে তোমরা যাও। আমি মাকে জিজ্ঞেস করে কাল যাব তোমাদের সংগে। কাল এসো কিন্তু!"—সানু বলে। অভিমন্যু রাজি হয়ে যায়। সানু তাকিয়ে দেখে চাঁদটা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে।

পরদিন সন্ধ্যায় গভীর পরামর্শ হয় দুই বোনে। পিণ্টু বিশ্বাস করতে চায়নি সানুর কথা। কিন্তু যখন ও শুনলে দাদারও দেখা হয়েছে অভিমন্যুর সাথে, লুসি গ্রের সাথে, লবকুশের সাথে, তখন আর না বিশ্বাস করার কী কারণ থাকতে পারে?

পিণ্টু বলে, "মা যখন ঘুমুবে না তখন আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে আসব কেমন। আমাকে কিন্তু লবকুশের ওখানে নিয়ে যেতে হবে। আমি একটা হরিণ আনব, বেহালা বাজান শিখব, কী মজা হবে।" পিণ্টু আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠে।

কিন্তু সানুর বয়েস হয়েছে। ও ভাবছিল মাকে না বলে গেলে মা যদি রাগ করেন। আবার ত ফিরে আসতে হবে। তখন? তখন কী হবে? তাই বলে, "আচ্ছা মাকে বলে দেখলে হয় না? তাছাড়া মা যে রাগ করবে?"

কিন্তু পিণ্টুর মত হয় না। ও জানে বড়রা বড্ড বোকা ওরা কিছুই বোঝেনা। এই সেদিন রাত্তিরে ও স্পষ্ট দেখেছে ওর পুতুল হেঁটে বেড়াচ্ছে কিন্তু মা বিশ্বাস করতেই চাইলেন না। সুতরাং এ জিনিষ যে বিশ্বাস করবে তারই নিশ্চয়তা কী?

একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায় সানুর। ও বলে ওঠে, "ঐযে দত্যিটা উত্তরাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল না; তাকে ত অভিমন্যু মেরে ফেলেছে? মেরে ওখানেই রেখে

এসেছে। সেটাকে দেখে এলে হয় না? আচ্ছা দাদা এলে দাদাকে বললেই সব ব্যবস্থা হবে। দাদা ত আজকেই আসবে।" দরজায় চটির শব্দ শোনা যায়। সুনীলবাবু ঘরে ঢোকেন।

সুনীলবাবু ডাক্তার মানুষ—ডাক্তারী করে খান। কিন্তু ডাক্তারী করে খাওয়া পর্য্যন্তই হয়, তার বেশী কিছুই হয়না। ছেলে মেয়েকে খাইয়ে পড়িয়ে কোনদিনই ওঁর কিছু থাকেনি। পূর্ব্বজীবনের আদর্শবাদের ফলে আজ সুনীলবাবু মফঃস্বলের ডাক্তার। দু তিনটে স্কুল আর বিচারালয় এখানে আছে তাই লোকে আদর করে একে সহর বলে। আসলে কিন্তু গ্রাম বললেই মানায় ভাল। অথচ ওর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট মেধার ছেলে যারা ওঁর বন্ধু ছিল তারা মহানগরীতে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হতে চলেছে। আদর্শবাদ ও কল্পনাবিলাসের পরিনতি ত এই।

এখন উনি চান ওর সন্তানেরা বাস্তববাদী হয়ে উঠুক। সব জিনিষ মনের রঙে রঙীন না দেখে সাদা চোখে দেখতে শিখুক। এখন এই বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে সানুর কথা শুনে ওঁর একটু কৌতুহল হোলো।

ঘরে এসে আগাগোড়া শুনে তিনি ওদের বোঝালেন স্বপ্ন জিনিষটা কী, অন্তঃমন কাকে বলে, স্বপ্নের উৎপত্তি কোথায় ইত্যাদি। সানু এইটুকুন মেয়ে···আশ্চর্য্য সব বুঝে ফেললে—অত গভীর তত্ত্ব বুঝতে কষ্ট হোলোনা একটুও।

কিন্তু গোড়ায় গলদ। সানু ত কাল রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেনি। ও দেখেছে নিজের চোখে আর তার সাক্ষী আছে দাদা। দাদা ও কোলকাতার লেকের পাড়ে চাঁদনী রাতে অভিমন্যু আর উত্তরাকে দেখেছে। দাদার সংগে ত সত্যকামের রীতিমতো ভাবই আছে। আর সানু দেখেছে তাই স্বপ্ন হয়ে যাবে? সানুর চোখদুটো জলে ভরে উঠতে থাকে।

এর পরে ফলটা হোল অতি সংক্ষেপ। সুনীলবাবু সানুকে নিয়ে দেখালেন পোড়ো বাড়ীতে মরা দৈত্যের ধড় পড়ে নেই। বাল্মীকি মুনির আশ্রম কেন কোন বৈরাগীর আখড়া পর্য্যন্ত আশে পাশে নেই। রীতিমত বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্দেহ ভজন। ওঁর দুটো "কল" ফস্কে গেল।

কিন্তু তবু সানু পিণ্টুর ভেতরে জল্পনা কল্পনা চলে। কী করে ওরা যাবে রাত্তির বেলা, কী করে দেখা করবে সেই সত্যকাম, সেই লবকুশ সবার সঙ্গে। সানু চোখ বড় করে গল্প করে লবের হরিণটা কী সুন্দর। এত বড় টানা টানা চোখ দুটো। গায়ের রঙ চকচকে সোনার মত। মাঝে মাঝে সুন্দর ছোট ছোট ফুটকি। আর সব চেয়ে সুন্দর হরিণদের চাউনি। অদ্ভুত জিনিষ। হঠাৎ বাবার ডাকে ওদের গল্প থেমে যায়। এরপর

সুনীলবাবু আর না শাসন করে থাকতে পারেন না। উনি হয়ত সব সইতে পারেন কিন্তু পারেন না শুধু মিথ্যে কথা আর অবাধ্যতা সইতে। তাই শাসন হ্যাঁ, একটু কড়া শাসনই দরকার বই কী ? এতটুকুন বয়েস থেকে এত মিথ্যে কথা ভাল নয়।

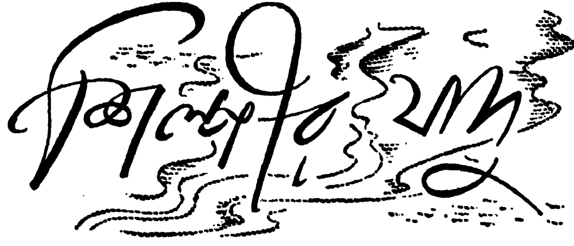
অনেক রাত হয়েছে। চাঁদ ডুবে গেছে অনেক আগে। সান্নু তেমনি ঘুমুচ্ছে আগের দিনের মত। চোখে মুখে অশ্রুর দাগ। সত্যি সান্নু ভারী কষ্ট পেয়েছে মনে যখন ওর বাবা ওকে মেরেছেন। বাবা! বাবা ত বড় একটা ওর গায়ে হাত দেন না। আর ওর কথা পিন্টু পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারল, বাবা পারলেন না। সেই জন্যেই কান্না ওর বড্ড বেশীই পেয়েছিল।

মাঝ রাত্তিরে আবার ঘুম ভেঙে যায় সান্নুর। চোখ মেলতে যায় কিন্তু আবার বন্ধ করতে হয়। টর্চ্চের আলো বড্ড জোর চোখে এসে পড়েছে। সান্নুর মনে পড়ে আজ ত অভিমন্যুর আসার কথা ছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে ত চাঁদের আলো থাকে। সে কেমন সুন্দর আলো। চোখ জুড়িয়ে যায়। এত লাগে না চোখে, সান্নু সমস্যায় পড়ে।

কষ্টে চোখ খুলে সান্নু দেখে সাদা একটা পুতুল হাতে করে দাদা দাঁড়িয়ে আছে। দাদা বলেন, "অভিমন্যুর সংগে দেখা হয়েছিল। সে তোকে এইটে পাঠিয়ে দিয়েছে। চাঁদের জিনিষ কিনা তাই একদম সাদা।" সান্নু তাকিয়ে দেখে পুতুলটী একটি মেয়ের নৃত্যরতা মূর্ত্তি। আশ্চর্য্য,দেখতে অনেকটা সেই উত্তরার মত।

সান্নু হঠাৎ আঙ্গুল কামড়িয়ে ধরে। ভীষণ ব্যথা লাগে। দাদা জিজ্ঞেস করে, "ও কী করছিস ?" সান্নু বলে, "স্বপ্ন কিনা দেখছি। সত্যি দাদা এ একদম সত্যি, স্বপ্ন নয়, না ?"

শত্রুজিৎ দাসগুপ্ত



সে অনেকদিন আগেকার কথা।

এক গাঁয়ে একঘর চাষী বাস করত। তারা ছিল খুব গরীব। একে গরীব, তায় আবার অনেকগুলি ছেলে মেয়ে, অতি কষ্টেই তাদের দিন কাটত। সমস্ত দিন জলে ভিজে রোদে পুড়ে চাষী ক্ষেতের কাজ করত, চাষী-বৌ সংসারের নানান্ ঝঞ্ঝাটের মধ্যে অবসর পেলেই চরকা কাটত, গঞ্জের হাটে বিক্রীর জন্যে খেজুর পাতা দিয়ে সুন্দর সুন্দর টুকরী বুনত, তার উপর লাল নীল হলদে রঙ্ দিয়ে কতরকম লতাপাতা আঁকত। চাষী খাটত, চাষীর বৌ খাটত, ছেলে মেয়েরাও যে যতটুকু পারে কাজ করত—কেউ বাপের জন্যে মাঠে খাবার নিয়ে যেত, আদাড়-বাদাড় থেকে কাঠকুটো সংগ্রহ করে আনত, ছোটরাও মায়ের ফাই ফরমাস খাটত, মায়ের রান্নাঘরের জলের ঘটিটা এগিয়ে দিত, বাঁটনা বাটত, তরকারী কুটত। বাড়ীর সক্কলেই কাজ করত, শুধু একটি ছেলে ছাড়া। বেচারা ছিল রোগা, প্রায়ই রোগে ভুগত। আর সবাই কাজ করত, সে দাওয়ায় এসে চুপ করে বসে বসে দেখত—সকালের সোনালি রোদ, ধান ক্ষেতের বুকে সবুজের ঢেউ তুলে লুটোপুটি খাচ্ছে, ধানগাছগুলোর সর্ব্বাঙ্গ যেন পুলকে কাঁটা দিয়ে উঠছে। ছেলেটা দেখত, আর তার ইচ্ছে হত, ধানগাছ হয়ে সেও রোদ্দুরের সঙ্গে অমনি করে খেলা করে। সকাল দুপুর সন্ধ্যে সব বেলাতেই সে আকাশের নীলিমাতে চোখ ডুবিয়ে আপন মনে বসে থাকত—কোন্ অজানা দেশের রূপকথা বলে আকাশটা তাকে ভুলিয়ে রাখত, কে জানে? তাকে ও-রকম ভাবে বসে থাকতে দেখে লোকে বলত, আহা, চাষীদের এই ছেলেটা কেমন যেন হাবা। শীতকালে তাদের বাড়ীর সুমুখে দেওদার গাছগুলোর পাতা ঝরে যেত; ছেলেটা রাস্তার লোককে ডেকে গাছগুলোকে দেখিয়ে বলত, দেখ দেখ, গাছটা আকাশের আলোর জন্যে কেমন আকুলি বিকুলি করছে—ওপর বাগে হাত তুলেছে। ওসব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার মত তাদের সময় কই? তারা নিজেদের কাজে চলে যেত, যেতে যেতে ভাবত, ছেলেটা বেশ! মাথাটার বোধ হয় একটু গোলমাল আছে।

কষ্টের সংসার, ছেলেটাকে নিয়ে চাষীর ভাবনার অন্ত ছিল না, কোনো কাজের হ'ল না ওটা! মাঝে-মাঝে চাষীর মনে হ'ত, দিই ওকে মোহান্তজীর মঠে ভরতি করে—কোনো শক্ত খাটুনির কাজ

নেই, সেখানে খাবে-দাবে, রাজার হালে থাকবে। কেবল, ছেলেটা তখন আর তাদের থাকবে না—তাদের বংশের একেবারে বাইরে হয়ে যাবে। মনের কথাটা তার বৌ-এর কাছে মুখ ফুটে বলতে পারত না,—তার আবার ঐ ছেলেটার ওপরই বেশী টান।

সেবার ফসল ভাল হল না। সারাটা বছর কি করে চলবে, এই ভাবনাতে রাত্রে চাষীর ঘুম হ'ত না। একদিন রাত্রে, অনেক উস্‌খুস্‌ ক'রে কথাটা সে বৌ-এর কাছে পেড়ে ফেলল, ওকে মোহান্তজীর……। চাষী-বৌ সহজেই রাজী হয়ে গেল; সেও কিছুদিন থেকে সেই কথাই ভাবছিল।

তাদের গাঁ থেকে পাকা চার ক্রোশ দূরে মঠ। পরের দিন ভোর থাকতে, চাষী আর চাষী-বৌ ছেলেটাকে নিয়ে পথে বেরুল; ছেলেটা জিজ্ঞেস্‌ করলে, কোথা যাবো আমরা? তার মা-বাবা কোন উত্তর দিলে না। তাদের মনমরা দেখে সেও কেমন ঘাবড়ে গেল। বাড়ীর বার হতেই তাদের হুলো বেড়ালটা তাকে দেখে গোঁফ ফুলিয়ে 'ম্যাও' করে উঠল; তার পরেই আবার একটু চোখ পিট্‌পিট্‌ করে চেয়ে, ফিক্‌ করে মুচকি হেসে পাশ কেটে এক দৌড় মারল।

ছেলেটাকে মোহান্তজীর কাছে গছিয়ে দিয়ে চাষী আর চাষী-বৌ চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ী ফিরল, বিদায় নেওয়ার সময় ছেলেটাকে বারে বারে বলে গেল, মোহান্তজীর কথা মত চোলো। ছেলেটা শুধু ড্যাব্‌ ড্যাব্‌ করে চেয়ে রইল।

মঠে রয়ে গেল সে। বাড়ীর জন্যে তার ভারি মন কেমন করত প্রথমটায়। কতো দূর দূর গাঁ থেকে লোক আসত ঐ মঠে, ছোট ছেলেমেয়েও থাকত তাদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে ভাব করে নিজের বাড়ীর গল্প করত সে। ছেলেমানুষ তো, দু'চার দিনের মধ্যেই সে তার পুরোনো দিনের কথা ভুলতে লাগল; অন্য ছেলেদের কাছ হতে শোনা গল্প অনেক সময় নিজের বলে চালিয়ে দিত, তখন নিজেও সেগুলোকে সত্যি বলে বিশ্বাস করত।

মোহান্তজী তাকে রীতিমত দীক্ষিত করে নিলেন, তাকে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। সাতদিনের পড়া ও একদিনে শিখে নিত, এমনি ছিল তার বুদ্ধি। মোহান্তজীর কাছ থেকে শেখা পুরাণের গল্পগুলো সে এত সুন্দর করে বলত যে, মোহান্তজী নিজেই অবাক্‌ হয়ে যেতেন; ওর গল্পে দেব-দেবীরা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠত।

শিষ্যের মেধা দেখে মোহান্তজী খুব খুশী হলেন, পুরাণের গল্প ছেড়ে শাস্ত্রের তত্ত্ব শেখাতে লাগলেন। সেটা কিন্তু ছেলেটির ভালো লাগল না,—কি জানি কেন, হঠাৎ তার বাতিক জাগল, বিড়াল আঁকার। মঠের দেওয়ালে একটার পর একটা বিড়াল আঁকতে সুরু করল সে,—হঠাৎ দেখলে মনে হত, যেন জ্যান্ত বিড়াল। গোঁফ ফুলিয়ে 'ম্যাও' করছে।

ছেলেটার আঁকা বিড়াল দেখে মোহান্তজী প্রথম প্রথম ভারি খুশী হয়ে ছিলেন, কিন্তু

বিড়ালে বিড়ালে মঠের দেওয়াল-গুলো যখন ভরে উঠল তিনি তখন বিরক্ত হলেন। ছেলেটিকে ডেকে তিনি বলে দিলেন, আর বিড়াল এঁকো না।

খুব শান্ত শিষ্ট ছেলে ছিল সে—বাড়ীতে থাকলে কখনও মা-বাপের অবাধ্য হ'ত না। মঠে এসে পর্য্যন্ত মোহান্তজীর সকল কথাই সে মেনে এসেছে, তবু বিড়াল-আঁকা তার বন্ধ হল না। মোহান্তজীর কথা মত সে সময়মত শাস্ত্রের পুঁথি খুলে পড়তে বস্‌ত, পড়া কিন্তু হত না, পুঁথির পাশে পাশে সে বিড়ালের মুখ আঁকত—গোঁফ ফোলা হুলো বিড়ালের মুখ।

একদিন মোহান্তজী পাঠ নিচ্ছেন। পুঁথিটা হাতে নিয়ে দেখেন—তার পাতায় পাতায় বিড়াল আঁকা। ছেলেটিকে তিনি ভালো বাসতেন খুবই, কিন্তু তার মনে হল, ওর ঘাড়ে বোধ হয় কোনো বিড়ালের ভূত চেপেছে, নইলে শুধুই বিড়াল আঁকে কেন? মঠের ছেলেকে ভূতে-পাওয়া!—এতে যে মঠের দুর্নাম, লোকে শুনলে বলবে কি? সেদিন রাত্রেই তিনি ছেলেটাকে চুপি চুপি বাড়ী ফিরে যেতে বললেন। নিজে সঙ্গে নিয়ে প্রথম চৌমাথা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। ফিরবার সময় ভারী গলায় বলে দিলেন, তোমায় দুটো মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি বাবা, কখ্‌খনো ভুলো না,—মেনে চোলো :—

ঘরের ভেতর ঘর,
হোথায় শয্যা কর—এই হ'ল একটা, আর একটা হচ্ছে :—
পাহারা দেবে কে?
রাত-জাগুনে যে।

ছেলেটা কিছুই বুঝ্‌ল না। তার মনে হচ্ছিল, সে যেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। মন্ত্র দুটোর কোনো মানেই সে বুঝল না, তবু তার মনে গেঁথে গেল। মোহান্তজীর গলা কান্নায়-ভিজে, সেই ভারি গলাতে সুর করে বলা শোলোক—তার নিজের অজানা ভবিষ্যৎ আর রাত্রির থম্‌থমে অন্ধকার—এই সব মিলে তার চারপাশে একটা কুয়াসা ঘনিয়ে তুলেছিল।

চৌমাথা থেকে মোহান্তজী ফিরলেন। ছেলেটা সেইখানেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল : কোথায় যাবে সে? মোহান্তজীর অবাধ্য হয়েছে সে, মা বাবা একথা শুনলে তাকে ক্ষমা করবে না; বাড়ী সে যাবে না। যাবে কোথায়? যে দিকে চোখ যায়, সে চলতে লাগ্‌ল। খানিকদূর যেতে-না-যেতে তার মনে হল, রাস্তায় যেন ঘাস গজিয়েছে। তার খেয়াল হ'ল এ পর্য্যন্ত সে একটাও মানুষ বা পশু দেখে নি। সে ভাবল, রাত্রি হয়তো বেশী হয়েছে তাই।

যেতে যেতে তার পা ধরে গেল, খুব খিধেও পেল। ঘর-বাড়ী কোথাও চোখে পড়ল না। হাঁটতে যখন আর পারে না, রাস্তার পাশে কোনোখানে শুয়ে পড়ার কথা ভাবছে, তখন পূব আকাশে চাঁদ উঠল, চাঁদের আলোয় তার চোখে পড়ল ডানদিকে একটা পাহাড়ের উপর

প্রকাণ্ড এক মঠ। কিন্তু একটাও আলো দেখা গেল না। সব মঠেই তো সারারাত্রি আলো জ্বলে, এ আবার কেমন মঠ?

সে সাহস করে মঠের দরজায় এসে ঘা দিল, কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অনেক ডাকাডাকি করে ফিরে আসবে এমন সময় একটা দম্‌কা হাওয়া এসে দরজা ফাঁক করে দিল। দরজা খোলাই ছিল, ভারী বলে এতক্ষণ খোলে নি। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ছেলেটি দেখল, ভিতরে কেউ আছে কি না। ভিতরে আলো ছিল না, জ্যোৎস্নার আলো ভিতরে যেটুকু যাচ্ছিল, তাতে ভাল করে কিছুই ঠাহর করা গেল না।

প্রকাণ্ড মঠ—একটাও আলো নাই—জনমনিষ্যি নাই; বাইরে চাঁদের আলোয় গাছপালা ঝলমল করছে। ছেলেটির ভারি একা-একা মনে হতে লাগল। বিড়াল আঁকার বাতিক হওয়ার পর থেকে তার সঙ্গে এক টুকরো কাঠকয়লা সব সময়েই থাকত। খোলা দরজা দিয়ে বাঁ-পাশের দেওয়ালে রূপোলি জ্যোৎস্না পড়েছিল। মসৃণ পাথরের দেওয়াল চমৎকার চক্‌চক্ করছিল। ট্যাঁক থেকে কাঠকয়লা বার করে ছেলেটি তন্ময় হয়ে তার উপর মস্ত মস্ত বিড়াল আঁকতে সুরু করল—ইয়া ইয়া গোঁফ, চোখ দুটো দুষ্টুমিতে ভরা।

অনেক পথ হেঁটেছে—ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। আগুন জ্বালার মত কাঠটাঠ কোথাও আছে কি না খুঁজতে গিয়ে সে একটা চোর কুঠরী পেল। হঠাৎ তার মোহান্তজীর কথা মনে পড়ে গেল: "ঘরের ভিতর ঘর…"। ঘুমে জড়িয়ে আসছিল তার চোখদুটো, আগুন জ্বালার কথা ভুলে গিয়ে সেই চোর কুঠরীতে খিল লাগিয়ে শুয়ে পড়ল। শোয়া মাত্রই ঘুম।

মাঝরাত্রে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল—মঠের ভিতরে বিকট দাপাদাপির শব্দ আর থেকে থেকে দারুণ গর্জ্জন। সে ভয়ে গুটিসুটি মেরে কাঠ হয়ে শুয়ে রইল। জানোয়ারটা একবার চোর কুঠরীর দরজায় ধাক্কা দেয় তখনই আবার সরে গিয়ে ভীষণ তর্জ্জন করে। দাপাদাপি শেষ হলে অনেকক্ষণ ধরে সে কী গোঙানি!

ভোর হলে ছেলেটা অতি সন্তর্পণে খিল খুলে দেখল, মঠের মেঝেতে কয়েকটা মানুষের কঙ্কাল ছড়ানো, আর এককোণে একটা বাঘ রক্তে স্নান করে পড়ে আছে। বাঘের মাথা দিয়ে তখনও একটু একটু রক্ত ঝরছে। মঠের দরজা খোলা। ছেলেটি দরজা দিয়ে এক দৌড়ে বেরুতে যাবে, দেখে, কটা বিড়াল গোঁফ ফুলিয়ে তার পালানো দেখে হাস্‌ছে। সে লজ্জা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল, ওঃ ওরই আঁকা বিড়াল ওগুলো; তাদের মুখে তখনও রক্ত লেগে—এক ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। বাঘের মাথা ভেঙে দিয়েছে ওরাই।

ছেলেটির মনে পড়ল মোহান্তজীর দ্বিতীয় মন্ত্রটা। *

শুভেন্দু ঘোষ

একটা জাপানী উপকথার ইঙ্গিত নিয়ে লেখা।

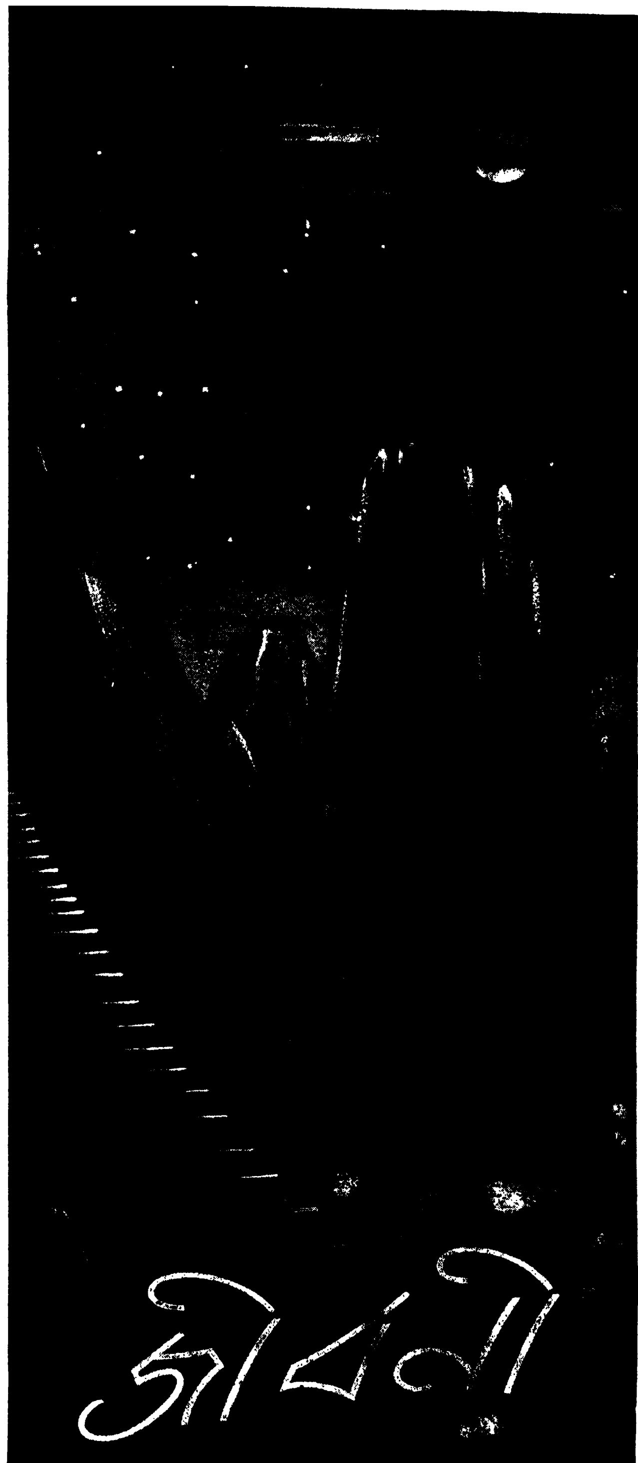
শের-ই-কাশ্মীর

শেখ আব্দুল্লা

ভূস্বর্গ কাশ্মীর। উত্তর ভারতের লোকরা বলে অতুলনীয় স্বর্গ।

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায় আমি শ্রীনগরে পৌঁচেছি। কাশ্মীরের লোক যাঁকে শেখ সাহেবের Brain Trust বলে জানে সেই জি, এম, সাদিক এডভোকেটের বাড়ী আমার ওঠার কথা। আমি তাঁর চেম্বারের ঠিকানাই জানতাম। সেখানে পৌঁছে জানা গেল—তিনি সম্ভবত বাড়ীতে। কুলি বল্লে যে বাড়ী প্রায় দুমাইল দূরে—কিন্তু সে টঙা করে পৌঁছে দিতে পারে। একটু এবাক হয়ে প্রশ্ন করতে সে বল্লেঃ "সে বাড়ী কে না চেনে, শের-ই-কাশ্মীর যে সেখানেই থাকেন।"

টঙায় চড়ে যাচ্ছি। কুলি এবং টঙাওয়ালা আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। আমি বাঙ্গালী কিনা এবং রাজনৈতিক লোক কিনা তা তারা জানতে চাইল। শ্রীনগরে বাঙ্গালী কদাচিৎ চোখে পড়ে। কোন বাঙ্গালী কাশ্মীর রাজার মন্ত্রী ছিলেন—এবং আর ২।১ জন যাঁরা আছেন তাঁরা ব্যবসায়ী। আমি দুবার কাশ্মীরে গিয়ে দুটো বাঙ্গালী পরিবারের বেশী দেখিনি। কিন্তু আমাকে বাঙ্গালী বলে চিনতে পারায় আমি ততটা আশ্চর্য্য হইনি যতটা হয়েছিলাম রাজনৈতিক লোক বলে চিনতে পারায়। কারণ কোন কংগ্রেস নেতারা মত—খদ্দরের জামা কাপড় টুপির শোভা তো ছিলই না—আমাকে দেখলে বরং অভাবগ্রস্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীর উমেদার বলে ধরা উচিত ছিল। পায়ে অর্দ্ধজীর্ণ স্যাণ্ডাল, গায়ে সবুজ ছিটের সার্ট, ছোট্ট একটা স্যুটকেস এবং বিছানাপত্র নেই বল্লেই হয়। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, "জানলে কি করে আমি রাজনৈতিক লোক?" এক গাল হেসে টঙাওয়ালা জবাব দিলেঃ "সে আর বলতে। কোথায় সেই বাংলা দেশ, সেখান থেকে আসছো তুমি সাদিকের বাড়ী, যেখানে অষ্টপ্রহর থাকেন শের-ই কাশ্মীর আর গোলাম মহীউদ্দিন।" গোলাম


જીવની

মহীউদ্দিন সাদিকের খুড়তুতো ছোট ভাই—তিনিও এডভোকেট, ন্যাশনাল কনফারেন্সের শ্রমিক বিভাগের নেতা, অধিকাংশ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং এবারে কাশ্মীর রাজার বিরুদ্ধে যে গুপ্ত প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে তিনি তার গোপন সংগঠক। খবরের কাগজে বেরিয়েছে তাঁকে ধরতে না পেরে সরকার তাঁর প্রায় দু লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে।

এহেন বাড়ীতে বাংলা থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের লোক আসবে না তো কে আসবে? কোন বাঙলী এদের বন্ধু হতে পারে? টঙাওয়ালার এই সহজ বুদ্ধি শুধু তাঁর একার নয়, কাশ্মীরের শিক্ষিত পণ্ডিত সম্প্রদায়ের বহু লোকের কাছ থেকে এই মনোভাব জানিতে পেরে এবং বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি কাশ্মীরবাসীর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ হতে দেখে বার বার মুগ্ধ হয়েছি, গর্ব্ব অনুভব করেছি।

টঙাওয়ালা ফের প্রশ্ন করলেঃ "তোমার দেশে নাকি চালের দর ১০০৲ মণ? না খেয়ে লোকে পথে ঘাটে মরে পড়ে রয়েছে?

জবাব দিয়ে জানতে পারলাম কাশ্মীরের চালের দামের খবর।

"৫৲ থেকে ৭৲ টাকা মণ। কেমন করে জান? শের-ই-কাশ্মীর আর ন্যাশনাল কনফারেন্স যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই ফুড কমিটি করে দিয়েছে—চাল অযথা বাইরে নিয়ে যেতে দেয় নি। পাড়ায় পাড়ায় কমিটি খবরদারী করছে এই সব জিনিষের দোকানের উপর। তাই আমরা বেঁচে গেছি। শের-ই কাশ্মীরের কত বুদ্ধি। আচ্ছা, তোমাদের দেশের চাল কোথায় গেল? জাপানীরা কি সব নিয়ে নিয়েছে?"

আমি বল্লাম যে জাপানীরা তো এখানে আসতে পারে নি—তবে আর কেউ নিয়েছে নিশ্চয়। সে তখনই জবাব দিল যে নিশ্চয় জাপানীদের লোক জন তোমাদের দেশের মধ্যে আছে যারা যুদ্ধে ওদের জেতাবার জন্য চাল সরিয়ে দিয়েছে। না খেলে তো লোকে লড়তে পারবে না।

আমার কাছে আশ্চর্য্য লাগলো। খাদ্য ব্যাপারে সরকারী দুর্ব্যবস্থার কথা তার মনে আসছে না। কাশ্মীরের ফুড কমিটির কাজে তার মনে এ বিশ্বাস এসেছে যে সবাই মিলে চেষ্টা করলে সেটা বোধ হয় দূর করা যায়---কিন্তু গোপন শত্রুকে দূর করা কষ্ট কর। প্রকৃতপক্ষে শেখ সাহেব কাশ্মীরের জনসাধারণের কাছে যে কি তার প্রথম এবং অত্যন্ত সুস্পষ্ট পরিচয় পেলাম এই টঙাওয়ালার কাছ থেকে। তারপর অনেক জায়গায় পেয়েছি, গুলমার্গের ১০ হাজার ফুট উঁচু সড়কে উঠতে উঠতে ঘোড়ার সহিসের কাছে। ১৬ হাজার ফুট উঁচু কোল-হাই-এর তুষার ধবল এলাকার রেস্ট হাউসের রক্ষকের কাছ থেকে। তাদের নেতার পরিচিত অতিথি আমি একথা জানতে পেরে সমবয়সীরা ভাইয়ের মত ব্যবহার করেছে, বৃদ্ধরা পিতার

মত স্নেহ দেখিয়েছে। কোলহাই থেকে ফেরার পথে রেস্ট হাউসের রক্ষক বৃদ্ধ মুসলমান বার বার বলেছিল বাংলা ফিরে যেন তাকে একখানা পত্র দিই। শেখ আবদুল্লার নাম এমনি মন্ত্রের মত কাজ করেছিল।

শেখ আবদুল্লার পরিচয়ের জন্য কাশ্মীরের পরিচয় কিছু জানা দরকার। প্রায় ৮৪ হাজার বর্গমাইল নিয়ে এই রাজ্য হলেও আসলে এটাকে বাংলার ময়মনসিং জেলার মত ধরলে কোন অন্যায় করা হবে না। এর লোক সংখ্যা ৪০ লক্ষ, এখানে মুসলমান্, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, প্রভৃতি ধর্ম্মের লোক বাস করে। শতকরা ৯৬ জন লোক কৃষিজীবি এবং শতকরা ৭৫ জনের বেশী মুসলমান। গড়-পড়তা বার্ষিক আয় মাথা পিছু ১১৲ টাকা।

১৮৪৬ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৭৫ লক্ষ শিখ মুদ্রা পেয়ে ডোগ্রা মহারাজ গুলাব সিং-এর কাছে বিক্রি-কবলা সই করে দেয়। ডোগ্রা জাতি পাঞ্জাবের ঠিক সীমানায় অবস্থিত জম্মুতে বাস করে। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত গরম— এবং ডোগ্রারা মার্শাল জাতি বলে গণ্য হয়, কাশ্মীরের ভাষা নিয়ে বেশ মুস্কিল আছে। লেখাপড়া হয় উর্দ্দুতে, কিন্তু ওখানকার কথ্য ভাষাকে কাশ্মীরী ভাষা বলা উচিত। তার মধ্যে পুস্‌ত, উর্দ্দু, রুশ এবং অন্যান্য সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশের ভাষার প্রভাব আছে। এই হ'ল অত্যন্ত সংক্ষেপে কাশ্মীরের সাধারণ পরিচয়। আমরা সবাই জানি দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা! বৃটিশ ভারত থেকে তারা সর্ব্ব-রকমে অনুন্নত। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোন রকম প্রগতির ব্যবস্থা সেখানে নেই। দেশীয় রাজারা সেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা—এবং নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারী শাসন চালিয়ে থাকে। আর ইংরেজের বেয়নেটের খাড়া প্রাচীর তাদেরকে প্রজাদের উষ্ণ নিঃশ্বাস থেকে রক্ষা করে। কাশ্মীর এমনি এক দেশীয় রাজ্য!

এই কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের পাশে আছে বিখ্যাত ডাল লেক। শ্রীনগর থেকে ৬ মাইল দূরে ডাল লেক ও আঁচার লেকের মাঝখানে সৌরা নৌশহরা গ্রামে শালওয়ালা শেখ মহম্মদ ইব্রাহিমের ঔরসে শেখ মহম্মদ আবদুল্লা ১৯০৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকে তিনি অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান। আজকের দীর্ঘ ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা এই কাশ্মীরী নেতাকে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে ইনি বাল্যকাল থেকেই গাঁয়ের ছেলেদের নেতা ছিলেন। শেখ আবদুল্লাকে দেখলে প্রায় পণ্ডিত নেহরুর কথা মনে পড়ে। দুজনে পরস্পরের বন্ধু। কিন্তু শেখ সাহেবের তেজদীপ্ত চেহারায় পণ্ডিতজীর কমনীয়তা না থাকলেও আসলে তিনি পণ্ডিতজীর থেকেও অনেক সহজবোধ্য, সাদা সিধা। কথা বল্লেই কেবল বোঝা যায় তিনি প্রকৃতিতেও অত্যন্ত সরল। তাঁর রাজনৈতিক আড্ডাখানায় বহুদিন বসেছি, অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা শুনেছি কিন্তু কখনো মনে হয়নি যে একটা বড় নেতার

সামনে বসে আছি। অথচ চেহারা দেখলে একটা প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বের সামনে এসেছি একথা প্রথমেই মনে হয়ে যাবে।

শেখ সাহেবের বড় ভাই নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু শেখ সাহেবকে ৫।৬ বছরে মোল্লার কাছে কোরান ও কায়দা পড়তে পাঠানো হয়েছিল। শেখ সাহেবের এই সময়কার একটা ঘটনা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। ওঁদের বাড়ীর পাশে একটি পরিবারে বুড়ো মা-বাবা, দুটো বোন এবং তাদের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ ১৬।১৭ বছরের সোনার কান্তি একটি ছেলে। দৈনিক আট আনার মজুরী করে সেই ছেলে ওদের খাওয়া যোগাতো— খুদ-কুঁড়োর লপ্‌সি। এর উপর ছিল মহাজনের দেনার তাগিদ। এই ছেলে অসুখে পড়ে মারা যায়। অন্নহীন ও সহায়সম্বলহীন সেই পরিবারের দুর্দ্দশা শেখ আবদুল্লার জীবনে প্রথম প্রশ্ন তোলে "কেন---কেন এমন হয় ?" বালক আবদুল্লা মাকে প্রশ্ন করলেন "কেন এত গরিবি ?"

সরলমনা মা বল্লেন, "আল্লামিঞা করেছেন তা কি বলবো বল।" বালক কিছুতেই বুঝতে পারতো না কি করে একই অন্যায় একজনকে গরীব এবং আর একজনকে আমীর বানাতে পারেন।—মাকে একথা বল্লে মা হেসে জবাব দিতেন : "তুই বড় শয়তান।"

প্রাইমারী স্কুলে দুই শ্রেণী অতিক্রম করার পর বড় ভাই স্থির করেন—শালের কাজে লাগিয়ে দেবেন আবদুল্লাকে। মেজ ভাই বাদ সাধলেন। আবদুল্লা প্রাইমারী স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারলেন। এখান থেকে হাইস্কুলে রোজ সকাল সন্ধ্যায় ১০ মাইল যাতায়াত করে তিনি ১৯২২ সালে দ্বিতীয় ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছায় শ্রীনগর শ্রীপ্রতাপ সিং কলেজে বিজ্ঞানের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এই সময় ১২ মাইল রাস্তা তাঁকে যাতায়াত করতে হ'ত। ফলে কঠিন পরিশ্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন। কিন্তু পরের বছর পাস করে লাহোরে ইসলামিয়া কলেজে বি-এস্‌সি পড়তে আসেন। দেশীয় রাজ্যের বাইরে এলে শেখ আবদুল্লার মাথায় রাজনীতির প্রথম ধাক্কা লাগে। এই সময়কার এক ঘটনা শেখ আবদুল্লার জীবনে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করে।

১৯২৪ সালে কয়েকজন কাশ্মীরী মুসলমান নিজেদের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার চেয়ে একটা অত্যন্ত বিনম্র আবেদনপত্র রাজার কাছে পেশ করেন। রাজা এতবড় 'গোস্তাকী' সহ্য করতে না পেরে রাজ্য থেকে তাদের নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন। এই নির্ব্বাসিতদের সঙ্গে লাহোরে শেখ আবদুল্লার দেখা হয়। কথা প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন, "লোকের ভালোর জন্য আমরা কাজটা করতে গিয়েছিলাম। আজ আমরা দেশছাড়া ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরছি— কিন্তু দেশের লোক এমনি চশমখোর যে তারা আমাদের কথা একবারও মনে করে না।" শেখ আবদুল্লা সেই সময় যে জবাব দেন—তাতে তাঁর আশ্চর্য্য বাস্তববোধ প্রকাশ পায়।

তিনি বলেন, "আপনাদের একটু ভুল হয়েছিল। দেশের লোকের জন্য আপনারা কি করতে চান—সেটা আগে দেশের লোকের কানে পৌঁছে দেওয়ার দরকার ছিল। তাহলে দেখতেন তারা আপনাদের সমর্থন করতো এবং আজ এই অবস্থা হোতনা।" তরুণ যুবকের এই কথা নির্ব্বাচিতদের মনে বিরক্তির সঞ্চার করেছিল—তারা বলেছিলেন, "বলা তো খুবই সহজ।" শেখ উত্তরে জানান: "অপেক্ষা করুন কাজেই দেখবেন।"

১৯৩০ সালে আলিগড় থেকে এম-এস্‌সি পাস করে বাড়ী ফিরলেন শেখ আবদুল্লা। সারা ভারতে তখন লবণ সত্যাগ্রহের আন্দোলন দিকে দিকে দেশপ্রেমের বন্যা সৃষ্টি করেছে। পুলিসের অত্যাচারের সামনে অস্ত্রহীন ভারতের দুরন্ত প্রতিরোধ স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলার পথ দেখিয়েছে। কিন্তু কাশ্মীর ভারত নয়। সেখানে গণ-আন্দোলনের কোন সংগঠন ছিল না। ৬ বছর আগে কেবলমাত্র স্মারকলিপি পেশ করার অপরাধে দস্তখত-কারীরা নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন। তাই শেখ সাহেব যখন কাশ্মীরী শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য বেশী চাকুরী দেওয়ার দাবী জানিয়ে স্মারকলিপি পেশ করতে চাইলেন, তখন পূর্ব্বের কথা মনে করে অনেকে ভয় পাচ্ছিল। অবশ্য ইতিমধ্যে কাশ্মীরের দুরবস্থার কথা ভারতের বাইরে অনেক বেশী প্রচারিত হয়েছিল। কাশ্মীরের মন্ত্রী সার আলবিয়ন ব্যানার্জ্জী নিজেই এই সময় বলেন যে, জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা জানবার বা জানাবার কোন ব্যবস্থা নাই। কাশ্মীরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে কাশ্মীরের অনেক লোক আসেন। কংগ্রেসের রণধ্বনি তাদের কিছুটা প্রভাবান্বিত করেছিল। তাই অনেক চেষ্টার পর শেখ আবদুল্লা তাঁর স্মারক-লিপিতে দস্তখত দেওয়ার লোক পেলেন। মহারাজা তখন ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং ওয়েকফিল্ডের প্রধানমন্ত্রীত্বে এক মন্ত্রিসভা কাশ্মীরে কাজ চালাচ্ছিল। এই মন্ত্রিসভা শেখ সাহেবকে ডেকে তাঁর বক্তব্য শোনেন এবং তার ফলে ওয়েকফিল্ড অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। জম্মুর মুসলিমদের ওপর পাঞ্জাবের প্রভাব দ্রুত পড়ত। পাঞ্জাবের কাগজে কাশ্মীরের দুঃখ দুর্দ্দশা প্রকাশ পেত। শেখ সাহেব জম্মুর মারফত সব খবর পাঞ্জাবের কাগজে পাঠাতেন। পাঞ্জাবের উর্দ্দু দৈনিক "ইনক্লাব"-এ সেই সব ছেপে কাশ্মীরে পাঠানো হ'ত। কয়েক সংখ্যায় কাশ্মীরের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার ঐ কাগজ কাশ্মীরে আসা বন্ধ করে দিল। কিন্তু শেখ সাহেবের ব্যবস্থায় লাহোর থেকে "কাশ্মীরী মুসলমান" নামে দুই পাতার কাগজ বার হ'তে লাগলো। এক পয়সা দামের এই কাগজ কয়েক সংখ্যার মধ্যে ৫ হাজার বিলি হ'তে লাগলো। সরকার পোষ্ট অফিস থেকে সংখ্যাগুলি সরিয়ে রাখতে লাগলো। কিন্তু আবার "গরীব কাশ্মীরী" নাম দিয়ে আর একখানা পত্রিকা বার হ'ল।

ইতিমধ্যে মহারাজা ফ্রান্স থেকে ফিরলেন। ওখানকার হিন্দু ও মুসলিম জায়গীরদার মহারাজাকে পৃথক পৃথক চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করে তাদের বক্তব্য বলবেন স্থির করেন। এই সময় বক্তা হিসাবে শেখ আবদুল্লার নাম পরিচিত হচ্ছিল—তাই চা-পার্টি কমিটিতে তাঁকেও নেওয়া হয় বলবার জন্য। অবশ্য মহারাজা এই পার্টিতে আসতে অস্বীকার করেন।

কিন্তু শেখ সাহেবের সংগঠনের কাজ তখন পুরো দমে চলছে। অনেক যুবক তাঁকে সাহায্য করছে। কিন্তু অর্থের জন্য শেখ সাহেবের দুশ্চিন্তা হ'তে লাগলো। বাড়ীর জন্য কোন রোজগার করেন নি। এবার নিজের খরচা এবং সংগঠনের খরচার কথা ভাবতে হ'ল। শেষে বন্ধু বান্ধবের কথামত সরকারী স্কুলে ৮০৲ বেতনে বিজ্ঞানের মাষ্টারীর কাজ নিলেন।

এই সময় এমন এক কাণ্ড হ'ল যার ফলে এই চাকুরী তাঁকে ছাড়তে হ'ল। জম্মুতে ঈদের নমাজে খুতবা পড়ার সময় পুলিশ ইনসপেক্টার তা বন্ধ করে দেয়। একজন কনষ্টেবল কোরানের অপমান সূচক কথা বলে। জম্মুর লোকেরা পোষ্টার লাগিয়ে এর প্রতিবাদ করে। এই পোষ্টার কিছু শ্রীনগরেও লাগানো হয়। শেখ সাহেব এই পোষ্টার আরো ছাপিয়ে শ্রীনগরে লাগাবার ব্যবস্থা করেন। শেখের বাড়ীর কাছেই পুলিশ কয়েকটী তরুণকে এই অপরাধে গ্রেফতার করে। শেখ তার বিরোধিতা করলেন। ৫ হাজার লোক জড়ো হয়ে ধৃত ব্যক্তিদের পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। খবর রটে গেল এবং জুম্মা মসজিদে সমবেত ২৫ হাজার লোকের সামনে শেখ সাহেব তাঁর প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা দিলেন। ওখান থেকে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে জনতা বাড়ী পর্য্যন্ত এ'ল—সেখানে আবার ওঁকে বলতে হ'ল।

সরকার শেখ সাহেবের এই জনপ্রিয়তা দেখে অন্য কোন সাজা দিতে সাহস করল না। শ্রীনগর থেকে ১০০ মাইল দূরে মুজফ্‌ফরাবাদে বদলি করে দিল। শেখ সাহেব যেতে অস্বীকার করলেন এবং কাজে ইস্তফা দিতে চাইলেন। ক্রুদ্ধ সরকার তাঁকে বরখাস্ত করলেন। এই নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে শেখ সাহেবের রীতিমত বচসা হয় এবং সেই সব কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শেখ সাহেবের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বাড়তে থাকে। চারিদিকে সভা সমিতি হতে থাকে। সরকার বিপদ বুঝে জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থা জানবার জন্য জম্মুর চারজন এবং কাশ্মীরের ৭জন নিয়ে একটী তদন্ত কমিটি গঠন করার কথা ঘোষণা করে।

৬০।৭০ হাজার লোকের এক সভায় শেখ সাহেব কাশ্মীরের ৭জন প্রতিনিধির নাম স্থির করলেন। এই সভা যখন শেষ হচ্ছে সেই সময় কাশ্মীর রাজ্যের বাইরের একজন লোক উত্তেজিত ভাবে উঠে বলে ঃ "সরকার এই প্রস্তাব যদি না মানে তো আবার সভা ডাক, সভার কথা না শোনে তো ইট পাথর হাতে নাও।" দুদিন বাদে এই বক্তাকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেফতার করা হয়

এবং মামলা সুরু হয়। শেখ সাহেব অবশ্য পূর্ব্বোক্ত আচরণ সমর্থন করেন নি—কিন্তু মোকদ্দমায় আসামী পক্ষ সমর্থন করার ব্যবস্থা করেন। আদালতে দারুণ ভিড় হতে থাকে। শেখসাহেব লোককে বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে খবর চারিদিকে পৌঁছালো না। বিরাট জনতার সামনে সরকার সামরিক আইন জারী করল এবং গুলি চললো। যে জেলে আসামীর বিচার হচ্ছিল উত্তেজিত জনতা সেখানে জজ সাহেবের পিছু পিছু ঢুকে গেল। জজ লোকদের বুঝিয়ে জেল থেকে বাইরে আনলেন কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষেপে গিয়ে সেই জনতাকে গ্রেফতার করতে গেলেন। আবার গুলি চললো। এইভাবে কাশ্মীরে নূতন জালিনওয়ালাবাগ তৈরী হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের বিভিন্ন যায়গায় বারমূলা, সোপোর, অনন্তনাগ, জম্মু, পুন্‌ছ প্রভৃতি স্থানে কয়েক দিনের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে গেল। এই আন্দোলন, সংগ্রাম এবং অত্যাচারের কাহিনী বিরাট এবং এই আন্দোলনের শহীদের রক্তস্রোতে আজকার "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলনের প্রথম মুসাবিদা লেখা হয়ে গেল।

দুই দিন বাদে শেখ আবদুল্লাকে গ্রেফতার করে। হরপর্ব্বতের কেল্লায় তাঁকে বন্দী রাখা হ'ল। সেই সময় জুলাই মাস—কাশ্মীরের বসন্তকাল। দেশ বিদেশের লোক সে সময় ভীড় করে—এই ভূস্বর্গে এরা বরফে খেলা করে এবং অপরূপ সবুজের মেলায় নিজেকে নূতন করে ফিরে যায়। কাশ্মীরের সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরা এই সময় সারা বছরের রোজগার করে। কিন্তু শেখ আবদুল্লার প্রতিবাদে ২১ দিন সমস্ত দোকান পাট বন্ধ রইল। ভারতের সর্ব্বত্র এই গুলি গোলার ব্যাপার এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতা প্রিয় জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের কথা প্রচার হ'ল। ফলে শেখ আবদুল্লা ও তাঁর সহকর্ম্মীরা ছাড়া পেলেন এবং সার্ আর্দিশির দালালের নেতৃত্বে একটী তদন্ত কমিটি অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য গঠিত হ'ল। অবশ্য এটা রাজার আত্ম-দোষ ঢাকবার জন্য একটা লোকদেখানো ব্যাপার ছিল এবং কাশ্মীরের জনসাধারণও তাই এই কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। বরং তাদের দাবী উত্তরোত্তর প্রবলভাবে জানিয়েছে। কাশ্মীর সরকারকে তাই গ্ল্যান্সি কমিশন নিযুক্ত করে শাসন সংস্কার সম্পর্কে আবার বিবেচনা করার কথা দিতে হল। এই গ্ল্যান্সি বর্ত্তমানে পাঞ্জাবের লাট। কাজেই এর সুপারিশ কি হতে পারে তা বোঝা বড় শক্ত নয়। চাকুরীতে নানা সম্প্রদায়কে সংখ্যানুপাতে নেওয়া, আইন সভায় পৃথক নির্ব্বাচন, ঌ নির্ব্বাচিত ও ঌ মনোনীত সদস্য নেওয়া, বক্তৃতা ও সভাসমিতির কিছু অধিকার দেওয়া সম্পর্কে ও সভা সমিতির কিছু অধিকার দেওয়া সম্পর্কে সুপারিশ ছিল। কিন্তু কমিটি তারও অনেক কিছু বাতিল করে দেয়। শেখ সাহেব কিন্তু এইসব শাসন সংস্কারে ভ্রান্ত হন নি। এই সময় তিনি প্রথম জম্মু কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স নামে জন সংগঠন তৈরী করেন। ১৯৩২ সালের ২৪, ২৫, ২৬শে অক্টোবর শ্রীনগর পাথর মসজিদে প্রথম সম্মেলনের সভাপতি রূপে তিনি

বলেন: "ঈদের খুতবা পড়ার সময় কোরানের অপমানের ব্যাপারে যে আগুন আমাদের মনে জ্বলেছিল তা' আজ আমাদের সকল রকম দুঃখ দুর্দ্দশা প্রতিকারের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের আন্দোলন সাম্প্রদায়িক নয়, হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকলের স্বার্থ রক্ষার আন্দোলন আমরা করছি।" ১৯৩৬ সালে জম্মু-কাশ্মীর মুসলিম কন্‌ফারেন্সকে ন্যাশনাল কনফারেন্সে পরিবর্ত্তন করা হয়। শেখ আবদুল্লার সহজ অনুভূতি তাকে মুসলিম নেতা থেকে জাতীয় নেতায় পরিণত করেছিল। তিনি বলেছিলেন যে হিন্দু, মুসলিম এবং শিখ পুঁজিপতির চাকার নীচে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ পিষ্ট হচ্ছে, কাজেই তাদের সকলের একত্রে লড়াই করা দরকার। তিনি আরো বলেছিলেন যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যে স্বাধীনতার আদর্শ যা সর্ব্ব জাতির এবং সকল শ্রেণীর কথা ভেবে তৈরী করা হচ্ছে কাশ্মীরের আন্দোলনও সেই অনুসারে হবে। এবং তিনি শেষে একবার বলেছিলেন যে কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢালার কাজ করছে পাঞ্জাবের প্রতিক্রিয়াশীলরা। শেখ সাহেবের এই ডাকে কাশ্মীরের অধিকাংশ মুসলমান, শিখ ও গরীব পণ্ডিতরা নিজেদের অন্তরের ভাষার প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন তাই তাঁরা শেখ আবদুল্লাকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ নেতা বলে গ্রহণ করেছে। কাশ্মীরের রাজনীতি বুঝতে গেলে একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে কাশ্মীরের পণ্ডিতশ্রেণী এবং পাঞ্জাবের ধনীরা কাশ্মীরের সরকারী চাকুরী এবং ব্যবসার অধিকাংশ নিজেদের হাতে রেখেছে। কিন্তু কাশ্মীরের পণ্ডিতশ্রেণী কাশ্মীরের বাইরের ধনীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না দেখে কাশ্মীরের বাইরের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের পক্ষ হয়ে "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলন জোরদার করতে এগিয়ে আসে। "কাশ্মীর কাশ্মীরীর জন্য" এবং "কাশ্মীর ছাড়ো" এই ধ্বনি তাই কাশ্মীরের সকল সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করেছে। তাই দেখা যায় যে গত কয়েক বৎসরে ন্যাশন্যাল কনফারেন্সে নিম্ন মধ্যবিত্ত পণ্ডিত এবং শিখদের ছেলে কর্ম্মী হিসাবে আসছে এবং শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাজ করছে। আসলে ডোগ্রা রাজার কৌশল হ'ল কাশ্মীর ও কাশ্মীরের বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে নিজের পক্ষে টানা এবং তার বিরুদ্ধে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরে গরীব, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও উদার-নৈতিক উচ্চশ্রেণীকে এক করে কাশ্মীরের বাইরের প্রগতিশীলশক্তিকে এক করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। শেখ আবদুল্লা কমিউনিস্ট এবং পাকিস্তানবাদী এমন অভিযোগ আজ অনেক যায়গায় শোনা যায়। যারা কাশ্মীর সম্পর্কে একেবারেই কিছু জানেন না বা সরকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষের প্রচারে বিশ্বাস করেন তাঁরাই সচরাচর একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত হন।

প্রথমত বলে রাখা ভাল যে শেখ সাহেব কমিউনিস্ট বা সোশ্যালিস্ট কোন দলের

সভ্য নন। তবে তিনি কমিউনিস্টদের কখনো বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী বলে ভাবেন না। তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্ম্মীদের মধ্যে কমিউনিস্ট কয়েকজন আছেন আবার নন-কমিউনিস্ট বা সমাজতন্ত্রবাদী লোকও আছেন। প্রত্যেকটি দলের রাজনীতি তিনি তাঁর আন্তর্জাতিক বিচার ও কাশ্মীরের জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার মানদণ্ডে বিচার করেন এবং সকলকে একত্র করতে চেষ্টা করেন।

একথাও বলে রাখা দরকার শেখ সাহেব আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার জাতির ভিত্তি হিসাবে সম্পূর্ণ মানেন। স্বাধীন কাশ্মীর স্বেচ্ছায় ভারতীয় গণতন্ত্রে আসতে পারে, নাও পারে বা কেবল বন্ধুত্ব সূত্রে থাকতে পারে এর বিচার কাশ্মীরীরা করবে এটা শেখ সাহেব মানেন। কাজেই মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবীর তুলনায় তাঁর দাবী বিজ্ঞান সম্মত। তবু তিনি লীগের দাবীর মধ্যে জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারের অঙ্কুর আছে বলে নিজে বুঝেছিলেন। গান্ধীজী এবার জেল থেকে যখন বার হন ঠিক সেই সময় শেখ সাহেবের আমন্ত্রণে মিঃ জিন্না কাশ্মীরে আসেন এবং শেখ সাহেব নিজে গান্ধীজীকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং লীগের সঙ্গে আপোষ করার জন্য যে অনুরোধ পত্র লেখেন সেই চিঠিটার খসড়া আমি পড়েছিলাম। তাতে শেখ সাহেব লিখেছিলেন যে গান্ধীজী যদি কাশ্মীরে বা উত্তর ভারতে আসেন তাহলে বুঝতে পারবেন আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী কত স্পষ্ট এবং লীগের দাবীর মধ্যে কোথায় কতটুকু সত্য আছে। তা' ছাড়া মুসলিমদের মধ্যে যে প্রবল রাজনৈতিক চেতনা হয়েছে তারও একটা আভাস তিনি গান্ধীজীকে দিয়ে ছিলেন।

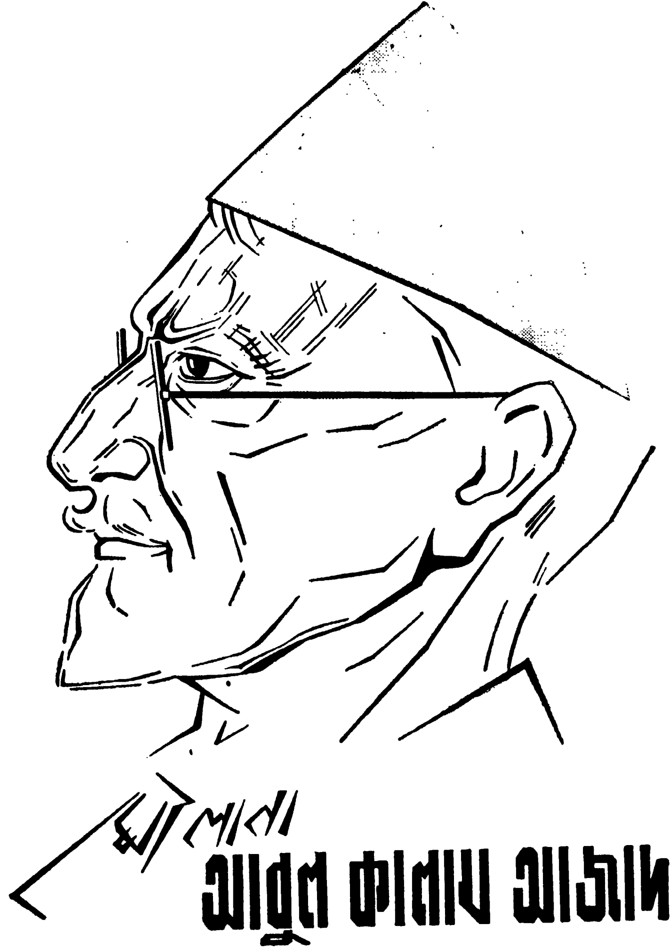
অবশ্য মিঃ জিন্নার সঙ্গে শেখ সাহেবের বনেনি। কাশ্মীরে থাকতেই ঝগড়া হয়েছিল এবং নানা অপ্রীতিকর বিবৃতি চালাচালি হয়েছিল। কিন্তু শেখ সাহেব তাঁর আদর্শচ্যুত হন নি।

শেখ সাহেব পণ্ডিত নেহরুর বন্ধু এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শে প্রভাবান্বিত। অপর দিকে কংগ্রেসের রাজনীতি তাঁকে যত টেনেছে তত আর কিছু টানেনি। তবু তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের পার্থক্য এইখানেই যে তিনি যা বলেন তার সঙ্গে কাশ্মীরের জনসাধারণের দুঃখ প্রতিকারের ব্যবস্থার কোন মিল আছে কিনা তার বিচার তাঁকে তখনিই করতে হয়। পূর্ণ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার মানা পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে যত অসুবিধা সৃষ্টি করেছে শেখ সাহেবের কাছে তা করেনি। সাম্রাজ্যবাদ, ডোগরা সামন্ততন্ত্র এবং বহিঃকাশ্মীরী ধনপতিদের আধিপত্য তাঁকে সহজেই কাশ্মীরী জাতির পূর্ণ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবীতে সমর্থক করেছে। দ্বিতীয়তঃ শেখ সাহেব পণ্ডিত নেহরুর মতই সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিজম বিরোধী। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু যেমন কি করবেন মনস্থির করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শিকার বনলেন শেখ সাহেব তখন কাশ্মীরের সাধারণ লোকের যুদ্ধজনিত কষ্ট থেকে দূর করার কাজে

ন্যাশনাল কনফারেন্সের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। স্টালিনগ্রাদ থেকে কাশ্মীর বেশী দূর নয়। কাশ্মীরের জনসাধারণের রুশপ্রীতি প্রায় প্রতিবেশী প্রীতির মত। তা ছাড়া তাদের দারিদ্র্যই তাদেরকে রুশের আদর্শের প্রতি আকর্ষণ করেছে। কাজেই শেখ সাহেবের সোভিয়েট প্রীতি, সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত স্বাভাবিক। ফ্যাসিজমের আক্রমণ-শক্তি যখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, গণতন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং অস্ত্র সোভিয়েট দেশ যখন বিপন্ন, তখন যুদ্ধব্যবস্থা নিজের হাতে নিতে না পারলেও দেশ রক্ষার ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করার যুক্তি শেখ সাহেবের পছন্দ হয় নি। তিনি কমিউনিস্টদের "জনযুদ্ধের" শ্লোগান গ্রহণ করেন নি কিন্তু তাদের বাস্তব কার্য্যপন্থা অর্থাৎ যুদ্ধের সময় দুর্গত জনসাধারণকে সরকারী অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থাকে অনেকখানি সমর্থন করেছিলেন। তাতে তাঁর প্রভাব কমেনি বরং গরীব লোকের মধ্যে কি রকম বেড়েছে তা' প্রথমেই টঙাওয়ালার গল্পে বলেছি। ওখানকার হিন্দু যুবসংঘের সহসভাপতি একজন নামজাদা কাশ্মীরী পণ্ডিতের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁর কাছে শুনেছিলাম, "শেখ আবদুল্লা রিফর্ম্মিষ্ট হয়ে যাচ্ছেন, বড়লোক পণ্ডিত ও শিখদের ন্যাশনাল কনফারেন্সে এনে যুদ্ধের সময় তাদের ব্যবস্থা এবং মধ্যবিত্তদের চাকুরী খুঁজে দেওয়ার মামুলী সংস্কারপন্থী নীতি তিনি গ্রহণ করেছেন।"

কথাটা যে একেবারেই ভুল তা' শেখ আবদুল্লার "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলন এবং তার জন্য কাশ্মীরের জনসাধারণের মরণপণ সংগ্রাম প্রমাণ করছে। সংগ্রাম করার সময় নির্দ্ধারণ করা সম্পর্কেও তার বাস্তববুদ্ধি কম নয়। আজ গণপরিষদে দেশীয় রাজ্যের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ভারতের স্বাধীনতার শক্তিকেই শক্তিশালী করবে, শুধু কাশ্মীরের জনসাধারণের স্বার্থকে দেখবেনা। সেই বিবেচনা থেকে দেখতে গেলে শেখ সাহেব ভারতের জাতীয় নেতাদের আজ যে শিক্ষা দিয়েছেন সর্ব্বভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের রণক্ষেত্রে প্রথম বাহিনী হিসাবে তিনি কাশ্মীরী জনসাধারণকে যে ভাবে পরিচালনা করছেন তা' ভেবে দেখার বিষয়। ভারতের সামনে আজ স্বাধীনতার প্রশ্ন, ভারতের ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি গ'ড়ে তোলার প্রশ্ন এবং সোভিয়েট ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে একত্র হয়ে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বন্ধ করার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ক্ষুদ্র কাশ্মীর রাজ্যের দরিদ্র জনসাধারণের হৃদয়ের "বে-তাজ বাদশা" আজ সে বিষয়ে যে নেতৃত্ব দিয়েছেন তা' আমাদের সকলের পক্ষে ভেবে দেখা দরকার।

সুধী প্রধান



মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

১৯০৪ সালের মাঝামাঝিই হবে। লাহোরে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বিরাট মজলিসের আয়োজন করা হয়েছে, সারা ভারতের বহু জ্ঞানীগুণী সভায় এসে উপস্থিত। উর্দ্দু সাহিত্যের দিকপাল সাহিত্যিকরা এ সভার উদ্যোক্তা, কবি ইকবাল ও তখনকার প্রসিদ্ধ উর্দ্দু কবি হালিও সভার উৎসাহী কর্ম্মী। সম্মেলনের মূল বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন কোলকাতার প্রসিদ্ধ উর্দ্দু সাময়িক পত্রিকা "লিয়ানুজ সিদিক" এর সম্পাদক, কারণ তখনকার দিনে এ পত্রিকাটি শিক্ষিত

মুসলমান সমাজে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর নির্ভীক মতামত ও নির্ভুল সম্পাদনা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সকলেরই, অথচ সম্পাদক মহাশয় ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত, এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় তেমন কারোরই ছিলনা।

সভা বসেছে। লোকজনে সভা ভর্ত্তি। সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মূল বক্তার বক্তৃতা শুনবে ও তাঁকে দেখবে, এমনি সময়ে বক্তৃতা মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন ১৬।১৭ বছরের এক সৌম্য প্রিয়দর্শন তরুণ। একজন পরিচয় করিয়ে দিলেন, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, 'লিয়ান্নুজ-সিদিকের' সুযোগ্য সম্পাদক। সভাশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত, বিস্ময়ে কারো মুখ থেকে কথা বের হোল না। এ ওর মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো, কেউ যেন বিশ্বাস করতে চাইল না এই তরুণ এতবড় প্রতিভাশালী পণ্ডিত হতে পারেন। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ আর রইলনা যখন তারা শুনলো মৌলানা সাহেবের বক্তৃতা। সমস্ত শ্রোতা সেদিন জেনে নিল এই যুবক হবে ভাবী মুসলমান সমাজের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠতম নেতা, কাজেই তিনি যে তিন তিনবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন এ অতি স্বাভাবিক।

মৌলানা আজাদের বাল্য অবস্থায় এই রকম অদ্ভুত গল্প আছে তাথেকে বোঝা যায় তিনি কি অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন। ১৫।১৬ বছর বয়সে তিনি শুধু একটা দেশবিখ্যাত কাগজের সম্পাদক ছিলেন তা নয়, কবিতা ও ধর্ম্মশাস্ত্রেও তিনি অসাধারণ পারদর্শী হয়ে ওঠেন খুব অল্প বয়সেই। সাধারণ ছাত্রের যা শিখতে ১২।১৩ বছর লাগে তা তিনি শেষ করেছিলেন চার বছরে। যখন তাঁর বয়স মাত্র ১২ বছর তখন তাঁর কাছে আরবী ও উর্দূ শিখতে আসতেন প্রধান প্রধান ছাত্রেরা। তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর বাবার চেয়েও ছিলেন বয়সে বড়। ১১ বছর বয়সে তিনি "নেরাঙ্গে আদম" বলে একখানি কবিতার পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। আবার তিনি কবিতা লিখেই ক্ষান্ত ছিলেন না, কবিতার লড়াইএ, যাকে মুসাইরা বলে, তখনকার দিনের বড় বড় নামজাদা কবিদের হারিয়ে দিতেন। কোলকাতার গার্ডেনরীচে এমন এক মুসাইরায় তিনি নাজীর খাঁ বলে ভারতপ্রসিদ্ধ ওস্তাদ কবিকে হারিয়ে দিয়ে সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর নাম আজ পৃথিবীতে পরিচিত একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে, আর তার তলায় চাপা পড়েছে তাঁর সব পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যিক প্রতিভার কথা। আজাদ নামটা শোনেনি ভারতে এমন লোক নেই কিন্তু কয়জন জানে যে এ নামটা তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম? তাঁর লেখা বইএর বা তাঁর পত্রিকার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে রাজনীতির ডামাডোলের মধ্যে যদি মৌলানা সাহেব না ডুবে যেতেন তাহলে কবি হিসেবে কি সাংবাদিক হিসেবে অথবা পণ্ডিত হিসেবেই তিনি তাঁর আজকের মত খ্যাতি

অর্জ্জন করতে পারতেন। তাঁর লেখা কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা আর কোরানের অনুবাদ ও ভাষ্য আরবী সাহিত্যের আজ অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এত সব সম্ভাবনা, অক্লেশ স্বচ্ছন্দ জীবন ছেড়ে কেন তিনি রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন তার কারণ জানতে হলে তাঁর জীবনী আলোচনা করা দরকার। মৌলানা সাহেব নিজেই একবার বলেছিলেন যে বিদ্রোহ আর সত্যাগ্রহ তাঁর রক্তে, তাঁর মজ্জায় মজ্জায়। তাঁর আদি পূর্ব্ব পুরুষ সেখ জামালুদ্দিন ছিলেন সম্রাট আকবরের ভাইএর ধর্ম্মগুরু। আকবরের এক অন্যায় আদেশের প্রতিবাদে তিনি স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন মেনে নেন কিন্তু অন্যান্য মোল্লাদের মত বশ্যতা স্বীকার করেননি। আজাদের আর এক পূর্ব্বপুরুষ সম্রাট জাহাঙ্গীরকে কুর্নিশ করতে অস্বীকার করেন ও দীর্ঘকালের জন্য কারা যন্ত্রণা ভোগ করেন কিন্তু শির নত করেন নি। এই তেজস্বিতার সঙ্গে সঙ্গে আজাদের সকল পূর্ব্বপুরুষের আর একটা গুণ ছিল তাঁদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য। বংশানুক্রমিকভাবে তাঁরা বাদশাহদের সভায় পণ্ডিতের আসন অলঙ্কৃত করতেন। মৌলানার পিতামহকে মোগল বাদশাহ "বিদ্যার স্তম্ভ" উপাধী দেন ও তাঁর সভাপণ্ডিত করে রাখেন।

মৌলানার বাবা মুহম্মদ খইরুদ্দিনও তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের মত একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সারা ভারতবর্ষব্যাপী হাজার হাজার শিষ্য ছিল। তিনি মক্কার এক বিখ্যাত পণ্ডিতের মেয়েকে বিয়ে করেন, তিনিই মৌলানা আজাদের মা। কাজেই মৌলানা সাহেব দুই দিক থেকেই জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়ে জন্মেছিলেন।

মৌলানা আজাদের জন্ম হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর শৈশব কাটে আরব দেশে। ভারতবর্ষে তিনি আসেন দশবছর বয়সে। এখানে এসে কোলকাতায় বাস করতে থাকেন। তিনি আরবী শেখেন তাঁর মার কাছে এবং উর্দু শেখেন তাঁর বাবার কাছে, ফলে তিনি খুব অল্প বয়সেই দুই ভাষাতে পণ্ডিত হয়ে উঠেন। তাঁর বাবা তাকে ইংরেজী স্কুলে পাঠাতে রাজী হন নি—সেই জন্য তিনি ছেলেবেলায় ইংরেজী শিখতে পারেননি। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি ইংরেজী শেখেন। শৈশবে না শিখে পরিণত বয়সে ইংরেজী শিখেছেন বলে তার ইংরেজী সাহিত্যে জ্ঞান খুব গভীর। তিনি পারতপক্ষে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করেন না বলে অনেকের ধারণা তিনি ইংরেজী জানেন না। সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, ইংরেজী কবিদের মধ্যে সেক্সপিয়ার ও বাইরণ তাঁর প্রিয় কবি। তাঁর ইংরেজ কবিদের সমালোচনা যাঁরা উর্দুতে পড়েছেন তাঁরাই জানেন ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান কত গভীর। "লিয়ানুজ সিদিক্"এ তাঁর কবিতা ও গদ্যরচনা বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই তখন আশা করেছিলেন তিনি এক বিরাট সাহিত্যিক হবেন কিন্তু তারা জানতেন না মৌলানার শিরায় শিরায় বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে ছিল।

১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত তরুণ আজাদ ইরাক, সিরিয়া, ইজিপ্ট প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ওখানে তিনি মুসলমান সমাজের মধ্যে যে অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও অবনতি লক্ষ্য করেছিলেন তা তাঁকে ভয়ানক চঞ্চল করে তোলে। শুধু প্রবন্ধ ও কবিতা লিখে সহজ পুরস্কার বা প্রশংসা পেয়ে তিনি তৃপ্ত হ'তে পারলেন না। তাঁর সমাজের সমস্যা, তাদের ভবিষ্যত তাঁর সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে দিল, এমনি সময়ে তিনি ফিরে এলেন বাংলায়। এসেই দেখতে পেলেন সমগ্র বাঙ্গালী জাতির বঙ্গভঙ্গকে বানচাল করার জন্য মৃত্যুপণ সংগ্রাম। দেখলেন দিকে দিকে বিপ্লবী জাগরণ। তরুণ মৌলানাও আর এ সংগ্রামের স্রোত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারলেন না। নিরাপদ দূরত্ব থেকে বিদ্রোহের বাণী দিয়ে কাজ শেষ করাকে তিনি অপরাধ বলে ভাবতেন। বাংলার সেই অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো, তিনিও ভারতের মুক্তিসংগ্রামের সৈনিক হিসেবে স্বাক্ষর রেখে যাবেন স্থির করলেন। বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে তিনি বার করলেন আর একটি পত্রিকা "অল হিলাল" ১৯১২ সালে। আন্দোলনকে নির্দ্দিষ্ট পথে নিয়ে যেতে, প্রেরণা দিতে ও শক্তি যোগাতে এ কাগজ এল এগিয়ে। বিদেশী সরকার তার সাম্প্রদায়িক ভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত শুরু করেছে। জাগ্রত মুসলিম সমাজকে এ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সুচতুর জাল বিস্তার করা হয়েছে। ঠিক এই সময়ে 'অল হিলাল' এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য মুসলিম যুবশক্তিকে আহ্বান জানালো। মুসলিম সমাজের এক বিরাট অংশ এগিয়ে এল সংগ্রামের মধ্যে। 'অল হিলালে'র জনপ্রিয়তা গেল অভূতপূর্ব্বভাবে বেড়ে। কাগজের বিক্রয়ের সংখ্যা এসে দাঁড়ালো ৩০ হাজারের কাছাকাছি, (তখনকার দিনে এটা কল্পনাতীত),—এদিকে শুরু হয়ে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ। বৃটিশ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। মৌলানাও আবার লেখা ছেড়ে এসে দাঁড়ালেন মাঠে, ময়দানে, জনতার সামনে, বক্তৃতা শোনবার জন্য হাজারে হাজারে লোক জমা হ'তে লাগলো। নিরুপায় সরকার যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাবে এবং মাদ্রাজে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিল। তাতেও নিশ্চিন্ত হ'তে না পেরে তাঁকে বাংলা থেকেও বহিস্কার করে রাঁচীতে অন্তরীণ করে রাখলো।

১৯২০ সালে মৌলানা অন্তরীণ মুক্ত হন। ভারতবর্ষ তখন এক বিরাট পরিবর্ত্তনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃসংশ হত্যাকাণ্ড, রোলাগুবিল, তার উপর খিলাফতের অবিচার সমস্ত ভারতবর্ষকে বিক্ষুব্ধ করে তুল্লো। হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকলের মধ্যেই এক লৌহদৃঢ় মৈত্রী বন্ধন গড়ে উঠলো। এই সময়েই দিল্লীতে মৌলানার দেখা হয় মহাত্মা গান্ধীর। তখন দেশের সকল বড় বড় নেতারা সেখানে এসেছিলেন এইসব অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে লাটের কাছে দরবার করতে। বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, মহম্মদ আলী, সৌকৎ আলী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইত্যাদি সকল দলের নেতারাই উপস্থিত।

কিন্তু তাদের ফিরতে হল রিক্ত হস্তে। ভিক্ষায় কোন ফল ফলবেনা সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল। আর কিছু দিনের মধ্যে গান্ধীজী অসহযোগ সংগ্রামের কর্ম্মপন্থা পেশ করলেন দেশের সামনে। মৌলানা আজাদ এলেন এগিয়ে, দেশময় ঘুরে ঘুরে এই অসহযোগের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। নিখিল ভারত খিলাফৎ সম্মেলনের সভাপতি হিসেবেও মুসলমান সম্প্রদায়কে তিনি নির্দ্দেশ দিলেন এ সংগ্রামে যোগ দিতে।

দেশব্যাপী সাড়া পড়ে গেল। কাউন্সিল, স্কুল, কলেজ, কোর্ট, আফিস সব শূন্য হয়ে গেল। কোটি কোটি টাকা চাঁদা উঠলো শুরুতেই। আজাদ তাঁর নিজেকে সম্পুর্ণভাবে বিলিয়ে দিলেন সংগ্রামকে সফল করে তুলতে। তিনি খুব ভাল বক্তা ছিলেন না এবং আবেগ প্রবণ জনতাকে ক্ষিপ্ত করার ছলচাতুরীও তাঁর জানা ছিল না। তাঁর সহজ সরল সংগ্রামের আর কর্ম্মের বাণী সকলের মনে গিয়ে পৌঁছাত। তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধি, কঠোর সংকল্প, অকুণ্ঠ ত্যাগ আর অনলস কর্ম্মপ্রচেষ্টা সারা দেশব্যাপী দেশভক্তদের মন জয় করে নিল। ভারতের বৃটিশ শাসনে অবহেলিত ও বঞ্চিত মুসলমান সমাজ এতদিনে একজন নেতা খুঁজে পেল।

লাহোরের মুসলিম ধর্ম্মগুরুদের এক বিশেষ সভায় মৌলানাকে সমস্ত মুসলমান সমাজের "ইমাম" বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরু বলে ঘোষণা করার প্রস্তাব এল। কিন্তু মৌলানা তাতে সম্মতি দিলেন না। দেশের চারদিক থেকে এ দাবী উঠতে লাগলো, কিন্তু তিনি আবার রাজরোষে ধৃত হলেন। ১৯২৩ সালে তিনি যখন মুক্ত হন তখনও তাঁকে ইমাম হবার জন্য আবার অনুরোধ করা হয় সমস্ত ভারতীয় মুসলমানদের তরফ থেকে। কিন্তু তিনি তাতে আবার অসম্মতি জানান এবং তাদের জানিয়ে দেন—কারো পক্ষে এরকম একটা পদ গ্রহণ করা উচিত নয় এবং তাঁকে যেন আর এ বিষয়ে অনুরোধ না করা হয়। তিনি স্বেচ্ছায় মুসলমানদের শ্রেষ্ঠতম সম্মান এমনিভাবে ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু সমস্ত জনসাধারণের মনে তাঁর আসন পাকা হয়ে গেল।

১৯২৩ সালের শেষের দিকে যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে যখন গভর্ণমেণ্ট এক বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন করলেন দেশবাসী তখন রুখে দাঁড়াল তার প্রতিবাদে। মৌলানা আজাদ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উপর ভার পড়ল বাংলাকে সংঘবদ্ধ করার। তাঁরা বক্তৃতা দিয়ে সভাসমিতি করে সমস্ত দেশকে তোলপাড় করে তুল্লেন। অন্যান্য প্রদেশেও কংগ্রেস নেতারা প্রতিবাদ আন্দোলন চালাতে লাগলেন তীব্রভাবে, শুরু হোলো ধড়পাকড়। আজাদ ও দেশবন্ধু বন্দী হোলেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে মৌলানার একবছর সাজা হল।

ভারতবর্ষের সে এক মহান দিন। জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলিম মিলনের রাখি বন্ধন হোলো, ভারতের স্বাধীনতা যেন হাতের মুঠোয় এসে গেল।

গান্ধীজি আলী ভ্রাতৃদ্বয় আর আজাদকে সঙ্গে নিয়ে দেশময় ঘুরে মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে লাগলেন, চারদিকে হিন্দু মুসলিম মিলনের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যেতে লাগল। সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর যেন মুহূর্ত্তেই ভেঙ্গে সব একাকার হয়ে গেল।

কিন্তু এ অবস্থা টিকল না বেশী দিন। কেন টিকল না সে এক কলঙ্কময় কাহিনী। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত জয়ী হোলো। দেশময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বিস্তৃত হ'য়ে পড়ল। সেই সময় মৌলানা আজাদ এই সর্ব্বনাশা বিরোধকে ঠেকাবার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, এবং যেটুকু সাময়িক সাফল্য অর্জ্জনও করেছিলেন তাঁর জন্য তিনি সমগ্র দেশবাসীর কৃতজ্ঞভাজন।

গান্ধীজি ও মৌলানা আজাদের সকল রকম চেষ্টাকে ব্যর্থ করে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এদিকে আবার কংগ্রেসের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে মতানৈক্য দেখা দিল গান্ধীপন্থীদের। তখন দিল্লীতে কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে মৌলানা এক কর্ম্মপন্থার সন্ধান দেন যার ফলে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে গেল। সে সময় মৌলানা আজাদ যে দূরদর্শিতা ও অভ্রান্ত নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে তিনি সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করেছিলেন।

কিন্তু কংগ্রেসের প্রভাব যতই বেড়ে যাক্—হিন্দু মুসলিম বিরোধের কোনই মীমাংসা করা সম্ভব হোলোনা, দুই পক্ষের নেতাদের সভা ও সলাপরামর্শে কোন ফল হোলোনা। দিনের পর দিন ব্যবধান বিস্তৃততর হতে লাগলো সকল সাধু প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে। তখন এ ধারণা কংগ্রেস নেতাদের মনে দৃঢ় হোলো, যতক্ষণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশ থেকে বিদেয় না নিয়েছে ততদিন সাম্প্রদায়িক ঐক্য অসম্ভব। গান্ধীজি আবার সংগ্রাম ঘোষণা করলেন ১৯৩০ সালে। এ সংগ্রামে যে শত শত মুসলিম যোগ দান করেছিলেন তারো একটী কারণ মৌলানা আজাদের প্রভাব।

এর কিছুদিন পরে গান্ধীজির সঙ্গে তখনকার লাট আরউইনের এক চুক্তি হয়। সংগ্রামের বন্দী যোদ্ধারা ছাড়া পেলেন। কয়েক বছর পরে কংগ্রেস ৩১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টাতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল। এবার কিন্তু আজাদের উপর ভার পড়ল ৭টা প্রদেশের মন্ত্রিসভাকে এবং অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেসী দলগুলিকে পরিচালনা করবার। পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটি নিযুক্ত হোলো তিনজনকে নিয়ে তার সভ্য হোলেন মৌলানা আজাদ, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ আর বল্লভভাই প্যাটেল। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক জন গুন্থার লিখেছিলেন, আজাদ হচ্ছেন কমিটির বুদ্ধিকেন্দ্র, রাজেনবাবু কমিটির হৃদয় আর সর্দ্দার প্যাটেল হচ্ছেন কমিটির দৃঢ়মুষ্টি। বাস্তবিকই যখনই কোন গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে কংগ্রেসের মধ্যে, তখনই মৌলানা আজাদের তীক্ষ্ন বুদ্ধি সমস্যার

জালকে ছিন্ন করেছে। ১৯৩৯ সালে সিন্ধু মন্ত্রিসভাকে নিয়ে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন গান্ধীজি বল্লেন, এর একমাত্র সমাধান করতে পারেন মৌলানা সাহেব। এমনি অনেক ঘটনা আছে যা থেকে বোঝা যায় আজাদ শুধু বিদ্রোহী সংগ্রাম পরিচালনায় নয় জটিল সমস্যা সমাধানেও সিদ্ধ হস্ত।

১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন চলছে। বিদেশী শাসক ৪০ কোটি নরনারীর মতামত না নিয়ে যখন ভারতবর্ষকে এই ধ্বংসলীলায় যোগদান করতে বাধ্য করলে তখন সমস্ত দেশ অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। এদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অত্যাচার আর অন্যদিকে উন্মত্ত ফ্যাসিবাদের ধ্বংসযজ্ঞ ভারতের এই চরম সংকটময় মুহূর্ত্তে মৌলানা আজাদ নির্ব্বাচিত হলেন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি রামগড় অধিবেশনে। এসময়ে গান্ধীজি বলেছেন "জাতির এরকম বিপদের সামনে মৌলানা সাহেব আবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন তার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে এটা যেন কেউই ভুলে না যায়।" গান্ধীজিও কংগ্রেসের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতারা ঠিক জানতেন যে এরকম সংকটে কংগ্রেসের সভাপতি হবার যোগ্যতম ব্যক্তি হচ্ছেন মৌলানা আজাদ। পরবর্ত্তী ভারতের ইতিহাসও তার প্রমাণ। ১৯৪২এর ৯ই আগষ্ট যখন নেতারা নিক্ষিপ্ত হলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তখন দেশের উন্মত্ত মুক্তিপাগল জনতাকে কেউই নিয়ে যেতে পারলনা বিজয়ের পথে কেউই ঠেকাতে পারলনা মহামারী ও অগণিত নরনারীর মৃত্যু।

তারপর কারাগার থেকে মুক্ত হয়েও তিনি বছর খানেক কংগ্রেসের সভাপতির আসনে ছিলেন এবং দিল্লী ও সিমলায় বৃটিশকর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে যে বোঝাপড়ার চেষ্টা হয়েছিল তাতেও তিনি কংগ্রেসের মুখপাত্র হয়ে যে স্বচ্ছদৃষ্টি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা আজ সকলেরই জানা কথা। তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তাঁর নেতৃত্ব ও পরামর্শ যে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে অপরিহার্য্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একরকম ১৬ বৎসর বয়স থেকেই শুরু করে মৌলানা আজাদ আজ ৩০ বছরেরও উপর ভারতের জাতীর আন্দোলনে নেতৃত্ব করে আসছেন। তাঁর খ্যাতি আজ সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যান্য দেশের বড় বড় নেতারা তাঁর বন্ধু। তিনি কামালপাশা, জগলুল পাশার মত দেশনায়কদের সঙ্গে নিয়মিত পত্র ব্যবহার করতেন। পৃথিবীর অনেক মনীষীই তাঁর প্রতিভা ও মহত্বে মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খুব কমই জানা গেছে। তার কারণ হল—তাঁর নিরহঙ্কার শক্তি ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা। নেতারা যখন জেল থেকে মুক্তি পেলেন ছোট বড় সব নেতাদের সম্বর্দ্ধনা করার জন্য দেশব্যাপী সমারোহ পড়ে গেল। অভ্যর্থনা সভা, ফুলের মালা আর টাকার তোড়ার ছড়াছড়ি চারদিকে, অথচ

মৌলানা আজাদ এসব যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছেন। তিনি পারতপক্ষে সভাসমিতি শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে যোগদিতে সব সময়ে অনিচ্ছুক। তাঁর কর্ম্মব্যস্ততার ফাঁকে তিনি বিশ্রাম নেন বইএর আড়ালে, জ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগ কোন কারণেই শিথিল হয়নি। কাজেই কাজের ফাঁকে সময় পেলেই বইএর মধ্যে তিনি ডুবে থাকেন। সভাসমিতি বা শোভাযাত্রার প্রতি তাঁর আকর্ষণ যেমন নেই, তেমন নেই তাঁর কোন ঐশ্বর্য্যের বা বিলাসব্যসনের প্রতি মোহ। তিনি অনেক সম্মানের ও ক্ষমতার সুযোগকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অর্থহীন স্তুতিবাদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা তাঁর চিরদিন। তাঁর পরিচয় মেলে কিছুদিন আগের একটা ঘটনায়। মৌলানা সাহেব যখন 'আহম্মদ নগরের দুর্গে বন্দী তখন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু হয়। তিনি যখন জেলমুক্ত হলেন তখন তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ও ধনী গুণমুগ্ধ ভক্তেরা তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মৌলানা যখন এ খবর জানতে পারেন তখন তিনি সকলকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে বাধ্য করেন। তিনি বল্লেন তাঁর কাছে তাঁর স্ত্রীর যতই মূল্য থাক এবং তাঁর স্ত্রী ব্যক্তিগত জীবনে যতই মহৎ হোন্‌না কেন—তিনি এমন কোন কাজ সমাজের বা দেশের জন্য করে যাননি যার জন্য দেশবাসী তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে। উদ্যোক্তারা সকলে অবাক হয়ে যান কিন্তু যাদের সঙ্গে মৌলানা সাহেবের হৃদয়ের পরিচয় ছিল তাঁরা মোটেই বিস্মিত হননি। তাঁরা জানতেন মৌলানার মত ন্যায়নিষ্ঠ নিস্বার্থ ত্যাগী জগতে সত্যই দুর্লভ।

হৃদয় রক্ষিত

কুরী পরিবার

ছোট্ট একটি মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, "আমার দোষ নেই আমি কি করব। এযে বড্ড সোজা।" আর তার মা, বাবা ও বড় বোন অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ব্যাপার কি! মেয়েটির বাবা তার বড় বোন ব্রনিয়ার পড়া নিচ্ছিলেন, ছোট বোন সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়া নেওয়া শুনছিলো। ব্রনিয়া ভাল করে রিডিং পড়তে পারছিল না। মেয়েটি হঠাৎ অধীর হয়ে বড় বোনের হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে গড়্ গড়্ করে রিডিং পড়ে গেল। বুঝতেই পার চার বছরের মেয়ে যাকে কেউ কোন দিন অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত করায় নি সে যদি হঠাৎ গড়্ গড়্ করে রিডিং পড়ে যায় তাহলে কি রকম ব্যাপার হয়। কিন্তু বড়দের এই রকম হতভম্ব ভাব দেখে মেয়েটি ভাবল যে সে নিশ্চয় একটা বড় রকমের অপরাধ করেছে এবং বই ফেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এই ছোট্ট মেয়েটি কে জান? পোল শিক্ষাব্রতী ডক্টর স্কলোডাওসকার ছোট মেয়ে মারি —যিনি ভবিষ্যতে রেডিয়াম আবিষ্কার করেন এবং দু'দুবার নোবেল পুরস্কার পান। এই সৌভাগ্য এখন পর্য্যন্ত আর কোন লোকের ভাগ্যে ঘটেনি। আজ এই যে চতুর্দ্দিকে এত এটম বোমার নাম শোনা যাচ্ছে তার উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে মারির রেডিয়ম আবিষ্কারের ফলে।

তোমরা হয়তো ভাবছো তার এই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাওয়া মাত্র বড়রা লেগে গেলেন যাতে সে দশ বছরেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে পারে। কিন্তু মারির বাপ মার চিন্তাধারা একটু অন্য পথে চলতো। তাঁরা চার বছরের মেয়েকে মোটেই বই নিয়ে বসে থাকতে উৎসাহ দিলেন না। বাড়ীতে সোনার জলে নাম লেখা সুন্দর সুন্দর বইয়ের অভাব ছিল না কিন্তু তাঁরা সে সব বই মেয়ের নাগালের বাইরে রাখতে আরম্ভ করলেন এবং মেয়েকে পড়ার চাইতে খেলাধুলাতেই বেশি উৎসাহ দিতে লাগলেন।

ফলে হলো এই যে মারির বাল্যকাল ও কৈশোর সাধারণ ছেলেমেয়ের মতই পরিমিত খেলাধুলা ও লেখাপড়ার মধ্যে দিয়েই কেটেছিল। অবশ্য এ সত্বেও মারি তাঁর ক্লাসের সেরা ছাত্রী ছিলেন এবং ১৮৮১ সালে যখন তিনি মধ্য শিক্ষা শেষ করে স্কুল থেকে বেরুলেন তখন সেরা ছাত্রী হিসাবে স্বর্ণপদক উপহার পান। তবে এই স্বর্ণপদক উপহার তাঁর আগের দুই

ভাই বোনও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে পেয়েছিলেন। কাজেই তখন পর্য্যন্ত মারি ও অন্য ভাই বোনদের মধ্যে বুদ্ধির দিক দিয়ে কোন তফাৎ নজরে আসে না। তবে একটা বিষয়ে মারির সঙ্গে অন্য ছেলে মেয়েদের তফাৎ ছিল। সেটা হচ্ছে তাঁর অদ্ভুত মনঃসংযোগ শক্তি। একবার একটা বই নিয়ে বসলে তিনি বিশ্ব সংসার ভুলে যেতেন। তাঁর কানের কাছে তখন কামান দাগলেও কানে ঢুকতো না। ভাই বোনেরা তার এই নির্বিষ্টচিন্তার সুযোগ নিয়ে অনেক রকম মজার মজার কাণ্ড করতেন। একদিন ভাই বোনেরা মিলে এক মজার কাণ্ড করেন। মারি খুব মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছিলেন। তাঁর চারিপাশে চেয়ার সাজালেন এবং এই চেয়ারগুলোর উপরে আর দুটো চেয়ার দিয়ে একটা পিরামিড মত তৈরি করলেন। চেয়ারগুলো এমন ভাবে সাজানো হোলো যে মারি একটু নড়তে চড়তে গেলেই সবশুদ্ধ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে। মারির চতুর্দ্দিক ঘিরে এতগুলো ছেলেমেয়ে এতক্ষণ ধরে চেয়ার সাজালো এত গণ্ডগোল কোরলো কিন্তু মারির কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তাঁর চোখ একবারও বই থেকে উঠলো না। অনেকক্ষণ বাদে বইটা শেষ করে যেমন তিনি ঘাড় সোজা করে আড়মোড়া ভেঙ্গেছেন অমনি হুড়মুড় করে সমস্তটা তার ওপরে ভেঙ্গে পড়লো।

যাই হোক—মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে মারি একবছর রাজকীয় আলস্যে কাটালেন। এই সময় তিনি শুধু গ্রামে গ্রামে তাঁর আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে বেড়ান। ইতিমধ্যে পরিবারে দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো। এই সময় পোলাণ্ডের পশ্চিমাংশ রাশিয়ার জারের অধীনে ছিল। রাশিয়ানরা পোলাণ্ডকে বোলতো রাশিয়ার একটা প্রদেশ ও পোল ভাষা একটা প্রাদেশিক ভাষা। জার সরকার আইন করে পোল ভাষার চর্চ্চা বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করেছিল। রাশিয়ান ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করেছিল। তাছাড়া পরাধীন জাতির প্রাপ্য অন্য অনেক রকম দুর্ভোগ ও অপমানতো সহ্য করতেই হোতো। পোলাণ্ডের লোকেরা বিশেষ করে পোল শিক্ষাব্রতীরা বাইরে অত্যন্ত বাধ্য ভাবে নানা রকম অপমানের নিয়ম কানুন মেনে চললেও ভিতরে ভিতরে তাঁরা পোল ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চ্চা করতেন এবং ছেলেমেয়েদেরও শেখাতেন যাতে তাদের মনে জাতীয় প্রেম জাগে। এই রকম একটি ঘটনা নিয়ে মারির বাপের সঙ্গে তার রাশিয়ান উপরওয়ালার মনোমালিন্য হয় এবং তারি ফলে তাঁর মাইনে কমিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া তাঁর সারা জীবন ধরে জমানো ৩০,০০০ রুবল তাঁর এক আত্মীয়ের কথায় ব্যবসা করতে গিয়ে লোকসান দেন। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার সঙ্গতিও তাঁর থাকেনা। অথচ মেয়েদের বিশেষ করে বড়জনের এবং মারির খুব ইচ্ছা যে প্যারিসে গিয়ে একজন ডাক্তারী এবং আর একজন সরবোঁনের

বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হন। অগত্যা মেয়েদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয়। তাঁরা প্রথমে ভাবলেন যে বাড়ীতে ছাত্র ছাত্রী পড়িয়ে টাকা জমিয়ে সেই টাকায় আবার নিজেরা পড়াশুনা করবেন কিন্তু দেখা গেল কার্য্যত তা সম্ভব নয়। টাকা এত কম জমে যে সেই টাকা জমিয়ে কিছু করবার চেষ্টা নেহাৎ পাগলামি।

তখন মারি প্রস্তাব করলেন যে তিনি যদি কোথাও গভর্ণেসের কাজ নেন তাহলে অনেক বেশী টাকা পাওয়া যাবে এবং তার থেকে কিছুটা জমাবেন ও কিছু বড় বোনকে দেবেন তাঁর ডাক্তারী পড়ার খরচ বাবদ। বড় বোন পাশ করে ডাক্তারী ব্যবসা শুরু করলে তখন মারি গিয়ে তাঁর বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করবেন। থাকা খাওয়ার খরচ লাগবে না এবং ইতিমধ্যে তাঁর হাতে যা জমবে তাই দিয়ে তিনি সরবোঁনের খরচ চালাতে পারবেন। মারি ছোট ও বয়স কম, কাজেই বড় বোনেরই আগে পাশ করা দরকার। বড়বোন প্রথমে কিছুতেই রাজী হন না। অনেক তর্কাতর্কির পর বড় বোন রাজি হলেন। তিনি গেলেন প্যারিসে ডাক্তারী পড়তে এবং মারি নিলেন গভর্ণেসের কাজ।

তিন বছর গভর্ণেসের কাজ করে তিনি বোনের পড়ার খরচ যোগান। ইতিমধ্যে ডক্টর স্কলোডাওসকা পুরোনো চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করে আর একটা অপেক্ষাকৃত ভাল চাকরী জোগাড় করেন ও বড় মেয়ের পড়ার খরচ তিনি দিতে সক্ষম হন। মারি তখন আবার বাড়ী এসে বাপের কাছে থাকতে শুরু করেন। বড় বোন প্যারিসে ডাক্তারি পড়তে পড়তে সেই খানেই ব্লুস্কি নামে পোল ছাত্রকে বিয়ে করেন এবং দুজনে মিলে ডাক্তারী ব্যবসা শুরু করেন। ঘর গুছিয়ে বসেই আগেকার চুক্তি অনুসারে মারিকে ডেকে পাঠালেন সোরবোঁনে ভর্ত্তি হবার জন্যে। প্যারিসে এসে মারি প্রথমে বড় বোনের বাড়ীতেই থাকেন কিন্তু তাতে তাঁর পড়াশুনার বড়ই ক্ষতি হতে লাগলো। ব্লুস্কিদের বাড়ীতে সারাক্ষণই বন্ধুবান্ধবের ভিড় লেগে থাকতো এবং অত গোলমালে মারির পড়াশুনা কিছুই হোতো না। তাছাড়া ইউনিভারসিটি থেকে বাড়ীটা অনেক দূরে ছিল। যাওয়া আসার বড়ই অসুবিধা হত। অতএব তিনি কলেজের কাছে একটী বাড়ীর একটা চিলেকোঠা ভাড়া নিলেন। কিন্তু এখানে আসায় আবার খরচ বেড়ে গেল। তাছাড়া মুস্কিল হ'ল যে মারি মোটেই রাঁধতে জানতেন না। শুধু জানতেন না নয় পড়াশুনা ছাড়া অন্য কিছুতে মন দেওয়াকে তিনি সময়ের অপব্যয় বলে মনে করতেন। তাই রান্নাবাড়ার পাট একেবারেই তুলে দিলেন। কিন্তু রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে দিনে তিন বার খাওয়ার মত সঙ্গতিই বা তাঁর কোথায়। অতএব কোন কোন দিন আধপেটা খেয়েই তাঁকে কাটাতে হত। এই রকম মৌলিক জীবন যাত্রার ফলে তিনি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েন যে একদিন তিনি কলেজেই অজ্ঞান হয়ে যান। সেই খবর মারির এক সঙ্গী মারির

বোনের কাছে পৌঁছে দিলে মারির ভগ্নীপতি ব্লুস্কি এসে তাঁকে নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে কয়েক দিন খাইয়ে দাইয়ে আবার চাঙ্গা করে দেন। কিন্তু কয়েক দিন পর তিনি নিজের চিলে কোঠায় ফিরে এসে আবার হাওয়া খেয়ে থাকতে লাগলেন। অবশ্য এবার থেকে তাঁর বড় বোন তাঁর খাওয়া দাওয়ার ওপর আর একটু বেশী নজর রাখতে লাগলেন। যাই হোক এই কৃচ্ছ্র সাধনের পুরস্কার মারি পেয়েছিলেন? পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল তাঁর নাম সবার আগে।

প্রায় এই সময়ই মারির পিয়ের কুরীর সঙ্গে আলাপ হয়। কিছু দিন পরে তিনি কুরীকে বিয়ে করে মাদাম কুরী হন।

কুরীর সঙ্গে যখন মারির আলাপ হয় তখন পিয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় বেশ নাম করেছেন। পিয়ের কুরী ও তার ভাই জ্যাক কুরী দু'জনেরই ছোট বেলা থেকেই বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক ছিল। পিয়েরের বাবা ডক্টর কুরি অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করে ছিলেন যে পিয়ের যে রকম স্বাধীনচেতা ও কল্পনাপ্রবণ তাতে ইস্কুলের নিয়মের যাঁতাকল তাঁর মনের পক্ষে ভাল ফলদায়ক হবে না। ইস্কুলে না দিয়ে তিনি তাঁকে নিজেই বাড়ীতে পড়ানো শুরু করেন। এর ফলও খুব ভাল হয়েছিল। পিয়ের ষোল বছর বয়সেই •সরবোঁন থেকেই বি, এস্‌সি ও আঠার বছর বয়সে এম, এস্‌সি পাশ করেন।

তোমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথও তাঁর কল্পনাপ্রবণ স্বপ্নময় মন নিয়ে ইস্কুলের হৃদয়হীন এক ধাঁচে ঢালা নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইস্কুল ছেড়ে ছিলেন। কিন্তু তার জন্য তাঁকে ঘরে বাইরে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। তাঁর অবস্থাটা কেউ পিয়েরের বাবার মত সহৃদয় বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করে দেখেন নি, বরং তাঁর এক আত্মীয়া তখন বলেছিলেন, আমরা সকলেই আশা করেছিলাম রবি বড় হয়ে মানুষের মত মানুষ হবে, কিন্তু সে আশাই নষ্ট হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে ১৮৯৭ সাল এসে গেল। এর মধ্যে মারি অঙ্কশাস্ত্রে একটা ও তাছাড়া আর একটা ডিগ্রী লাভ করলেন। ছোট একটা মৌলিক প্রবন্ধও লিখলেন। বাকী রইল ডক্টর ডিগ্রী পাওয়া। তার জন্যে 'থিসিস' লিখতে হবে। কি বিষয়ে থিসিস লিখবেন?

কিছু দিন আগে 'এক্স্-রে' আবিষ্কার হয়েছে, সেই বিষয়ে পরীক্ষা করতে করতে বেকরেল সাহেব বলে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক রসায়ন শাস্ত্রে ইউরেনিয়ম্ নামে যে ধাতু আছে সেটা যে স্বয়ংপ্রভ তার প্রমাণ পেয়েছেন। স্বয়ংপ্রভ অর্থাৎ এই ধাতুটি থেকে আপনা হতেই একরকম অদৃশ্য রশ্মি বিকীরণ হয়। এই রশ্মির একটা অদ্ভুত গুণ এই যে সাধারণ আলোক রশ্মি যে সব বস্তু ভেদ করতে পারে না এই রশ্মি সেই সকল বস্তু অবলীলাক্রমে ভেদ করে যায়। বেকরেল

একদিন ইউরেনিয়ামের একটা লবণ নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে কোন কারণে লবণটা একটা দেরাজের মধ্যে রেখে চলে যান, পরে দেখেন যে দেরাজের মধ্যে কতকগুলি ফোটোগ্রাফের প্লেট ছিল—বেশভাল করে মোড়া যাতে আলো না লাগে—সেগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে আলো লেগে। এইভাবে স্বয়ংপ্রভ ধাতুর আবিষ্কার হয়।

কুরীরা ঠিক করলেন যে এরই উপর গবেষণা করতে হবে। কিন্তু গবেষণা যে করবেন ল্যাবরেটরি কোথায়? মারি অনেক চেষ্টা করেও সুবিধা মতন একটা জায়গা পেলেন না। অগত্যা তাঁর স্বামীর কলেজের একটা ছোট্ট অন্ধকার এঁদোপড়া ঘরে—যেটা গুদাম ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হত সেই ঘরে—তাঁর গবেষণা শুরু করলেন। নানা রকম পরীক্ষা করতে করতে মারির মনে হল যে ইউরেনিয়ম ছাড়া আরও স্বয়ংপ্রভ পদার্থ তো থাকতে পারে। মারি একে একে রসায়ন শাস্ত্রে জানা যত মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ আছে সব পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। করতে করতে আর একটা ধাতু পাওয়া গেল যা স্বয়ংপ্রভ, তার নাম থোরিয়ম্।

এরপর তিনি আরম্ভ করলেন এইসব ধাতুর প্রভাশক্তির পরিমাপ করতে। দেখা গেল যে প্রভাশক্তির তীব্রতার সঙ্গে ধাতুর পরিমাণের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। এরপর মারি আরম্ভ করলেন সেই সব খনিজ পদার্থের প্রভাশক্তির তীব্রতার পরিমাপ করতে যার মধ্যে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম আছে। এবারে তিনি খুব একটা আশ্চর্য্য জিনিষ দেখলেন। কতকগুলি খনিজ দ্রব্যে যে পরিমাণ ইউরেনিয়ম ও থোরিয়াম থাকা সম্ভব সেই অনুপাতে প্রভাশক্তির তীব্রতা চারগুণ বেশী। তার মানে সেই খনিজ দ্রব্যের মধ্যে থোরিয়ম ও ইউরেনিয়ম ছাড়া আরও তীব্রতর স্বয়ংপ্রভ কোন ধাতু আছে। কিন্তু মারি তো সব রাসয়ানিক দ্রব্যই পরীক্ষা করেছেন, তবে—এটা নিশ্চয় নতুন কোন মৌলিক পদার্থ যা রসায়ন শাস্ত্রে জানা নেই।

এপর্য্যন্ত মারি একাই পরীক্ষা করছিলেন, এবার পিয়ের এসে তার সঙ্গে যোগ দিলেন।

পিচ্‌ব্লেণ্ড নামে একটা খনিজ পদার্থে ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম্ পাওয়া যায়, কিন্তু পিচব্লেণ্ডের প্রভাশক্তির তীব্রতার অনুপাতে ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম্ অংশ অনেক কম। অতএব পিচব্লেণ্ডের মধ্যে অধিক শক্তিশালী স্বয়ংপ্রভ মৌলিক পদার্থ আছে। এই পিচব্লেণ্ড থেকে কুরিরা অনেক রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও অমানুষিক ধৈর্য্যের ফলে ১৮৯৮ সালে একটা নয় দুটী মৌলিক পদার্থ বার করেন। একটির নাম তাঁরা দেন "পলোনিয়ম" মারির স্বদেশ পোলাণ্ডের নাম স্মরণে, আর একটির নাম দেন "রেডিয়ম্"। এই পদার্থগুলি বার করা কি রকম শ্রমসাধ্য তা এতেই বুঝতে পারবে যে আট টন্ পিচব্লেণ্ড থেকে মাত্র এক গ্রাম রেডিয়াম পাওয়া গিয়েছিল।

এই রকম একটা আশ্চর্য্য ও বৈপ্লবিক গবেষণার জন্য কুরি দম্পতি ফরাসী জনসাধারণ বা বিদ্বৎমণ্ডলী কারো কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য বা উৎসাহ পর্য্যন্ত পান নি। তাঁদের

কাজের প্রথম আদর হয় সুইজারল্যাণ্ডে। এই গবেষণার ফল বের হওয়ার পরেই জেনেভা ইউনিভারসিটি থেকে পিয়েরকে সেখানে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হবার জন্য ডেকে পাঠায়। পিয়ের প্রথমে রাজী হয়েছিলেন। পরে তাঁদের নিজেদের গবেষণার কাজে অসুবিধা হওয়াতে সে কাজ ছেড়ে দেন। এতে টাকার দিক থেকে তাঁদের অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

১৯০৩ সালে নোবেল পুরস্কার ও ডেভি মেডেল পাবার আগে পর্য্যন্ত ফরাসী দেশে তাঁরা কোন আদর পাননি। এমন কি ১৮৯৮ সালে সরবোঁনে রাসায়নিক বিজ্ঞানের অধ্যাপকের একটা পদ খালি হয়। পিয়ের কুরী সে পদটির জন্য আবেদন করেন কিন্তু একটা অত্যন্ত বাজে ছুতোয় সে পদ তাঁকে দেওয়া হয় নি। এই সময় কুরি মাত্র পাঁচশ ফ্রাঁ মাইনেতে পদার্থ বিজ্ঞান স্কুলে কাজ করতেন। তখন তাঁর বড় মেয়ে আইরিন হয়েছে। তাছাড়া তাঁদের গবেষণার সব খরচই নিজেদের দিতে হয়, কাজেই খরচ অনেক বেড়ে গেছে। ওই মাইনেতে আগে কুলোলেও এখন আর কুলোয় না।

যাই হোক, জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাড়ার পর মারি সেভার্সে মেয়েদের কলেজে একটা কাজ জুটিয়ে নেন। পিয়েরও পদার্থ ও রসায়নবিদ্যা স্কুলে একটা কাজ নেন। এর ফলে অবস্থা অনেক সহজ হয়ে আসে বটে কিন্তু গবেষণার সময় অনেক কমে যায়। এই ভাবে অমানুষিক পরিশ্রম করেও তাঁরা তাঁদের নিজেদের গবেষণা ঠিক চালিয়ে যেতেন। ১৯০৩ সালে যখন সুইডেনের একাডমি সেই বছরের রসায়ন শাস্ত্রের নোবেল পুরস্কার কুরি দম্পতি ও বেকরলের মধ্যে ভাগ করে দিল এবং ইংলণ্ড থেকে রয়েল সোসাইটি তাঁদের ডেভি মেডেল পুরস্কার দিল তখন ফরাসীদের টনক নড়ল। তখন সরবোঁনে পিয়েরের জন্যে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের একটা বিশেষ পদ সৃষ্টি করা হল, এবং মারিকে তাঁর সহকারী করা হল। এমনকি ফরাসী সরকার তখন তাঁকে ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'লিজেন অব অনার' দিতে চাইল কিন্তু পিয়ের তা নিলেন না। ১৯০৫ সালে তাঁকে ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্য করা হয়। এর আগে আর একবার তিনি তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে সভ্য পদপ্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু সেবার তাঁর বিরুদ্ধে যে দাঁড়িয়েছিল সেই ভোটে জিতে যায় এখন কিন্তু তার নাম আমরা প্রায় কেউই জানি না। মারিকে তো কোনদিনই ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্য করা হয়নি স্ত্রীলোক বলে। দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে তাঁকে ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্য করার জন্য একটা জোরালো আন্দোলন হয়। তার ফলে তাঁর নাম আবার প্রস্তাবিত হয়, এবার তিনি এক ভোটে হেরে যান। অবশ্য মারির নিজের এই সব অবান্তর সম্মান লাভের কোন ইচ্ছাই কোনদিন ছিল না।

১৯ শে এপ্রিল ১৯০৬ সালে মারির জীবনে আবার দুর্য্যোগ ঘনিয়ে এল। বিনা মেঘে

বজ্রাঘাতের মত পিয়ের কুরী একদিন পথে চলতে চলতে হঠাৎ মস্তবড় ঘোড়ায় টানা ওয়াগন চাপা পড়ে মারা গেলেন। মারি এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় এত অভিভূত হয়ে পড়েন যে বহু দিন পর্য্যন্ত তাঁর মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাননি। তাঁর আত্মীয় স্বজনরা তাঁর জন্য দস্তুরমত দুর্ভাবনাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। যাই হোক্ আস্তে আস্তে মারি আবার তাঁর মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেয়ে নিজের গবেষণায় মন দিতে পারলেন। ফরাসী সরকার পিয়েরের জন্য যে পদ সৃষ্টি করেছিলেন সে পদে মারিকে বসালেন। এরপর ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত তিনি রেডিয়াম সম্বন্ধে বহু নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর এই সব গবেষণার জন্য তাঁকে ১৯১১ সালে দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। রেডিয়ম্ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ফরাসী সরকার একটি আলাদা রেডিয়ম্ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাদাম কুরীকেই তার পরিচালনার ভার দেন। এই ইন্‌স্টিটিউটে বিশেষ করে ক্যানসার রোগে রেডিয়মের প্রয়োগ সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মারির পরিচালনায় এই রেডিয়াম ইনস্টিটীউট আহত সৈনিকদের অনেক উপকারে আসে।

মারি চিরকালই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা পছন্দ করতেন এবং স্বামী মারা যাওয়ার পর তাঁর এই অভ্যাস আরও বাড়ে। অনেক জায়গা থেকে তাঁর ডাক আসত, কিন্তু তিনি কদাচিৎ কোথাও যেতেন। কেবল আমেরিকায় তিনি দুবার গিয়েছিলেন। একবার ১৯২০ সালে ও আর একবার ১৯২৯ সালে।

আমেরিকার একজন মহিলা সাংবাদিক বহুবার তার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেন কিন্তু মারির তরফ থেকে কোনবারই সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি। শেষে তিনি একদিন প্যারিসে এসে মারিকে এক চিঠি লিখলেন—"আমার বাবা বলতেন যে মানুষ অতি নগণ্য জীব কিন্তু আজ কুড়ি বছর ধরে আপনি আমার কাছে একমাত্র ধ্যানের বস্তু হয়ে আছেন।" এই চিঠি পাওয়ার পর মারি তার সঙ্গে দেখা করেন। কথায় কথায় মহিলা সাংবাদিকটি জিজ্ঞাসা করেন, "এই মুহূর্ত্তে জগতে সব চাইতে কাম্য আপনার কি?" মারি জবাব দেন—"একগ্রাম রেডিয়াম"। মারির নিজের গবেষণার জন্য তখনই এক গ্রাম রেডিয়াম দরকার ছিল। এক গ্রাম রেডিয়ামের দাম একলাখ টাকা। মহিলা সাংবাদিকটী আমেরিকায় ফিরে গিয়ে এক গ্রাম রেডিয়ম কেনার মত চাঁদা তোলেন। তারপর তিনি মারিকে চিঠি লিখলেন যে মারি যেন অনুগ্রহ করে আমেরিকায় এসে সেই একগ্রাম রেডিয়াম আমেরিকার সভাপতির হাত থেকে গ্রহণ করেন। মারি অনেক ইতঃস্তত করে মহিলাটির নির্ব্বন্ধাতিশয্যে রাজী হন এবং আমেরিকায় এসে সেই উপহার গ্রহণ করেন। তাঁকে স্বাগত করতে আমেরিকায় সকলে পাগল হয়ে গিয়েছিল। এমন

বিশ্ববিদ্যালয় এমন বিখ্যাত ইস্কুল এমন পণ্ডিত জন-সভা ছিল না যে যেখান থেকে তিনি নিমন্ত্রণ পান নি।

পোলাণ্ডে মারির নামে একটা রেডিয়ম ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছিল ১৯২৯ সালে। বরাবর তাদের রেডিয়মের অভাব হয়, টাকার অভাবে রেডিয়ম যোগাড় করা যাচ্ছিল না। কুরীকে তারা আবেদন জানাল যে তিনি কোন সাহায্য করতে পারেন কিনা। কুরীর মনে পড়ল তাঁর পুরানো আমেরিকান্ বন্ধুদের, তিনি সেই মহিলা সংবাদিককে আবার চিঠি লিখলেন যে তাঁরা আবার এক গ্রাম রেডিয়ম্ যোগাড় করে দিতে পারেন কিনা। তিনি আবার কুরীকে নিমন্ত্রণ করলেন নিজে এসে রেডিয়ম নিয়ে যাবার জন্য।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার কুরীরা ইচ্ছা করলে রেডিয়ম্ সংক্রান্ত যাবতীয় আবিষ্কার পেটেণ্ট করে অনেক টাকা রোজগার করতে পারতেন। এমন কি জগতের শ্রেষ্ঠ ধনিকদের একজন হতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এতই প্রবল ছিল যে তাঁরা যখন যা আবিষ্কার করেছেন জগতের লোকের সামনে তা মেলে ধরেছেন।

আইনস্টাইন বলেছেন, "স্বগামধন্য যাঁরা তাঁদের মধ্যে একমাত্র মাদাম কুরী যশের সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হননি।"

১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত মাদাম কুরী রেডিয়ম ইনষ্টিটিউট পরিচালনা করেছেন, তারপর তাঁর সুযোগ্য কন্যা আইরিনের হাতে তিনি এই পরিচালনার ভার ছেড়ে দেন। আইরিন ও তাঁর স্বামী দুজনে ১৯৩৫ সালে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৩৪ সালের মে মাস। মারি কাজ করতে করতে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করায় বাড়ী চলে গেলেন। বহুদিন থেকেই তাঁর শরীর খারাপ যাচ্ছিল কিন্তু মারি সেটা বরাবরই অগ্রাহ্য করে আসছিলেন। আর পারলেন না। শারীরিক অসুস্থতা তাঁকে বিছানা নিতে বাধ্য করলো। এই অসুখ তার শেষ অসুখ। ৪ঠা জুলাই ১৯৩৪ সালের ভোর বেলায় তাঁর শেষ নিশ্বাস ভোরের হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ডাক্তারা বলেন যে অনবরত কয়েক বছর ধরে রেডিয়ম রশ্মি শরীরের ভিতর গিয়ে হাড়ের ভিতরের মজ্জা আস্তে আস্তে নষ্ট করে দেয় এবং তারি ফলে মারির মৃত্যু ঘটে। বিজ্ঞানের জন্য এই আত্মবলিদান কেউ ভুলতে পারবে না।

নিরঞ্জন চন্দ্র মৈত্রেয়

মরিস থোরেজ

বিপ্লবীর বাল্য-ইতিহাস

সাম্য ও স্বাধীনতার জন্মভূমি ফ্রান্স, হিউগো-রলাঁর অমর পিতৃভূমি ফ্রান্স, ইয়োরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতির চির-নিকেতন ফ্রান্স। এই ফ্রান্সের মাটিতেই আজ আবার আগত দিনের পদধ্বনি বেজে উঠেছে। কাতারে কাতারে নিচেতলার মানুষ যারা কারখানায় লোহা গলায়, খামার জমিতে ফসল ফলায়, কামারশালে হাঁপরের সামনে হাঁটু গেড়ে কাস্তে শানায়, তারাই আজ সারি সারি মিছিলে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের বজ্রমুঠিতে নিয়ে এসেছে নতুন প্রভাতের অঙ্গীকার। একদিকে প্যারী শহরের স্বনামধন্য বিলাস প্রাচুর্য্য, অন্যদিকে নগর-উপান্তের কুৎসিৎ শ্রমজীবন, এই অসঙ্গতি নিয়েই ফ্রান্স বিশ শতক পর্য্যন্ত চলে এসেছিল। বাস্তিলের পতন ঘটে ১৭৮৯ সালে, কিন্তু শহরের নোংরাবস্তির পতন আজো সম্পূর্ণ হয়নি। ধনিক সভ্যতার এই আপাত বিরোধের মূলে যাঁরা কুঠারাঘাত কোরেছেন, স্বদেশকে মেকি স্বাধীনতার হাত থেকে উদ্ধার কোরবার জন্য এগিয়ে এসেছেন যাঁরা, ফরাসী দেশের সেই অম্লান সৈনিকদের নেতা হচ্ছেন মরিস থোরেজ।

থোরেজের জীবনকাহিনী যে শুধু থোরেজেরই তা নয়, সমগ্র ফ্রান্সদেশের নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামী জীবনেরই তা কাহিনী। তাই থোরেজের জীবনে ফুটে উঠেছে তাদেরি বজ্রদৃঢ় ক্ষমাহীন প্রতিবাদ, যারা এতদিন প্রভুর গোলায় ধান তুলে দিয়ে পেয়েছে শাস্ত্রের অমোঘ আশ্বাস যে ইহকালে ফলাকাঙ্খা ছাড়লে পরকালে স্বর্গ অক্ষয়।

মরিস থোরেজের জন্ম হয় ১৯০০ সালের ২০শে জুলাই। তার বাপ ঠাকুর্দা সবাই কয়লা খনির খেটে খাওয়া শ্রমিক। সারি সারি শ্রমিকদের ব্যারাক, ছোট ছোটো অন্ধকার কুঠরী। সেখান থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বেরিয়ে কয়লা খনির অতলখাদে কাজ কোরতে নামে; সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ভেঁপু বাজে, কালি-ম্লান মুখ নিয়ে যে যার গহ্বরে ফিরে যায়। এইভাবেই দিন যায় রাত পোহায়।···ছোটবেলাকার সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলি থোরেজের মনে আছে। সেই যে একদিন বিকেলে কিসের একটা আওয়াজ শোনা

গেল, তার পর পথ বেয়ে অসংখ্য মানুষের ভীড়। থোরেজও সেই ভীড়ের সাথে মিশে গিয়েছিলেন। জনস্রোত যখন 'মেরিকোর্ট' খনির কিনারে গিয়ে পৌঁছাল তখন সামনের লোহার কপাট বন্ধ হয়ে গেছে, লোহার টুপি পরা ঘোড়ায়-চড়া পুলিশেরা পাহারা দিচ্ছে। উসকো-খুসকো চুলে এক বুড়ী এসে ঠুস হয়ে পড়লো—'আমার ছেলে, আমার ছেলে'! ব্যাপারটা ক্রমে বোঝা গেল। কয়লা খনির খাদ ধ্বসে যেয়ে বহু শ্রমিক চাপা পড়েছে—তার ভেতর আছে ফুলের মত কিশোর ছেলে, আছে জোয়ান, আছে বৃদ্ধ। থোরেজের মন দেখে শুনে মুষড়ে পড়ল। তিনি বুঝলেন না কেন এই কান্না, কেন এই হাহাকার—। শুধু জানলেন কয়লাখনির মানুষদের ভাগ্যে এই রকমের নিষ্ঠুর আঘাত মাঝে মাঝে আসে। এর কি কোন প্রতিকার নেই? —কিশোর ছেলে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কথাই সেদিন ভাবছিলেন। থোরেজ তখন কত ছোটো। তবু আজও তিনি সে কথা ভুলতে পারেননি।

এর অল্প কিছু দিন পরে দেখা গেল আবার পথে শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। সেদিনের মত ছত্রভঙ্গ বিশৃঙ্খল জনতা নয়। এবারে তালে তালে পা ফেলে পতাকা হাতে নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে, মুখে তাদের এক আওয়াজ। "রুটি চাই, কাজ চাই, মানুষের মত বাঁচতে চাই।" অপূর্ব্ব সেই মিছিল! থোরেজ পথের কিনারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন সেই অজস্র মানুষের জটলা। তারা গরীব, তারা ঘৃণিত, কিন্তু তারা মানুষের মত বাঁচতে চায়। থোরেজের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, ইচ্ছে হ'ল একবার ছুটে গিয়ে ঐ রক্ত পতাকা ছুঁয়ে আসেন। মরিস্ তখন বালক, ছেলে মানুষ। কে বুঝবে তার বুকের আলোড়ন, কে বুঝবে তার এই দুর্ব্বোধ্য আকুলতা। এর আগে তিনি কখনও ধর্মঘট দেখেন নি।

দুমাস ধরে চলেছিল এই ধর্ম্মঘট। থোরেজ জানতেন কয়লার খনিতে শ্রমিকদের জীবনে কি দুঃখ। খনির নীচে কেমন করে মাঝে মাঝে দপকরে আগুন লেগে যায়, কেমন করে কয়লার থাম হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে, কেমন করে কাজ করতে করতে স্ত্রী পুরুষ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে—সে সব গল্প থোরেজ বস্তির বারান্দায় বসে ঠাকুর্দার মুখে মুখে শুনেছেন, নিজের দৈনন্দিন জীবনেও তা প্রত্যক্ষ করেছেন। পাশের বাড়ীর শ্রমিক ছেলে কেমন করে অসুখে বিনা পথ্য বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে তাও তিনি দেখেছেন। তাঁর ছোটকালের ইতিহাস সেত কয়লাখনির ইতিহাস, কয়লাখনির কালো ছায়া চিরদিনের জন্য তাঁর জীবনের উপর ছায়া এঁকে গেছে। তাঁর ঠাকুর্দা ছিলেন এক ট্রেড ইউনিয়নের কর্ম্মী; সারাদিন খাটুনির পর অবসর সময়ে তিনি ইউনিয়নের কাজ করতেন, শ্রমিকদের বোঝাতেন যে একতা গড়ে না তুলতে পারলে এই জীবনমৃত্যুর হাত থেকে নিস্কৃতি নেই। থোরেজ ঠাকুর্দার সব কথা বুঝতেন না, অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবতেন, ইউনিয়নের লড়াইএর গল্প তাঁর কাছে রূপকথার মত অপূর্ব্ব মনে হ'ত।

মরিস থোরেজকে তাঁর বাবা কয়লা খাদের কাছে এক ছোট পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন। স্কুল তাঁর ভালই লাগত। এই সময় সারা ফ্রান্স জুড়ে আকাল দেখা দিয়েছে। দিনের পর দিন হু-হু করে জিনিসের দাম চড়ছে, মানুষের পেটে খাদ্য নেই, পরনে কাপড় নেই। আবার পথে মিছিলের আনাগোনা সুরু হ'ল, চারি দিক থেকে দাবী উঠল "দুধ চাই, মাখন চাই, খাবার চাই।" একদিন এমনি এক শোভাযাত্রা পথে বেরিয়েছে, এমন সময় একদল পুলিশ এল লাঠি চালিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে। সংঘর্ষের ফলে একজন শ্রমিকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হ'ল। প্যারী সহরে ছড়িয়ে পড়ল একটা চাপা উত্তেজনা, শ্রমিকেরা বুঝল জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যাবে না। থোরেজের মনে সেদিনের এই ঘটনা গভীর রেখাপাত করেছিল। মানুষের হাতে মানুষের জীবন নাশ এর আগে তিনি দেখেননি। তাঁর ভয় হল, ভাবলেন এরা কি তবে এমনি করে তাঁকেও একদিন মেরে ফেলতে পারে।

তার পর অভাবের সংসারে কিছু সাহায্য না করলে নয়। অনেক কষ্টে তিনি খনির চার নম্বর খাদে এক কয়লা বাছাইএর কাজ পেয়ে গেলেন। এই বার তেরো বৎসর বয়সেই তাঁকে দৈনিক বার তেরো ঘণ্টা করে খাটতে হত।

তার পর ১৯১৪ সালে, ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। দেশে দেশে পল্টন তৈরী হচ্ছে। ফ্রান্সেও মহড়ার অন্ত নেই। বিপদজনক এলাকা ছেড়ে লোকজন পালাচ্ছে, থোরেজের ঠাকুর্দা পালালেন, চলে যাবার সময় থোরেজকেও সঙ্গে নিলেন। ছবির বইতে তাঁরা যুদ্ধের কত রোমাঞ্চকর ছবিই না দেখেছেন। কিন্তু যুদ্ধের যে-আগুন ফ্রান্সকে পোড়াবার জন্য নেমে এসেছে তাঁরা দেখলেন তাতে রোমাঞ্চ নেই, মহিমা নেই, বাহাদুরী নেই। আছে বীভৎস নর-হত্যার তাণ্ডবলীলা, আছে অসংখ্য মা-বোনের বুকফাটা হাহাকার। পথের দুধার দিয়ে তাঁরা যেতে যেতে দেখলেন গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস স্তূপ হয়ে গেছে। থোরেজের মন ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল, তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন লড়াইয়ের অভিশাপ থেকে পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য আজীবন তিনি লড়াই করবেন, যারা দুনিয়া জোড়া প্রকাণ্ড যুদ্ধের ব্যবসা ফেঁদে বসে আছে, তাদের তিনি নির্ম্মূল করবেন।

একদিন চল্‌তে চল্‌তে তারা পথের ধারে এক বনের ভিতর যেয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মাথার উপর রাত ঘনিয়ে এসেছে। তাঁরা ভেবেছিলেন যুদ্ধকে বুঝি তারা এড়িয়ে চলে এসেছেন। হঠাৎ চার ধার থেকে রাইফেল গর্জে উঠল, রাতের অন্ধকার ভেদ করে গুলি চলতে লাগল, তাঁরা বুঝলেন নিকটেই কোথাও হাতাহাতি যুদ্ধ চল্‌ছে। বুড়ো ঠাকুর্দা তখন গাছের নীচে গুড়িসুড়ি মেরে আছেন, আশে পাশের শুক্‌নো ঝরাপাতা দু'হাত দিয়ে টেনে আপাদমস্তক ঢেকে কেবল নাকের ডগাটুকু বের করে পালাবার বুদ্ধি ঠাওরাচ্ছেন। থোরেজ হামাগুড়ি দিয়ে

দিয়ে নিঃশব্দে ঠাকুর্দার পাশে গেলেন, তার পর কানের কাছে মুখ রেখে চুপি চুপি বললেন, "চল পালাই।" অবশ্য খুব বেশী দূর যেতে হ'ল না। শীঘ্রই তারা পুলিশের খবরদারীতে আটকা পড়লেন। যুদ্ধের মুখোমুখি দাড়ানোর অভিজ্ঞতা থোরেজের জীবনে এক নূতন দৃষ্টি ভঙ্গী এনে দিল।

এই নজর বন্দী অবস্থায় থেকেই থোরেজ এক নতুন স্কুলে ভর্ত্তি হলেন এবং প্রথমবারেই রচনা পরীক্ষায় প্রথম পুরস্কার পেয়ে গেলেন। সেবার রচনার বিষয় ছিল: "যুদ্ধের কোন দিকটা তোমার মনে বিশেষ করে দাগ কেটেছে।" থোরেজকে যুদ্ধের বীভৎসতা বর্ণনা করবার জন্য কোন বইই পড়তে হয়নি। যখন আর সবাই যুদ্ধের শৌর্য্য বীর্য্য সম্বন্ধে গালভরা একরাশ আড়ষ্ট পুঁথি পড়া কথা লিখছিল তখন তিনি কালির আঁচড়ে সেই সব ছবি আঁকছিলেন যা তাঁর চোখের সামনে অসংখ্য মানুষের রক্তের স্বাক্ষরে আঁকা হয়েছে।

থোরেজ শ্রমিকের ছেলে। শ্রমিক ভাই-বোনদের সুখ দুঃখকে নিজের বলে জেনেছিলেন। এবার ঘটনাচক্রে তাকে এমন কাজে বাহাল হ'তে হল যেখানকার অভিজ্ঞতা জীবনে তাঁর এই প্রথম। তিনি এক ধনী কৃষকের অধীনে কাজ নিলেন। কাক-ভোরে উঠে কাস্তে হাতে নিয়ে এক পাল গরু তাড়িয়ে মাঠে যাওয়া, সারাদিন ভুঁই নিড়ানো না হয় গম বার্লির ফসল কাটা, কোন বিশেষ ঋতুতে আবার জমিতে লাঙ্গল দেওয়া বা তার পর মাঠে বীজ ছড়ানো। প্রথম প্রথম এ সব তার বেশ লাগতো। তার পর যতই দিন যেতে লাগলো, যত তিনি কৃষক জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় পেতে লাগলেন, ততই বুঝতে পারলেন যে কৃষক ও শ্রমিক জীবনের মূলে আছে একই অভিশাপ—অমানুষিক দারিদ্র্য। খনির শ্রমিকদের মত ভূমিদাসেরা রোগ ভোগ ঋণ নির্য্যাতন জর্জ্জরিত। আসলে কৃষাণ আর শ্রমিক ভাই ভাই—দুজনে এক গারদের বন্দী, দুজনেরই মুক্তি দুজনের মিলিত লড়াইতে।

এমনিকরে থোরেজের জীবন স্তরে স্তরে গণ-আন্দোলনের জন্য তৈরী হয়ে উঠছিল। কোটি কোটি মানুষের দুঃখ যেমন তার মনকে বিচলিত করেছিলো, তেমনি বিরাট দুঃখের নিরসন কি তাও তিনি ভাবতে সুরু করেছিলেন। এর আগে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিলো না। কেবল মাঝে মাঝে প্যারী সহর থেকে ফিরে আসা রাজমিস্ত্রীদের মুখে সাম্যবাদের আলোচনা শুনেছিলেন। এই সময় সারা ফ্রান্সদেশ জুড়ে এক বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা দেখা দেয়। সহরে, গাঁয়ে, এখানে সেখানে সর্ব্বত্র যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে গুপ্ত সাম্যবাদী দল গড়ে উঠেছিলো। থোরেজের মন সহজেই এই আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেয়। একদিকে রাজনীতির অ, আ, ক, খ শেখা অন্যদিকে ফ্রান্সের সেরা সাহিত্যিক লেখক কবিদের রচনা আয়ত্ত করা দুই কাজই তাঁর একসঙ্গে চলতে লাগল; হিউগো, রলাঁ সবই তিনি নিঃশেষ করে পড়ে ফেললেন।

১৯১৭ সাল। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের পর আর একবার সারা ইয়োরোপে

বিশ্বমানবের মুক্তির আশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল। 'প্যারী কম্যুনে'র বীর বিপ্লবীরা—যে স্বপ্নকে রূপ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন, রুশদেশের শ্রমিক কৃষক মিলে জার তন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সেই স্বপ্নকেই সার্থক করে তুলেছেন এজন্য প্রত্যেক সংগ্রামী কিশোরই উল্লাসী। সমাজের নিচেতলার মানুষেরা তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে একথা পাছে সারা দুনিয়ায় রাষ্ট্র হয়ে যায়, পাছে দেশে দেশে জনসাধারণ এগিয়ে এসে বিপ্লব ঘটায় এইভয়ে সর্ব্বত্র শাসক ও শোষক শ্রেণী একযোগে মিথ্যা ছড়িয়ে, কুৎসা রটিয়ে সোভিয়েট বিদ্বেষ প্রচার করতে লেগে গেল। কিন্তু "দুনিয়ার শ্রমিক এক হও" মার্কস্, লেনিনের এই ডাক প্রত্যেক বিপ্লবী তরুণের মনে তীরের মত বিঁধে গিয়েছিল। মিথ্যায় তারা ভোলেনি, বিপদকে তারা বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে, অত্যাচারকে তারা নির্ভয়ে অগ্রাহ্য করেছে। মরিস্ থোরেজ মাস ছয়েকের জন্য একটা রুটির দোকানে কাজ নিয়েছিলেন। সেখানে রুটি সেকতেন, ময়দা মাখতেন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাম্যবাদী সাহিত্য পড়তেন, আর ছুটি পেলেই যেতেন বস্তীতে, যেতেন কুঁড়ে ঘরে। আগামীদিনের শেষ সংগ্রামের জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতেন।

ততদিনে যুদ্ধে থেমে গেছে। লড়াইএর দুঃস্বপ্নের পর নেমে এসেছে দেশজোড়া ক্লান্তি, দুর্ভিক্ষের দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যাচ্ছে, আকাশ চিরে উঠেছে একটা হাহাকার কেন এই যুদ্ধ? কিসের জন্য? নিচেতলার লোকেরা তাদের আগুনের ফুল্‌কির মত ছেলেমেয়েদের কেন এই নরমেধ যজ্ঞের বলি করে পাঠিয়েছিল? কেউ তা জানে না, কেউ তা বোলতে পারে নি। থোরেজ এই সময় রেলকুলীদের মধ্যে একটা কাজ পেয়ে ছেড়ে দিলেন রুটির দোকানের চাকুরী। রেলের শ্রমিকেরা থোরেজকে সহজেই নেতা বলে মেনে নিল। এর অল্প কিছুদিন পরেই তিনি ফিরে ছিলেন তার সেই ছেলেবেলাকার কয়লার খনিতে, বৃদ্ধ খনিশ্রমিকদের চোখে জল এল! বৃদ্ধারা বলাবলি করতে লাগল—"ওই আমাদের কয়লা খনির ছেলে, আমাদের প্রিয় থোরেজ!" মাত্র বিশ বৎসর বয়সে মরিস্ থোরেজ ফ্রান্সের জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা হয়ে উঠলেন।

তারপর থোরেজের জীবনের উপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেছে, কত দুঃখ নির্য্যাতন তাকে পোহাতে হয়েছে; কতবার তিনি জেলে গিয়েছেন, কতবার তভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছেন। কিন্তু সাম্যবাদের আদর্শকে কখনও এতটুকু ম্লান হতে দেন নি। আজ তিনি ফ্রান্সের গণ-আন্দোলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা, ফরাসী দেশের অন্যতম ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু আজও তিনি 'কয়লা খনির ছেলে' বলেই পরিচয় দেন, আজও থোরেজের বক্তৃতা শুনতে শুনতে আনন্দে শ্রমিক মোড়লদের চোখে জল ভরে উঠে, তারা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে "ঐ আমাদের থোরেজ, আমাদের কয়লাখনির ছেলে।"

জগন্নাথ চক্রবর্তী

વિ[illegible]ડા



ঘুঘু কাহিনী

লণ্ডন্ নগরে ডাগর ডোগর্
তিনটে ঘুঘু থাকে।
হঠাৎ চম্‌কে পেরিয়ে সাগর
তেপান্তরের ফাঁকে,
পাড়্‌তে এলো সোনার ডিম্
দিল্লীর্ এক্ বাগানে!
রূপোর্ ডালে মুক্তোর হিম্
মাণিক পাতা আনে।
তাই আনিয়ে বাসা বাঁধে
ঘুর্ ঘুর্ ঘোরে ডালে।
উড়ে মালীর বউটি তখন
অন্ন ঢালে থালে।
অন্ন হ'ল এমন তেমন
থালা হল মাটি।
চিক্‌ড়ে মিক্‌ড়ে মালী হাঁকে—
কে এল মোর ঘাঁটি।

তিনটে ঘুঘু পাখ্‌না মেলে
কাছে এসে বলে,
তোমার ভিটায় আমরা চরি—
ঠোক্কর মারি ফলে।
রাগ কোরো না, ঘুঘ্‌নি দেবো
আমসত্তে বেঁটে,
রূপোর বাটা কিনে দেবো
চাঁদের হাটে হেঁটে।
শুনে মালী ভির্‌মী খেয়ে
ছুঁড়তে গেল ঢল্।
হাত চলে না, পা চলে না
পেটে লাগে খিল্।
তাই না দেখে তিনটে ঘুঘু
পাড়তে গেল ডিম্।
কিসের ডিম্ রামশন্না জানে
আমরা ত হিম্ সিম্॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

মাঠের রূপকথা

গরমকালে এই মাঠে কেউ
হাঁটতে পারে না,
সারা তুপুর এর শরীরের
তাপ যে ছাড়ে না।
ঘাস জ্বলে যায় তপ্ত হাওয়ায়,
রুক্ষ শরীরে,—
আঁকড়ে থাকে কয়টি তৃণ
আবেগ ভরি' রে।
উলুখড়ের কঠোর জীবন
মাঠের বুকেতে,
আগুন-দহন সহ্য করে
কোন্ সে সুখেতে?
তারপরে যেই বর্ষা নামে
কালচে আকাশে,—
মাঠটি যেন প্রাণ ফিরে পায়
বাদল বাতাসে।

ঘোলা জলের স্রোত বয়ে যায়
মাঠের ভিতরে,
জীবন্মৃত উলুখড়ের
অঙ্গ শিহরে।
মাঠ ডুবে যায় ধারা জলের
প্রবল প্রপাতে,
গানের আসর যায় জমে যায়
ভেকের সভাতে
শরৎ আসে বাদল শেষে,
মাঠের মাঝারে
কাশের দলে চামর যেন
ঢুলায় হাজারে।

নবীন তৃণে রঙীন ফুলে
মাঠটি হাসে যে,
রং-বাহারী প্রজাপতির
দলটি আসে যে।
হেমন্তেরই প্রভাত বেলায়
হঠাৎ দেখি রে,
মাঠখানা যে উধাও হোলো,
কোথায় একি রে,
ঘন-নিবিড় হিম্-কুয়াসার
ওড়্না পরিয়া,
মোদের চেনা মাঠটি যে যায়
কোথায় সরিয়া।
গহন শীতে মাঠের বুকে
শীতল বাতাসে—
শিরশিরিয়ে যায় যে বহে'
ঝরায় পাতা সে।

ঘাসের বুকে, কোমল তৃণে
শিশির ঝরাণো,
সারা মাঠের বুকেই যেন
মুক্তা ছড়ানো।
হঠাৎ শুনি শীতের শেষে
গীতের লহরী,—
মাঠের বুকে দেখি তাজা
ফুলের বহরই।
বুকটি ঢাকা মুঠো মুঠো
রঙের কুচিতে
ফুলের ফাগুণ আস্‌লো মাঠে
পারছি বুঝিতে।
দৃশ্য কত আস্‌ছে সারা
বছর ঘুরিয়া,
ছয়টি ঋতুর চলছে খেলা
মাঠটি জুড়িয়া।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু



রাজপথ। ঢাকা কালো পিচে।
পূর্ণিমার আলো-ধোয়া আকাশের নিচে
পথ যেন অতিকায় অজগর প্রাণী।
দেয় হাতছানি ঃ
ছেড়ে এসো আজ রাতে কুসুম-শয়ন ;
ঘুমে বোজা নিমীল নয়ন
খোলো আজ। চাও স্পষ্ট চোখে।
দেখো ওই দূর ধ্রুবলোকে
কার চোখে শাণিত বিদ্রূপ ?
ধ্রুবলোক আলো করে কার দীপ্ত রূপ
কার চোখে শাণিত জিজ্ঞাসা ?
কার চোখে ভারতের অন্তরের ভাষা ?

রামেশ্বর, দেবব্রত, কিশোর মোহিত—
তুলনা রহিত—
আধুনিক ধ্রুবলোকে ওরাই তো ধ্রুব নবতর।
নমস্কার করো।
বিদেশীর শাসকের পুলিশের গুলি
ওদের কপালে হ'লো গৌরবের চন্দনের তুলি।
জাতির জীবন-তরী সময়-সাগরে
নির্ভয়ে এগিয়ে যাবে ওদেরি দেখানো পথ ধরে।
তারায় তারায় তাই ওদের আহ্বান।
সাড়া দাও হে নির্ভিক, বীর প্রাসবান।

আজ রাতে ঘুম নয়,
তন্দ্রা নয় নয়। নাই ভয়।
কিশোর শহীদ ডাকে ধ্রুবলোক হ'তে।
এসো রাজপথে।

রাজপথে জাগলো জোয়ার।
পায়ে পায়ে সাড়া তোলে কিশোর সার।
বারো ষোলো আঠারোর প্রদীপ্ত পরাণ
দলে দলে চলে পথ। কণ্ঠে বাজে স্বাধীনতা-গান

অগ্রসর ঃ দৃপ্তবেগ ঃ পদধ্বনি উত্তাল উদ্দাম।...

সহসা জলদ কণ্ঠে উচ্চারিত তোমাদের নাম।
রাজপথ কথা কয়। ঢাকা কালো পিচে।
পূর্ণিমার আলো-ধোয়া আকাশের নিচে।
রাজপথ কথা কয়।
সীমাহীন বিরাট বিস্ময়।
কথা কয় ঃ শোভাযাত্রা স্তব্ধ করো ক্ষণেকের মতো
শির করো নত।
বারেক স্মরণ করো আমাদের আত্মদান কথা।
এই খানে লেখা হোক আমাদের চির অমরতা।

কার স্বর? কার কণ্ঠধ্বনি?
সহসা নিস্তব্ধ হলো এক সাথে শত পদধ্বনি।
পিচঢালা রাজপথে অগণিত রক্তের স্বাক্ষর ঃ
কালো পিচ কথা কয় খুলে তার রক্তিম অধর।
অগ্নিমুখ অস্ত্রাঘাতে ঝরেছিল যতো রক্তধারা,
এক কণ্ঠে কথা কয় আজ রাতে সকলে তাহারা।

* * *

ধ্রুবলোক—শোভাযাত্রা ঃ সব যদি নিছক কল্পনা।
পূর্ণিমা আকাশতলে কল্পনায় কাব্যজাল বোনা।
তবু জানি মিথ্যা নয় রাজপথে রক্তের স্বাক্ষর।
ফোটা ফোটা তাজা রক্তে লাল হলো পথ পথান্তর

সে-পথের কোথায় বা শেষ?
এ-জিজ্ঞাসা ভেঙে দিক সুখ শয্যা—তন্দ্রার আবেশ।

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত



হাঁসুমিঞা সোনার টিয়া চাঁদ হাসিয়া মুখটি দিয়া,
গড় গড়িয়া যায় ছড়িয়া যায় ভরিয়া সবার হিয়া।
ছোট্ট তুমি এত্তটুকুন, প্রজাপতির পাখার পরে,
শোয়ার হ'য়ে চ'লতে পার ফুলটি হ'তে ফুলের থরে।
দূর্ব্বাফুলের নৌকা গ'ড়ে ভাসাতে পার শিশির ফোটায়,
ভোমর পাখায় ঘুমিয়ে শোন ফুল কলিরা নিশাস ফেলায়

তোমার কাছে লিখছি চিঠি, লিখছি যে টুন-টুনির পাখে
উড়ে যাবে রঙিন চিঠি রামধনুকের রঙিন ডাকে।
চিঠির গায়ে আঁকছি রেখা চাঁদের বুড়ির সুতা দিয়ে
রঙ করেছি শরষে ফুলের মটর ফুলের পাপড়ি নিয়ে।

যখন তুমি ঘুমিয়ে যাবে তোমার মায়ের আঁচলটিতে
চাঁদ আসবে জানলা দিয়ে চাঁদ মুখে চাঁদ মাখিয়ে দিতে
তখন তোমার ঘুমলি চোখে, যেন আমার পত্রখানি—
আরো উজল হ'য়ে ওঠে রাঙা রাঙা স্বপন আনি।

জসীমউদ্দীন



ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা সমৃদ্ধ প্রদেশ
তুলাদণ্ড হাতে করে বণিক প্রবেশ।
আলাদিন যুগ কিবা আসিল রে ফিরে?
মানদণ্ড তুলাদণ্ড কোথা গেল দূরে?
এযে দেখি রাজদণ্ড, তূণভরা তীর।
স্বর্ণপুরী মায়াপুরী, নিদ্রামগ্ন বীর॥
রাত্রি শেষে উঠে জেগে, স্বপ্ন মাঝে ঘোর।
একখানা ভেঙ্গে করে তিনখানা চোর॥
এযে শুনি দুর্ব্বলের আকুল ক্রন্দন।
বণিকের অট্টহাস, কভু বা গর্জ্জন॥

কালিপদ রায়



শোনো একটা গোপন খবর দিচ্ছি আমি তোমায়,
ক'লকাতাটা যখন খাবি খাচ্ছিলো রোজ বোমায়
সেই সময়ে একটা বোমা গড়ের মাঠের ধারে,
মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গিয়ে ছিলো এক্কেবারে,
অনেক দিনের ঘটনা তাই ভুলে গেছ্‌লো লোকে,
মাটির ভেতর ছিলো তাইতো দেখেনি কেউ চোখে,
অনেক বর্ষা কেটে গেলো, গেলো অনেক মাস,
যুদ্ধ থামায় ফেললো লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস।
হঠাৎ সেদিন একলা রাতে গড়ের মাঠের ধারে
বেড়িয়ে ফেরার সময় হঠাৎ চমকে উঠি ঃ আরে !
বৃষ্টি পেয়ে জন্মেছে এক লম্বা বোমার গাছ
তারই মাথায় দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোর নাচ,
গাছের ডালে ঝুলছে কেবল বোমা-ই সারি সারি,
তাই না দেখে ভ'ড়কে গিয়ে ফিরে এলাম বাড়ি।
পরের দিনই সকাল বেলা গেলাম সে ময়দানে,
হায়রে ! গাছটা চুরি গেছে কোথায় কে তা জানে !
গাছটা ছিলো। গড়ের মাঠে খুঁজতে আজো ঘুরি—
প্রমাণ আছে অনেক, কেবল গাছটা গেছে চুরি ॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য



খোকা ঘুমোয়

সেই সেবার কাঞ্চী আর কোশলে
মায়ের খোকা ঘুমুলে পাড়া জুড়োলে
বর্গী এলো বুলবুলির পিছনে ;
গা-ছম্‌ছম্‌ আলো-আঁধারি বিজনে
মাঠের ধান উধাও, তারা লুকোলে।
মা বললেন হাজার হাজার চুমোয়—
ওঠ্‌রে, খোকা ওঠ্‌রে।—খোকা ঘুমোয়

কখন আবার বৃষ্টি দিলো দেবতা,
ফললো ধান—ঘরেই মেপে নেবো তা
ঠিক্‌ঠাক্‌ এই ; বুলবুলির পিছনে
হঠাৎ আবার বর্গী এলো এ-দিনে।
এবার আমরা কী করলুম জানো তা ?
মা বলেছেন—খোকা আমার ঘুমোয় !
আমরা তবু ভুলিনি তাঁর চুমোয়।

বসাই আজ কলকাতায় পাহারা—
চোরাগলিতে চড়াও, আর তা ছাড়া
বর্গী, চোর বুলবুলির পিছনে
আমরা এই রাম-রহিম দু'জনে
তাড়িয়ে যাই। ক্ষেতখামারেও পাহারা।
বাড়ি ফিরলে হাজার হাজার চুমোয়
মা বলবেন—ঘুমোও।—খোকা ঘুমোয়

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়



বন্ধ খাঁচার কপাটে খুঁজেছে খিল
হেনেছে আঘাত, চেয়েছে দীপ্ত নভে
অবগাহনের আনন্দ অনাবিল
বিহঙ্গ সেই মুক্তির কলরবে
বারে বারে তুমি খুলেছ কয়েদ খানা,
পরুষ গরবে অন্ধ অর্বাচীন
কেটে দিয়ে গেছে শত জটায়ুর ডানা,
আজ ফিরে আসে পালাবদলের দিন।

তুমি তো জানো না দ্বীপান্তরের রাজা!
রক্তের ফোঁটা কিছুই যাবে না বৃথা।
মাটির জঠরে সমাহিত যত প্রাণ
সেতুবন্ধের পারে খুঁজে নেবে সীতা।
বন্দী নেতার মুক্তির জয় গান
রৌদ্র আকাশে ভেঙে দিয়ে যাবে খাঁচা॥

মণীন্দ্র রায়

মায়ের ব্যথা

কেনরে তোরা মরতে এলি দুঃখী মায়ের বাপের ঘরে ?
অন্নহারা বস্ত্রহারা ভুগ্‌তে সারা জন্ম ধরে ?
নেইকো তোদের মুক্ত বাতাস, নেইকো তোদের মুক্ত আলো,
নেইকো তোদের বন্ধুরে কেউ আদর কোরে বাসবে ভালো।
এইতো তোদের একটা ম'ল গাড়ীর তলায় পাঁজরা ভেঙে
কা'র কি হ'ল ? রক্তে কেবল পথের ধূলো উঠ্‌লো রেঙে !
তা'ও সে কেবল ঘণ্টা খানেক, মেথর এসে ফেললো ধুয়ে
সব কথা তা'র ফুরিয়ে গেল, কাঠের বুকে চিতায় শুয়ে।

এর পরেও বলছে ওরা, নিত্য যা'রা চালায় গাড়ী
জনমজুরের রক্ত চুষে নিত্য যারা গাঁথছে বাড়ী,
বল্‌ছে কি তা' জানিস তোরা ? বলছে যে যা'র কর্ম্মফলে
ভিখ্‌ মেগে দিন কাটছে কারো, কেউবা ছাতি ফুলিয়ে চলে !
কেউ বরাতে চালায় গাড়ী, কেউবা গাড়ী পড়ছে চাপা
টাকার তবিল ভরাট কা'রো, বরাত কারো নিত্য ফাঁপা !
এসব কথা শুনলে পরে, দুঃখেতেও পাচ্ছে হাসি,
ভাবছি মনে আর কতকাল চলবে এমন মিথ্যারাশি !

আর কতকাল সর্ব্বহারার চলবে শোষণ ধরার বুকে
জন কয়েকে লুটবে মজা, বাদ্ বাকী সব মরবে ধুঁকে !
এই পৃথিবীর আদিম কালে মানুষ ছিল জংলী যখন
বন্য পশুর আক্রমণে দল বেঁধে সব লড়তো তখন,
জমির মালিক কেউ ছিলনা আদিম কালের সাম্য যুগে
অন্নাভাবে মরতোনা কেউ ক্ষিধের জ্বালায় নিত্য ভুগে।
এমনি কোরে মানুষ জাতের বংশ যতই উঠলো বেড়ে,
গ্রামের পরে গ্রাম গজালো প্রাণ-বাঁচানোর সাম্য ছেড়ে।
তখন হ'ল গায়ের জোরে যে যার বরাত তৈরী করা
গায়ের জোরেই গড়তো সমাজ এই ধরাকে ভাবতো সরা।
তাদের ঘরে জন্ম যাদের তারাই ধীরে বণিক হ'ল
বণিকরাজের রথের চাকায় হাজার হাজার দুঃখী ম'ল।
দীন দুখীদের পাঁজরা দিয়ে দুর্গ প্রাসাদ গড়লো তারা
লিখলো নানান্ শাস্ত্র আইন নিরন্নদের লৌহকারা।
লিখলো কি তা' জানিস তোরা ?   যে যার আপন কর্ম্মফলে
ভিখ্ মেগে দিন কাটছে কারো, কেউ বা ছাতি ফুলিয়ে চলে

ব্যাঙ্কে যাদের জমছে টাকা, লক্ষ্মীদেবীর পুত্র তারা,
যে যার আপন কর্ম্মফলে দীন ভিখারী লক্ষীছাড়া !
তাই বলি বাপ্, যেদিন তোদের সর্ব্বহারার ঐক্য হ'বে,
তোরাও আবার জগত-সভায় বসবি সবাই সগৌরবে।
বরাত বলে নেইকো কিছু, বণিক জাতের ধাপ্পা সবি,
দল বেঁধে সব গায়ের জোরে তোরাও আবার সভ্য হ'বি।

বিমলচন্দ্র ঘোষ



গল্প



বেগুনি সম্রাট

গোপালদা বেরিয়েছেন তাঁর বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি থেকে একটি বিশেষ জিনিসের সন্ধানে। তাঁর দৈনন্দিন গবেষণার বিষয় হচ্ছে কীট পতঙ্গের চরিত্র, তাদের জন্ম বৃত্তান্ত, তাদের আচার ব্যবহার। কীট পতঙ্গ নিয়ে যে সব বিজ্ঞানের ছাত্র পড়া শোনা করে, তারা জাল নিয়ে মাঠে বা জঙ্গলে নানা রকম কীট পতঙ্গ ধরে বেড়ায়। গোপালদাও এক কালে এই সব করেছেন, আমাদের পরিচিত অপরিচিত কীট পতঙ্গ তিনি সবই এক কালে ধরেছেন। মৌমাছি প্রজাপতি থেকে শুরু করে আরশোলা মাকড়শা পিপ্‌ড়ে সবারই হাঁড়ির খবর তিনি রাখেন। কিন্তু আজ তিনি বেরিয়েছেন একটি নতুন জিনিসের সন্ধানে। সেই নতুন জিনিসটি হচ্ছে ব্যাঙের ছাতা। ব্যাঙের ছাতা আমাদের দেশে কত রকম হয়, আর তার মধ্যে কোন্ কোনটি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় এই নিয়েই এখন তিনি অনুসন্ধান চালাবেন কিছুদিন। দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেছে, খাবার মত যে-কোন জিনিস এখন খেতে হবে এই তাঁর মত।

শহরের বাইরে পল্লীগ্রামের এক পথের ধারে ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে কত রকম ফুল— ছোট ছোট রঙীন তারার মতো গাছে গাছে ঘাসে ঘাসে ফুটে আছে।

সেই খানে একটা মোটা গাছের গোড়ায় ব্যাঙের ছাতার মতো কি সব গজিয়েছে দেখতে পেয়ে গোপালদা উৎসাহিত হ'য়ে ধীরে ধীরে জঙ্গল ঠেলে এগিয়ে চলেছেন। এমন সময় একটি বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি তাঁর কানের পাশ দিয়ে উড়ে এসে একটা ফুলের উপর গিয়ে বসল। ফুলটি ভারী সুন্দর দেখতে, কিন্তু কি নাম তার কেউ জানে না।

প্রজাপতি দেখে গোপালদার আগের দিনের কথা সব মনে পড়ে গেল। একটি প্রজাপতি ধরতে কি পরিশ্রমই না করতে হয়েছে এক এক দিন। সে একটা নেশার মতো। নাওয়া খাওয়া ভুলে কখনো প্রজাপতি, কখনো ফড়িং, কখনো বা একটি বোলতার পিছনে এক একটা বেলা কাটিয়েছেন। আজও তাই প্রজাপতি দেখলে মাঝে মাঝে বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, বিনা কারণেই ধরতে ইচ্ছে করে। বিশেষ ক'রে যে প্রজাপতিটি এখন তাঁর সম্মুখে এসে বসল তার চেহারা অপূর্ব্ব সুন্দর। রঙের বৈচিত্র্য খুব বেশি নেই, পাখাগুলোর সব খানিই প্রায় হাল্কা বেগুনি রং, মাঝখানে অনেকগুলো শাদা শাদা চিহ্ন উপর থেকে নিচে নেমে এসে দুদিক থেকে লেজের কাছে প্রায় একটি কোণ সৃষ্টি করেছে। গায়ের রং ও বেগুনি। পাখার উপরের দিকে দুধারে আরও তিন চারটি ক'রে শাদা বিন্দু লাইন ক'রে উপর থেকে নিচের দিকে নেমে এসেছে। গা থেকে দুদিকে পাখার প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত লম্বা লম্বা শিরা কালো রেখার মতো আঁকা। সেইখানে দুদিকে শাড়ীর পাড়ের মতো ব্রাউন রঙের চওড়া পাড়, আর একটা ক'রে শাদা ফিতে যেন সেই পাড়ের উপর এক এক ঘর বাদ দিয়ে কে শেলাই ক'রে দিয়েছে। গোপালদা তাকে দেখেই বুঝলেন এর ইংরেজী নাম Purple Emperor, বা বেগুনি সম্রাট।

ব্যাঙের ছাতার কথা তাঁর মুহূর্ত্তে ভুল হয়ে গেল। তিনি কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। এমন সময় এক মজার কাণ্ড ঘটল।

প্রজাপতিটি ফুলের উপর বসেছিল, কিন্তু বসেই নাক সেটকাতে লাগল। তাকে দেখেই বোঝা গেল একটা অস্বস্তিকর গন্ধ তার নাকে আসছে। কিসের গন্ধ অনুসন্ধান করতে বেগুনি সম্রাট ফুলের বোঁটার দিকে একটু একটু ক'রে এগিয়ে যেতেই এক অদ্ভুত জীব দেখে থেমে ভীষণ বিরক্তির সঙ্গে ঘাড় নাড়তে লাগল। সে দেখল চীনে বাদামের মতো একটি জীব রেশমের সূতোয় দেহটাকে এক পাক জড়িয়ে সরু একটা ডালের সঙ্গে নিজেকে বেশ ক'রে বেঁধে রেখেছে। বেগুনি সম্রাটের ইচ্ছে হ'ল শুঁড়ের এক ধাক্কায় তাকে ওখান থেকে ফেলে দেয়, কিন্তু একটা অজানা অস্পৃশ্য জীবকে ছুঁয়ে সে নিজের পদমর্যাদা খাটো করতে রাজি নয়। সে কিছুক্ষণ ভাবল কি করা উচিত, তারপর ওকে সম্বোধন ক'রে কর্কশ কণ্ঠে বলল, "তুই কে জানি না, কিন্তু তোর গায়ের গন্ধে আমি ফুলের উপর বসতে পারছি না।— সরে যা এখান থেকে তুই, জানিস আমি কে? আমার নাম বেগুনি সম্রাট।"

সেই চীনেবাদামের মতো জীবটি কোনো কথাই বলল না। প্রজাপতি তাতে আরও চটে গেল। সে তখন বাধ্য হয়েই তার একটা শুঁড় দিয়ে তাকে এক ধাক্কা দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু রেশমের সূতোয় যত্ন ক'রে বাঁধা জীবটিকে সে সরাতে পারল না। শুধু শুঁড়ের স্পর্শে তার দেহের ভিতরটা নড়ে উঠল। তা দেখে ঘৃণায় সে শুঁড় সরিয়ে নিয়ে বলতে

লাগল, "ছোটলোকটির সখ হয়েছে ফুলের কাছে থাকা। আমি প্রজাপতি যেখানে এসে বসব তার চতুঃসীমানায় কোনো ছোটলোকের থাকা চলবে না—তুই সরে যা বলছি।"

চীনেবাদামের মতো খোলসের ভিতর থেকে খুব ক্ষীণ সুরে ঐ অদ্ভুত জীবটি বলল, "তুমি কে বিরক্ত করছ আমাকে? এখান থেকে সরে যাও, আমি অনেক দিন এখানে আছি, আমি সরব না।"

"তুই কে বল না?"

"আমি জানিনা আমি কে, আমি আছি এইটুকু শুধু বুঝতে পারি। আমার চোখে আলো নেই, আমার হাতে পায়ে শক্তি নেই, চোখ আমার ঘুমে আচ্ছন্ন—এর বেশী আর আর কিছু আমি জানি না।"

"ছোট জাত কি না তাই বংশ পরিচয় দিতে লজ্জা করে।"—প্রজাপতি এই কথা বলে ওর কাছ থেকে দু একপা দূরে স'রে বসল। এমন সময় পিছন দিকে কার এগিয়ে আসার শব্দ শুনে চমকে উঠে চেয়ে দেখে এক শুঁয়া পোকা—একটু একটু ক'রে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কি বিশ্রী তার চেহারা, সমস্ত গায়ে কাঁটা, বীভৎস তার চলার ভঙ্গী—দেখলে সমস্ত গা শির শির করে।

বেগুনি সম্রাট বুঝতে পারল সে ইতরদের পাড়ায় এসে পড়েছে, অথচ ফুলটি এমন সুন্দর যে তাকেও ছেড়ে যাওয়া যায় না। তা হ'লে কি করা যায়? ঐ শুঁয়া পোকা যদি ফুলটির কাছে আসে তা হ'লে ওর বিষাক্ত ছোঁয়া লেগে তার সকল বর্ণ গন্ধ ম্লান হয়ে যাবে। কিন্তু ও যে ফুলের দিকেই আসছে! প্রজাপতি সভয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। শুঁয়া পোকা চেঁচিয়ে বলল, "হট্ যাও—সামনে ওয়ালা হট্ যাও।"

ঐ কুৎসিত ইতর জীবটির মুখে এই স্পর্ধার কথা শুনে প্রজাপতি অপমানিত হ'ল। সেও ওর উপযুক্ত জবাব খুঁজতে লাগল। কিন্তু ও যদি তাকে আক্রমণ করে? যদি তার গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়? কিন্তু তাই ব'লে ওর কথায় উঠেও তো যাওয়া যায় না। উঠে গেলে যে আরও অপমান। তাই সে ফুলের উপর আরও শক্ত হয়ে ব'সে বলল, "খবরদার এ আমার সীমানা, এখানে এলে আমি তা কিছুতে সহ্য করব না।"

শুঁয়া পোকা সে কথা গ্রাহ্য করল না, উপরন্তু বিদ্রূপের সুরে বলল, "গায়ে একটু রং আছে ব'লে বুঝি কুলীন হয়েছ? কেন, তোমার তো দিব্যি পাখা আছে, সহজেই উড়ে উড়ে বেড়াতে পার, চলে যাওনা এখান থেকে? এ গাছ আমার। একটি বেলা পরিশ্রম ক'রে তবে আমি এক ডাল থেকে আর এক ডালে আসতে পেরেছি। এ গাছের সমস্ত পাতা, সমস্ত ফুল আমরা খাব। চেয়ে দেখ আমি একা নই, আমরা একদল আছি

এখানে। তা ছাড়া ঐ যে সব গুটী দেখছ ডালে ডালে, ওরাও আমাদেরই দিকে। ওরা বড় চতুর, ওদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলে, জানি না। ওদের দেখে আমরাও অনেক সময় ভয় পাই! ওরা খোলসের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। যদি তোমার সঙ্গে লড়াই বাধে তা হ'লে ওরাও নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে তোমাকে মারতে।"

প্রজাপতি এ সব শুনে ভয় পেয়ে গেল খুবই, কিন্তু কিছুতে সে হার মানবে না, এই তার প্রতিজ্ঞা। সে নিজেকে সত্যই কুলীন ব'লে জানে, তাই ছোট জাতের হাতে সে মরবে তবু তাকে বন্ধু ব'লে ডেকে তার সঙ্গে আপোষ করবে না।

গোপালদা চুপ ক'রে এতক্ষণ মজা দেখেছিলেন, কিন্তু আর বেশি ক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। কারণ ওরা পরস্পর ঝগড়া করতে করতে এমন অবস্থায় এসেছে যে এখন যুদ্ধ অনিবার্য্য। শুঁয়া পোকা আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, চীনেবাদামের মতো প্রাণীগুলোও থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে—এমনি অবস্থায় গোপালদা হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "থাম।"

শুঁয়া পোকা চমকে উঠে দেখে এক মানুষ তাকে থামতে বলছে।

সে প্রশ্ন করল, "কেন থামব?"

"কেন থামবে বলছি। একটু ধৈর্য্য ধ'রে তোমরা সবাই আমার কথা শোন। তুমি যে প্রজাপতিকে আক্রমণ করতে যাচ্ছ, সে প্রজাপতি তোমারই জ্ঞাতি ভাই—তোমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।"

শুঁয়াপোকা সে কথার উত্তর দেবার আগেই প্রজাপতি ভীষণ জোরে চীৎকার ক'রে বলল, "অসম্ভব কথা, মিথ্যা কথা,—কেন তুমি অকারণ আমাকে অপমান করতে এসেছ? কি তোমার উদ্দেশ্য? এমন জঘন্য কথা তুমি উচ্চারণ করলে কি ক'রে?"

গোপালদা বললেন "সত্যি কথাই বলেছি, ঐ শুঁয়াপোকার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তোমার জন্ম ইতিহাস। ওরি ওপরের ঐ কুৎসিত খোলস চিরে তোমার জন্ম হয়েছে।"

প্রজাপতি ক্ষোভে রোষে আর কথা বলতে পারল না, এই অপ্রত্যাশিত অপমানে সে অসহায়ের মতো মাথা নীচু করে রইল।

গোপালদা বলতে লাগলেন, "আগে সব শোন, তা হ'লেই কথাটা বিশ্বাস হবে। তুমি প্রথম ছিলে ছোট্ট একটি ডিম। সেই ডিম চিরে বেরিয়ে এসেছে শুঁয়াপোকা। এই হচ্ছে তোমার দ্বিতীয় চেহারা। তারপর মাসখানেক পরে তুমিই ঐ চীনেবাদামের মতো আবরণে নিজেকে ঢেকেছ, রেশমের সূতো দিয়ে নিজেকে বেঁধেছ। তার আগে তোমার ঐ কাঁটাওয়ালা খোলস তোমার গা থেকে খুলে পড়েছে। তারপর দিন পনেরো চীনেবাদামের চেহারায় থেকে ওর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে সুন্দর প্রজাপতির চেহারা নিয়ে।

বলতে বলতে দেখা গেল সত্যিই ঐ চীনেবাদামের মতো খোলস ভেদ ক'রে একটি কচি প্রজাপতি বেরিয়ে এল। গোপালদা বেগুনি সম্রাটকে সে দৃশ্য দেখালেন। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল তার জন্মের পরিচয় পেয়ে। কিন্তু তখনও তার মন থেকে সন্দেহ সম্পূর্ণ যায় নি। সে বলল, "কিন্তু ঐ কুৎসিত শুঁয়াপোকা থেকেই যে ঐ চীনেবাদামের মতো খোলস জন্মেছে তার প্রমাণ কি?"

গোপালদা বললেন, "সে দৃশ্যও এ গাছ খুঁজলে মিলতে পারে। কিন্তু তুমি যেটাকে কুৎসিত বলে ঘৃণা করছ সেটা আসলে তত ঘৃণ্য নয়—কারণ তোমার দ্বিতীয় জীবনের ওটাই হচ্ছে রক্ষা কবচ। অতগুলো কাঁটা আছে বলে শুঁয়া পোকাকে কেউ আক্রমণ করতে পারে না।"

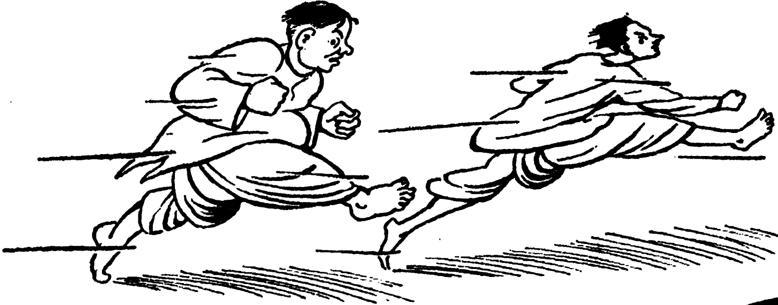
শুঁয়া পোকা তো এ সব শুনে মহা খুশি! সে প্রজাপতির পায়ে এক খোঁচা মেরে বলল, "বাছাধন, তোমার কৌলিন্য যে খসে পড়ল! আমারই দেহ থেকে জন্মে আমাকেই অস্বীকার?"

প্রজাপতি এর উত্তরে আর কি বলবে?

গোপালদা বললেন, "তোমরা পরস্পর দেখা হতেই যদি লড়াই না ক'রে পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করতে, জানতে চেষ্টা করতে, তাহ'লে তোমাদের সবারই জীবন হ'ত সুখের। এইবার থেকে চেষ্টা কর—বুঝলে?"

গোপালদা ওদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে চলে গেলেন, সেদিন আর ব্যাঙের ছাতা সন্ধান করা হ'ল না।

শ্রীপরিমল গোস্বামী



ছেলেধরা

পাঁচকড়ি আর ভুতো। এক জন রোগা আর লম্বা, ঠিক যেন তালগাছ। অন্য জন মোটা আর বেঁটে, ঠিক যেন কোলা ব্যাঙ। পাঁচকড়ি আর ভুতো। চেহারায় তাদের মিল নেই, কিন্তু মনের দিক থেকে আশ্চর্য মিল। ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে তারা বড় হয়েছে। বড় হয়েছে বটে, তবে মানুষ হয়েছে কিনা—সে-কথা যাক। তবে জীবনে উন্নতি তারা করবেই, যেমন করেই হোক করবে এবং করবে একসঙ্গে।

ছেলেবেলা থেকেই তারা একসঙ্গে মানুষ। পড়েছে একই ইস্কুলে। একই মাস্টারের কাছে খেয়েছে বকুনি, দাঁড়াতে হলে এক সঙ্গেই দাঁড়িয়েছে বেঞ্চির উপর। একজন রোগা আর লম্বা। আর একজন মোটা আর বেঁটে। একই সঙ্গে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা দেবার সময় পাশাপাশি বসেছে। একই পরীক্ষায় একই সঙ্গে দু'জনে ফেল করেছে। কারণ দু'জনে তারা দু'জনের খাতা থেকে টুকেছে বলে।

পড়াশুনো তাদের কিছুই হোলো না। তবু বন্ধুত্ব হোলো আরো গাঢ়। দু'জনেই বাড়িতে বকুনি খায়, তারপর বাইরে একসঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে এর দুঃখ ওকে জানায়। তারপর দু'জনেই নিশ্বেস ফেলে আর প্ল্যান করে। যেমন করেই হোক বড় তাদের হতেই হবে। ভীষণ বড় হতে হবে। যাতে তাদের নাম শুনে লোকে চমকে যায়। যাতে রাস্তা দিয়ে তারা হাঁটলে লোকে বলে : মানুষের মতো মানুষ দেখতে চাও তো ওই দেখো।

সুখে-দুঃখে, গালমন্দ খেয়ে, প্ল্যান করে আর নিশ্বেস ফেলে অনেক দিন কেটে গেলো। পাঁচকড়ি আর ভুতো এখন আর ছোট্টটি নেই। দিব্বি বড়সড় হয়ে উঠেছে। পাঁচকড়ি লম্বায়

আরো বেড়েছে, চওড়ায় আরো কমেছে। আর ভুতো চওড়ায় অনেকটা বেড়েছে তাই যেন লম্বায় খানিক কমেছে।

সময় যায়। দেখতে দেখতে লড়াই এসে গেলো। চারদিকে হুলুস্থুল কাণ্ড। পাঁচকড়ি আর ভুতো যেখানেই যায় সেখানেই দেখে লোকে কী ভীষণ ব্যস্ত। সবাই কিছু-না-কিছু করছেই।

হয় লড়াই করতে চলে যাচ্ছে, না হয় স্ক্রু-আর ছুঁচ বেচে বড় মানুষ হচ্ছে—কিছু না পেলে খাকি সার্ট আর পেন্টালুন পরে লোকে সিভিক গার্ড কিংবা এ, আর, পি, হয়ে বিড়ি টানছে আর ফুটপাথে গোল হয়ে বসে পাতা-বিন্তি খেলছে। সবাই কিছু-না-কিছু করছেই। শুধু তাদের কপালেই জুটলো না। দিনের পর দিন কাটতে লাগলো বাড়ির লোকের গাল-মন্দ খেয়ে।

তারা অনেক বড় হয়ে গেছে। এখনো কিছু না করলে আর ভালো দেখায় না। তাই একদিন তারা ঠিক করলো যেমন করেই হোক কাল থেকে কিছু তারা করবেই। কিছু একটা করতে হলে আগে দরকার কিছু টাকার। তাই পরের দিন দুজনেই বাড়ির লোকের পকেট হাতড়ে, বাক্স ভেঙে এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো। তারপর দু'জনে ভালো করে গুণে দেখলো কত টাকা তারা এনেছে। এক—দুই করে গুণতে গুণতে তিন শ'-তে এসে থামলো। তারা মোট তিন শ' টাকা জোগাড় করেছে। এবারে তা, হলে যা হোক তারা কোনো ব্যবসা-ট্যবসা করতে পারবে। তিন শ' টাকা তো আর কম নয়।

কিছু একটু করার আগে আর তারা বাড়ি ফিরবে না। তাই বাড়ি না ফিরে ইষ্টিশানের কাছের দোকান থেকে সিঙারা আর জিলিপি পেট ভরে খেয়ে টিকিট কিনে তারা ট্রেনে চেপে বসলো। সমস্ত রাত ভিড়ের ঠেলায় গা-গতর ছেঁচে গেলো। সকালের দিকে লোকজন নেমে যেতে তারা যখন আরাম করে বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমোবার উপক্রম করছে এমন সময় রেল কোম্পানির লোক এসে তাদের নামিয়ে দিলো। বললো, শিলিগুড়ি এসে গেছে, গাড়ি আর যাবে না।

রেলগাড়ি থেকে নেমে তারা প্রথমেই টের পেলো ভীষণ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। ইষ্টিশান থেকে বেরিয়ে ইটের মতো মিষ্টি আর চামড়ার মতো পুরি পেট ভরে খেয়ে এক গাছের তলায় বসে ঢেকুর তুলতে-তুলতে ভালো করে তারা চারদিকে চেয়ে দেখলো।

পাঁচকড়ি বললো, "ভুতো, ভগবান আমাদের ঠিক জায়গায় এনে দিয়েছেন। ওই দ্যাখ সামনে হিমালয় পর্ব্বত। আমরা গেরুয়া পরে সন্ন্যেসী হয়ে ওই পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরবো। বনের ফল মূল খাবো। গাছ তলায় ঘুমোবো। আর বাড়ি ফিরবো না।"

ভুতো বললো, "আরে, সন্ন্যেসী হওয়া কি আর সোজা কথা! তুই না হয় চিমসে আছিস। ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াবি। কিন্তু এই ঢাউস শরীরটাকে টেনে টেনে আমি কি করে রাত্র দিন ঘুরে বেড়াই বল? তা ছাড়া জঙ্গলে তো বাঘ-টাঘ আছে। আমাদের দুজনকে দেখলে তোর চিমড়ে শরীর ফেলে আগে আমাকেই তারা গিলে ফেলবে।—ও-সব সন্ন্যেসী হওয়া টওয়া-তে কাজ নেই। তার চেয়ে আমি একটা প্ল্যান বলি শোন। সমস্ত রাত ধরে ভেবেছি। ভগবান আমাদের ঠিক জায়গাতেই এনে ফেলেছেন। এখানেই চমৎকার ব্যবসা জমবে। বলি প্ল্যানটা?"

পাঁচকড়ি নিশ্বেস বন্ধ করে বললো, "বল।"

ভুতো খুব ফিস ফিস করে বললো, "এখানে আমরা ছেলেধরা হয়ে যাই—"

"ছেলেধরা, সে কী রে?"

"হাঁ, ছেলেধরা। ছেলেধরার ব্যবসা কি নিতান্ত ছেলেখেলার ব্যবসা হোলো? আমাদের যারা প্রভু—সেই ইংরেজদের দেশেও এ-ব্যবসা জোর চলে। আর ইংরেজদের যারা প্রভু—সেই আমেরিকানদের দেশে তো এ ব্যবসার কথাই নেই!—কোনো হ্যাঙ্গামা নেই। বেশ বড়লোকের একমাত্র ছেলে দেখে মিষ্টি কথা বলে ভুলিয়ে নিয়ে যাবো। তাকে ভালো খাওয়াবো-পরাবো আর তার বাপকে খবর দেবো অন্তত পাঁচ হাজার টাকা নগদ না দিলে ছেলে ফেরৎ পাবে না। টাকা সে দেবেই। তা হলেই গ্যাখ, 'আমরাও টাকা পাবো, বাপও ছেলে ফেরৎ পাবে, ছেলেটাও দু-চারদিন আমাদের কাছে ভালো থাকবে, ভালো খাবে, লেখাপড়া করতে হবে না—কেন, এ ব্যবসা খারাপ হোলো নাকি?"

নিজের মাথা চুলকে পাঁচকড়ি তারিফ করে বললো, "বাস্তবিক, তোর মাথা আছে ভুতো। চল, এখনি বেরিয়ে পড়ি।"

ভুতো বললো, "চল। কিন্তু খুব সাবধান। এ ব্যবসায় পদে পদে বিপদ। ধাঁ করে বেফাঁস কিছু করে বসিস্‌নি যেন।"

সমস্ত দিন ধরে ভুতো আর পাঁচকড়ি শিলিগুড়ি সহরটাকে চষে ফেললো। কিন্তু ধরার মতো ছেলে পাওয়া যায় কোথায়? যদি বা ছেলে দেখে, খোঁজ নিয়ে জানে প্রথমত সে-ছেলে একমাত্র ছেলে নয়, দ্বিতীয়ত তার বাবার এমন অবস্থা নয় যে ছেলের জন্যে হঠাৎ পাঁচ হাজার টাকা বার করতে পারে। এদিকে বড়লোকও যে এ-সহরে নেই তা নয়। তবে খোঁজ নিয়ে তারা জানে বড়লোকদের হয় ছেলেপিলে নেই, না হয় তো ছেলেপিলে আছে কিন্তু এ-সহরে নেই। কেউ কলকাতায় মামার বাড়িতে হাওয়া খাচ্ছে, কেউ বা কালিম্পঙের বোর্ডিংএ পড়ছে। ধরবার মতো ছেলে পাওয়া যে এতো কঠিন ভুতো আগে ঠিক এ-কথাটা জানতো না।

ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এলো। ভুতো আর পাঁচকড়ি বেজায় ক্লান্ত। ছেলে ধরবার

জন্যে দু' জনে দু' পকেট লজেঞ্জুসে ভরেছিলো। পকেটগুলো এখন প্রায় খালি হয়ে এসেছে। নিজেরাই তারা খেয়েছে। খাওয়াবার মতো একটি ছেলেও খুঁজে বার করতে পারেনি।

সূয্যি ডুবুডুবু। হাঁটতে-হাঁটতে তারা সহরের একেবারে ধারে এসে পড়েছে। আর খানিক গেলে সহর ছাড়িয়ে তরাইর জঙ্গলে এসে পড়বে। এমন সময় ভুতো হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে, মুখের উপর একটা আঙুল তুলে বললো, "শ্—শ্—শ্—"

ফিসফিস করে পাঁচকড়ি প্রশ্ন করলো, "কী-রে ?"

আঙুল তুলে দূরে দেখিয়ে ভুতো বললো, "ওই ছাখ, ভগবান এবারে মুখ তুলে চেয়েছেন।"

ভুতোর আঙুল অনুসরণ করে পাঁচকড়ি দেখতে লাগলো : কিছুদূরে একটা যেন বড় বাড়ি। সেই বাড়ির ফটক ঠেলে সাত-আট বছরের একটি ছেলে দৌড়ে বেরিয়ে এলো। তার সামনে একটা কুকুর প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। কুকুরটার ল্যাজে একটা টিনের কৌটো বাঁধা।

ভুতো বললো, বাড়িটা যখন অত বড় তখন নিশ্চয়ই তার মালিক খুব বড়লোক। আর বাড়িটার ভেতর থেকে ছেলেটা যখন বেরুলো তখন সে বাড়িওলার ছেলে না হয়ে যায় না।-- চল পাঁচকড়ি, আমরা পা টিপে টিপে এগোই। সন্ধ্যেও হয়ে এসেছে। টপ করে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে যাবো।"

তারা যখন কাছাকাছি এলো ছেলেটা তখন থেমেছে। ল্যাজের উপরকার টিনের কৌটোটার উপর চটে কুকুরটা গোল হয়ে নিজেই নিজের ল্যাজ কামড়ে গোঁ-গোঁ করে চীৎকার করছে আর ঘুরপাক খাচ্ছে আর ছেলেটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে লাফাচ্ছে। আর মহা ফুর্তিতে নানা রকম কুস্বর বার করছে।

পকেট থেকে লজেঞ্জুস বার করে ভুতো ছেলেটার কাছ এগিয়ে গিয়ে বললো, "শোনো খোকা—"

"খোকা কি রে মুটকো!" কুকুরটার উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ভুতোকে সে বললো।

একটু হকচকিয়ে ভুতো বললো, "না-না রাগ করো কেন খোকাবাবু! আমি বলছিলুম কি ওই বাড়িটা কি তোমাদের ?"

ছেলেটা মুখ ভেংচে ভুতোর স্বরের নকল করে বললো, "—বাড়িটা কি তোমাদের ? মর মোটা! চোখের মাথা খেয়েছিস্ নাকি ?"

ভুতো পকেট থেকে এক মুঠো লজেঞ্জুস বার করে বললো, "খোকাবাবু, লজেঞ্জুস খাবে ?"

এবারে ছেলেটার মুখচোখের চেহারা বদলে গেলো। এগিয়ে এসে গোটা পাঁচ ছয় লজেঞ্জুস এক সঙ্গে মুখে পুরে কড়মড় করে চিবোতে লাগলো, বাকিগুলো পুরলো তার হাফ-প্যাণ্টের পকেটে।

এতক্ষণে পাঁচকড়ি এগিয়ে এসেছে। সে বললো, "আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবে? আরো অনেক লজেঞ্চুস দোবো।"

ছেলেটা বললো, "এই শুঁটকো লোকটা আবার কেরে? তুই আবার কোত্থেকে এলি?"

পাঁচকড়ি বললো, "ভুতো আর আমি দু ভাই কিনা—"

"বাঃ, বেড়ে ভাই তো!" হাত তালি দিয়ে ছেলেটা বললো, "রাম শ্যাম দুই ভাই, ব্যাঙ মার ঠুট ঠাই!—তোর কাছে লজেঞ্চুস নেই?"

একমুখ হেসে এক মুঠো লজেঞ্চুস বার করে ছেলেটার হাতে দিয়ে পাঁচকড়ি বললো, "আমাদের সঙ্গে চল খোকাবাবু; কত লজেঞ্চুস দোবো, কত খেলনা দোবো, কত গল্প বলবো! যাবে?"

ঘাড় নেড়ে ছেলেটা বললো, "এক্ষুনি যাবো। কিন্তু সত্যি বলছিস তো, না মিথ্যে বলছিস? যদি না দিস তা হলে তোদের দু' ভাইকে বঁটি দিয়ে কেটে চচ্চড়ি করে খাবো।"

উৎসাহিত হয়ে ভুতো বললো, "নিশ্চয় খাবে খোকাবাবু, এ আর বেশি কথা কি! বাড়িতে বুঝি তোমার বাবা থাকেন?"

ছেলেটা বললো, "শুধু বাবা কেন, বাবার চাকর থাকে, আমার ঝি থাকে আরো কত লোক থাকে।"

ছেলেটার হাত ধরে ভুতো ততক্ষণে সহরের বাইরের পথ দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। পাঁচকড়ি চলেছে পিছন-পিছন।

ভুতো বললো, "খোকাবাবু, তোমার বাবার বুঝি অনেক টাকা আছে?"

ছেলেটা বললো, "আছে বৈকি! চারটে সিন্দুক ঠাসা টাকা আছে। তবে জানিস, বাবা ভারি কেপ্পন, তোদের মতো একদিনও আমাকে লজেঞ্চুস খাওয়ায়নি। তা তোরা শুঁটকো আর মুটকো হলে হবে কি—তোরা লোক ভালো। আমাকে আরো চকোলেট দিবি তো আর লজেঞ্চুস আর একটা রেলগাড়ি আর একটা বন্দুক আর একটা তরোয়াল"—

পাঁচকড়ি বললো, "লজেঞ্চুস চকোলেট বিস্কুট যত চাইবে তত দোবো। কিন্তু বন্দুক আর তরোয়াল নিয়ে কী করবে?"

ছেলেটা বললো, "লড়াই-লড়াই খেলবো। তুই শুঁটকো আছিস, তোর পিঠে চড়ে এই মুটকোটাকে শিকার করবো। হাতি শিকার করা খেলবো। কেমন দিবি তো?"

মনে—মনে শিউরে উঠলেও পাঁচকড়ি বললো, "নিশ্চয়ই দেবো। খোকাবাবু যা চাইবে তাই আমরা দোবো।"

ছেলেটা বললো, "আর হাঁটতে পারছি না। এই শুঁটকো, তুই বোস তোর কাঁধে চাপি।"

পাঁচকড়ি'র কাঁধে চক্ষের নিমেষে চড়ে বসে ছেলেটা বললো, "হ্যাট-হ্যাট, জলদি চল্। তুই আমার পক্ষীরাজ ঘোড়া হলি আজ থেকে। গরুর মতো টিকিয়ে-টিকিয়ে চলছিস কেন ?"

রাত্রি এগারটা। ছেলেটা একটি ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে। চারদিকে শাল গাছের জঙ্গল। জনমনিষ্যি কোনো দিকে নেই। ঝিঁঝির ডাক শুধু শোনা যায়। আর কোনো শব্দ নেই। কুঁড়ের ভিতরে খড়ের গাদা। তার উপর ভুতো আর পাঁচকড়ির কোট বিছিয়ে একটি বিছানা করা হয়েছে। বিছানায় শুয়ে সেই বাচ্চা ছেলেটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। একটি মাত্র মোমবাতি জ্বলছে।

ঘরের দরজার কাছে পাঁচকড়ি আর ভুতো বসে। তাদের চোখে ঘুম থাকলেও ঘুমোবার উপায় একেবারে নেই। ছেলেটাকে পাহারা দিতে হবে তো। সহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ছেলেটাকে কাঁধে করে এনে এই ভাঙা পরিত্যক্ত কুঁড়ে ঘরটা তারা আবিষ্কার করেছে। এখানে তাদের খোঁজ সহজে কেউ যে পাবে তার সম্ভাবনা একেবারেই নেই।

পাঁচকড়ি ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, "ভুতো। ক্ষুদে সয়তানটা আমাকে তো শেষ করে ফেলেছে প্রায়। আমার ঘাড়টাই বা এখনো রয়েছে কী করে, ঘাড়ের ওপর মাথাটাই বা কী করে আছে তাই ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি।"

ভুতো সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "আরে, টাকা কি আর সহজে আসে! মাথার ঘাম পায়ে না পড়লে টাকা রোজগার হয় না। পাঁচটি হাজার করকরে টাকা যখন হাতে পাবি, দেখিস ঘাড়ের ব্যাথা-ট্যাথা কোথায় উড়ে যাবে।"

এই বলে ভুতো কাগজ পেন্সিল বার করে চিঠি লিখতে বসলো। ছেলেটার কাছ থেকে বহু কষ্টে তার আর তার বাবার নাম ভুতো বার করেছেঃ ছেলেটার নাম সুবোধ, তার বাবার নাম বরদা ভূষণ পাইন।

ভুতো লিখে চললোঃ

প্রিয় বরদাবাবু,

আপনার একমাত্র পুত্র সুবোধকে আমরা চুরি করে এনেছি। এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি যেখান থেকে পুলিশের কিংবা ডিটেকটিভের সাধ্য নেই তাকে খুঁজে বার করে। অতএব আমাদের সঙ্গে চালাকি করে পুলিস কিংবা ডিটেকটিভের শরণাপন্ন হবেন না। সুবোধকে ফিরে পেতে হলে আমরা যেখানে বলবো ঠিক সেখানে নগদ পাঁচ হাজার টাকা রেখে যাবেন। টাকা পাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার পুত্র হাসিমুখে বাড়ি ফিরবে।

আপনার বাড়ির উত্তর দিক ধরে চল্লিশ মিনিট হাঁটবার পর বাঁ দিকে প্রকাণ্ড একটি অশত্থ গাছ দেখবেন। সেই অশত্থ গাছের গুঁড়িতে একটি গর্ত্ত আছে। আজ রাত্রি বারোটায় একজন লোক মারফৎ একটি চিঠিতে আপনি জানাবেন আমাদের সর্তে আপনি রাজী আছেন কিনা।

আমাদের কোন ভাবে প্রতারিত করবার চেষ্টা করলে ইহ-জীবনে আর আপনার পুত্রকে দেখতে পাবেন না—এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত। ইতি।

'ছেলেধরা'

চিঠি লেখা হবার পর ভুতো একবার সেটা পাঁচকড়িকে পড়ে শোনালো। ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে পাঁচকড়ি বললো, "ভাই ভুতো, এই পাঁচ হাজার টাকাটা কেটে আড়াই হাজার করে দে। এই শয়তানটার জন্যে কেউ আড়াই হাজার দিলেই আমরা খুসি থাকবো। কী বলিস?"

ভুতো উত্তরে বললো, "দূর ভীতু।"

পরের দিন ভোর হতে-না-হতেই ভুতোর চীৎকার শুনে পাঁচকড়ি জেগে উঠলো। যা দেখলো তাতে তো পাঁচকড়ির চক্ষুস্থির হবার অবস্থা। সেই শয়তান ছেলেটা ইতিমধ্যে কখন উঠে ভুতোর বুকের উপর চেপে বসে নাচতে সুরু করেছে। ভুতো মোটা মানুষ। কিছুতেই কায়দা করে তাকে সরিয়ে উঠে বসতে পারছে না।

পাঁচকড়ি ছেলেটাকে টেনে-হিঁচড়ে কোনো রকমে নামিয়ে বেশ খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে বললো, "হতভাগা ছেলে কোথাকার। কী বাঁদরামো হচ্ছে?"

ছেলেটা চোখ পাকিয়ে বললে, "এই খবর্দার! জানিস, আমি ভোলো ডাকাত? আমার গায়ে হাত? আজ তোকে কুচিকুচি করে কেটে রাখবো তখন মজাটা টের পাবি!"

এ ছেলের পক্ষে সব সম্ভব। পাঁচকড়ির সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মিষ্টি করে বুঝিয়ে তাকে বললো, "ছিঃ সুবোধ! ভুতো তোমার চেয়ে কত বড়। তার বুকে চেপে বসে নাচতে আছে নাকি?"

সুবোধ বললে, "বারে! তোর কাঁধে উঠেছিলুম—ঘোড়ায় চড়া হয়েছিলো। আজ আমার হাতিতে চাপার শখ হয়েছে। আজ মোটকার বুকে চড়বো না?"

পাঁচকড়ির মেজাজ সকাল থেকেই ভাল নেই। ঘাড়টা সমস্ত রাত এমন টনটন করছে যে ভালো ঘুম একেবারেই হয়নি। তার উপর ক্রমাগত 'মোটকা' আর 'শুঁটকো' আর তুই-তুই শুনতে-শুনতে তার ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে গেলো। ছেলেটার কান ধরে ঘরের বাইরে এনে ভয় দেখাবার জন্যই বললো, "যা, দূর হ। এখানে তোকে বাঘে-ভালুকে ধরুক—আমরা কিছু জানি না।"

রাগে গরগর করতে-করতে পাঁচকড়ি ঘরে এসে বসলো। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সাঁ করে একটা গোল পাথর এসে লাগল তার রগে। আর একটু হলেই তার ডান চোখটা কানা হয়ে যেতো।

হন্তদন্ত হয়ে দু'জনে বাইরে এসে দেখে ছেলেটা তার হাফ-প্যান্টের পকেট থেকে গুলতি বার করে তাদের দিকে আবার টিপ করছে।

ভুতোর উপস্থিত বুদ্ধি বেশি। পকেট থেকে তৎক্ষণাৎ এক মুঠো লজেঞ্চুস বার করে সে বললো, "ছি-ছি সুবোধ। গুলতি দিয়ে কখনো মারতে আছে? এই নাও লজেঞ্চুস।"

বুক ফুলিয়ে সুবোধ গুলতিটা পকেটে রেখে লজেঞ্চুসগুলোকে কড়মড় করে চিবোতে লাগলো। তারপর খাওয়া শেষ হলে বললো, "শিগগীর খাবার দে। ক্ষিদে পেয়েছে। না দিলে তোদের কেটে খেয়ে ফেলবো। জানিস, আমি ভোলা ডাকাত!"

ভুতো বললো, "তোমার জন্যই তো খাবার আনতে যাচ্ছি। তুমি লক্ষ্মী হয়ে পাচকড়ি মামার কাছে গল্প শোনো। ততক্ষণ আমি খাবার কিনে আনি।"

"ইস্! মামা! বললেই হোলো কিনা! আমার মামা অমন শুঁটকো নাকি—? শিগগীর-শিগগীর তুই খাবার কিনে আন। আমি ততক্ষণ এর সঙ্গে ঘোড়া-ঘোড়া খেলি। এই শুঁটকো হামা দিয়ে বোস্, আমি তোর পিঠে চড়বো। যতক্ষণ না খাবার আসে ততক্ষণ আমাকে পিঠে করে ঘুরে বেড়া।" এই বলে বেশ শক্ত দেখে একটা ছপটি জোগাড় করে সুবোধ এগিয়ে গেলো।

কাতর স্বরে পাঁচকড়ি ভুতোর কানে-কানে বললো, "ভুতো ভাই! চিঠিটা দিয়েই তুই দৌড়ে চলে আসিস। একা থাকতে আমার ভয় করছে।" বলে শুকনো মুখে সে হামা দেবার ভঙ্গীতে ঘোড়া হয়ে বসলো। সুবোধ চক্ষের নিমেষে তার পিঠে সোয়ার হয়ে বললো, "হ্যাট হ্যাট..."

যাবার আগে ভুতোকে পাঁচকড়ি বললো, "দোহাই তোর ভুতো—চিঠিতে পাঁচ হাজার কেটে আড়াই হাজারও করিস না। দু'হাজার কর। এর জন্যে দু' হাজার পেলেই যথেষ্ট।"

চিঠিটা কায়দা করে সুবোধের বাবার বাড়িতে ফেলে বাজার করে ফিরতে ভুতোর বেশ খানিকটা দেরি হোলো। মাথার উপর চড়চড়ে রোদ্দুর, গলদঘর্ম হয়েই ফিরলো ভুতো। ফিরে দেখে বাড়িটায় কেউ নেই: না-পাঁচকড়ি না-সুবোধ। কয়েকবার ভুতো তাদের নাম ধরে ডাকলো। কোনো সাড়া নেই। অগত্যা একাই সে খাবার-দাবার বার করে খেতে সুরু করে দিলো।

মিনিট পনেরো পরে দেখা গেলো সামনের জঙ্গল ঠেলে পাঁচকড়ি বেরিয়ে আসছে।

জামা-কাপড় ছেঁড়া, চোখ দুটো টকটকে লাল, হাত-পা ছড়ে গেছে, ঘামে একেবারে সপসপে হয়ে ভিজে গেছে। তবু তার মুখে একটি প্রশান্ত মধুর হাসি। অনেক দিন রোগে ভোগবার পর জ্বর ছাড়লে লোকের মুখের চেহারা যে-রকম হয় অনেকটা সে-রকম। পাঁচকড়ি ভুতোকে দেখে এগিয়ে এলো। সে এগিয়ে আসার পর নিঃশব্দে সুবোধও জঙ্গল ঠেলে এসে দাঁড়ালো।

পাঁচকড়ি পিছন না ফিরেই বলতে লাগলো, "ভুতো! এ ব্যবসা ছেড়ে দে ভাই, আমাদের মতো দুর্ব্বল জাতের পক্ষে এ ব্যবসা করা সম্ভব নয়। আমরা বরঞ্চ চাল-ডাল কিনে মুদির ব্যবসা করি, সেই ভালো।"

"কেন, কী হোলো?"

"হবে আর কি," ভুতোর সামনে মাটির উপর বসেই পাঁচকড়ি সুরু করলো, "তুই চলে যাবার পর থেকে সেই হতভাগা শয়তান তো আমাকে ঘোড়া করে একেবারে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে। যতবার থেমেচি ততবার করে ছপটি চালিয়েছে সে—এই ছাখ আমার গায়ে দাগ। ফুলে-ফুলে উঠেছে সমস্ত শরীর। তারপর সে একসময় বললো, 'এই শুঁটকো! তুই তো ঘোড়া। ঘোড়ায় তো ঘাস খায়। তুই তো কই খাচ্ছিস না! তোকে ঘাস খেতেই হবে।' তাও হাসিমুখে সহ্য করলুম। যা খিদে পেয়েছে তাতে ঘাস চিবোতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো না। তারপর সে ক্রমাগত প্রশ্ন করতে লাগলো: গর্তগুলো একেবারে ফাঁকা কেন? গাছ নড়লে হাওয়া হয় না হাওয়া দিলে গাছ নড়ে? তুই এ-রকম শুঁটকো তালগাছ হলি কী করে? আকাশের তারাগুলো গরম না ঠাণ্ডা? ষাঁড় কী করে ডাকে? ময়না কথা বলতে পারে কিন্তু বাঁদর আর মাছ কথা কইতে পারে না কেন? কতর পিঠে কত যোগ করলে তিপান্ন হয়? গোলাপ ফুল লাল কেন? কেঁচোর কেন ফনা নেই? কমলালেবু গোল হয় কেন?—ভাই ভুতো, সত্যি বলছি আমার সহ্যের সীমা একেবারে ভেঙে গেলো। কোনো মানুষ এর চেয়ে বেশি অত্যাচার সহ্য করে নি। সেই হতভাগা ছোকরার ঘাড় ধরে টেনে তাকে রাস্তায় নিয়ে গেলুম তারপর দু'গালে ঠাস-ঠাস করে চড় কষিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে এলুম।"

ভুতো শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলো, "পাঁচকড়ি! তোদের বংশে কারুর হার্টের অসুখ ছিলো?"

পাঁচকড়ি বললো, "না ভাই। হার্টের অসুখ কারুর নেই। মাঝে মাঝে এর ওর শুধু সর্দি-কাসি হয়, ম্যালেরিয়া আর আর ইনফ্লুয়েঞ্জাও কয়েকবার হয়ে গেছে।"

"তা হলে পেছন ফিরে একবার ছাখ।" বললো ভুতো। আর পাঁচকড়ি পিছন ফিরে সুবোধকে দেখে যেন কেমন হয়ে গেলো। খাওয়া-দাওয়ার কথা গেলো ভুলে। তার সমস্ত মুখ থেকে রক্ত যেন জল হয়ে মাটিতে ঝরে পড়লো।

রাত্রি প্রায় বারোটা। সেই অশথ গাছটায় সন্ধ্যে থেকেই ভুতো চড়ে বসে আছে। দেখা গেলো কাঁটায় কাঁটায় বারোটা বাজার সঙ্গে একটি লোক সাইকেল থেকে নেমে টর্চ জ্বালিয়ে গুঁড়ির সেই গর্তটা খুঁজে তার মধ্যে একটি চিঠি ফেলে চলে গেলো।

লোকটা চলে যাবার পর আরো আধ ঘন্টা ভুতো নামলো না। তারপর যখন নিঃসন্দেহ হোলো কেউ কোথাও নেই, নিঃশব্দে নেমে চিঠিটা বার করে সোজা চলে এলো সেই কুঁড়ে ঘরটায়। ছেলেটা দিব্বি আরাম করে ঘুমোচ্ছে বটে কিন্তু পাঁচকড়ি ঠায় জেগে বসে রয়েছে।

মোমবাতির আলোয় তারা চিঠিটা পড়লো ঃ—

সবিনয় নিবেদন,

আমার মতে সুবোধের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা দাবী করে আপনারা একটু বেশিই চেয়েছেন। আমি আপনাদের একটি পাল্টা প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনারা যদি আজ রাত্রের মধ্যেই সুবোধকে ফিরিয়ে দিয়ে যান এবং সেই সঙ্গে নগদ আড়াই শ' টাকা দেন তবেই আমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে নেবো। আমার সন্তানের সঙ্গে আশা করি ইতিমধ্যে আপনাদের পরিচয় নিবিড় হয়েছে। সে কারণেই মনে করি আমার এই প্রস্তাব আপনারা উপেক্ষা করবেন না। ইতি

বংশবদ

শ্রীবরদাভূষণ পাইন

ভুতো উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিলো। পাঁচকড়ি তার হাত ধরে বললো, "ভাই ভুতো, আড়াই শ' টাকা তো। তার বেশি তো নয়। ভগবানের কী দয়া, আমাদের কাছে এখনো ঐ টাকা রয়েছে! ভাই ভুতো, আর কথা বাড়াস নি। এ সুযোগ হেলায় হারাস নি। এখনি চল্।"

ভুতো খানিক গুম হয়ে বসে কী সব ভাবলো, তারপর বললো, "ঠিকই বলেছিস। এ সুযোগ হারানো ঠিক হবে না। ছেলেটাকে তোল্।"

ঘুম থেকে উঠে সুবোধ কিন্তু একেবারে বেঁকে বসলো। "কক্ষনো বাড়ি যাবো না। তুই যেমন মোটকা, ভুতো, তোর বুদ্ধিটাও সে রকম মোটা। বাড়িতে কে আমাকে রাত দিন লজেঞ্চুস দেবে? কে ঘোড়া হয়ে পিঠে চাপিয়ে বেড়াবে? কে গল্প বলবে? বাড়িতে গেলেই তো মাষ্টারমশাই আসবে, বাবার বেত লক লক করবে। বাড়ি যেতে হয় তোরা যা, আমি কিছুতেই যাবো না।"

অনেক ভুলিয়ে-ভালিয়ে অনেক মিথ্যে কথা বলে শেষ পর্য্যন্ত সুবোধকে বাড়ি যেতে রাজী করানো গেলো। তাকে বলা হোলো তার বাবা সত্যি-সত্যিই তার জন্যে একটা বন্দুক কিনে এনেছে। বন্দুকের কথা শুনে সুবোধ তবু খানিকটা ভিজলো। তারপর বললো, "শুঁটকোর ঘাড়ে উঠে যাবো না। মোটকার ঘাড়ে চড়ে যাবো। ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছি, হাতির পিঠে চড়ে ফিরবো।"

প্রায় রাত শেষ হয়ে আসছে এমন সময় তারা তিনজন বাড়ি ফিরলো। সুবোধের বাবা তাদের অপেক্ষাতেই জেগে ছিলেন। সুবোধকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ভুতো হাঁপাতে লাগলো আর পাঁচকড়ি তাড়াতাড়ি করে গুণে দিলো নগদ আড়াই শ' টাকা।

সুবোধ যখন বুঝলো পাঁচকড়ি আর ভুতো তাকে রেখে চলে যাবে আর দেখলো বন্দুক টন্দুক বাজে সব কথা চক্ষের নিমেষে সে ভুতোকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলো। এতটা পথ তাকে কাঁধে করে এনেই ভুতোর যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে। সে কাতর স্বরে সুবোধের বাবাকে বললো, "আমরা আমাদের কথা রেখেছি, এবার আপনি আপনার কথা রাখুন।"

"নিশ্চয়ই," বললেন সুবোধের বাবা। তারপর অমানুষিক শক্তিতে সুবোধকে ভুতোর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিলেন।

মুক্তি পেয়ে ভুতো প্রশ্ন করলো, "কতক্ষণ ওকে ধরে রাখতে পারবেন?"

"আমার শরীরের শক্তি ক্রমশ কমে আসছে," বললেন সুবোধের বাবা, "তবু মনে হয় মিনিট দশেক আটকে রাখতে পারবো।"

"যথেষ্ট", ভুতো বললো, "দশ মিনিটে আমি পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে যাবো।"

বলেই ভুতো দৌড় দিলো। তার পিছন পিছন ছুটলো পাঁচকড়ি। ইস্কুলের স্পোর্টস-এ পাঁচকড়ি বরাবর দৌড়ে প্রথম হয়েছে আর মোটা বলে ভুতো কখনোই ভালো দৌড়তে পারে নি। কিন্তু সেদিন শিলিগুড়ির ভোর বেলাকার আলোয় একটা আশ্চর্য কাণ্ড দেখা গেলো। হাওয়ার আগে ভুতো দৌড়চ্ছে, তার মোটা শরীর যেন হাল্কা পালক হয়ে গেছে। আর অনেকটা পিছনে দৌড়চ্ছে পাঁচকড়ি। পাঁচকড়িও তাই বলে আস্তে দৌড়চ্ছিলো না। যে কোনো ভালো রেসের ঘোড়ার তার সঙ্গে সেদিন পারতো না।

কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



বিজয়কেতু পড়ছে। তার সামনে টেবিলে আবলুষ কাঠের খুরোর ওপর বসানো রয়েছে রুপোর পেয়ালাটি। তার মসৃণ, পালিশ করা সাদা গায়ে বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলো পড়ে ঝিক্ ঝিক্ করছে। বিজয়কেতু পড়ছে আর পেয়ালাটিকে মাঝে মাঝে দেখ্ছে। এক একবার উঠে দাঁড়িয়ে যখন সে তার দিকে ঝুঁকে পড়ছে তখন পেয়ালাটার গায়ে ফুটে উঠছে তার মুখের প্রতিবিম্ব কিছু বিকৃত হয়ে। পেয়ালাটির ভিতরটা উজ্জ্বল সোনালিতে গিল্টি করা। আলোয় সোনার মতো ঝিলিক দিচ্ছে যেন আনন্দ উপছে পড়ছে।

পেয়ালাটি সে পুরস্কার পেয়েছে পাঁচদিন আগে শারীরিক কসরৎ প্রতিযোগিতায়। তার মতো কসরৎ কেউ দেখাতে পারেনি। সমবয়সী বিশটি ছেলের মধ্যে, পাঁচখানি পল্লীতে সে হয়েছে প্রথম। গতকাল একখানি বাংলা দৈনিকে তার ছবি বেরিয়েছে—সে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে রুপোর পেয়ালাটি।

সে কতজনকে পেয়ালাটি দেখিয়েছে। দেখে কতজন তার পিঠে থাবড়ে তাকে তারিফ করেছে, উৎসাহ দিয়েছে। পেয়ালাটীতে ভাই বোন কাউকেই সে হাত দিতে দেয় না। যতক্ষণ বাড়ি থাকে ততক্ষণ সেটিকে আগলে রাখে। সে বীর! তার চোখ মুখ থেকে গর্ব্ব ও আনন্দ উপছে পড়ছে।

তিন দিন বাদলার পর সেদিন দুপুর থেকে ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রোদ ঝরে পড়ছে। তার ছোঁয়া লেগে সব ঝলমল, ঝিকিমিক টলটল করে উঠছে। পথে পথিক ও যানবাহনের মেলা। তারা চলেছে যেন আলোকের আনন্দে।

পথের এক জায়গায় একখানি বাড়ির প্রকাণ্ড গাড়ি বারান্দার তলায় জমেছে ভিড়—শিশু, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের। তারা সকলেই সাধারণ লোক। পথের তামাসা ভদ্রলোককে আকৃষ্ট করে না। তাই ভিড়ে পরিষ্কার জামা কাপড় ও ভব্য চেহারা বড় একটা চোখে পড়ছে না।

বিজয়কেতু আসছিল স্কুল থেকে। ঢোলের আওয়াজ শুনে সে ঢুকে পড়লো ভিড়ের মধ্যে এবং দর্শকদের জনকতকের বিরক্তি উৎপাদন করে গিয়ে দাঁড়ালো সকলের আগের সারিতে।

সে দেখলে খেলা দেখাচ্ছে লেংটিপরা পাকা জামের মতো কালো আট দশ বছরের একটি ছেলে। তার শরীরে যেন এক টুকরোও হাড় নেই। সে যেন আগাগোড়া নমনীয় পেশী দিয়ে তৈরী। সে মাটিতে শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে নানা রকমের কসরৎ দেখাচ্ছে। তার পেশীগুলো এমন ভাবে খেলছে যে মনে হচ্ছে, গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট ছোট ঢেউ। তার দেহের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমা হচ্ছে নানা রকম। সে চোখের পলকে বাঁকছে, বাঁকাচ্ছে নোয়াচ্ছে, নুইছে। তার শরীরটি কখন হচ্ছে অদ্ভুত, কখন সুন্দর, কখন পাকিয়ে গুটিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে, কখন খুলে ছড়িয়ে বড় হচ্ছে। তার মুখে শ্রম, ক্লান্তি বা বিরক্তির এতটুকু চিহ্ন নেই, ডাগর চোখ দুটির চাহনি স্বাভাবিক। সে খেলা দেখাচ্ছে, বাজীকরের ঢোলকের তালে তালে কলের পুতুলের মতো।

বিজয়কেতু অবাক হয়ে তার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলো। সেও ঐ সব কসরতের দু তিনটে জানে। কিন্তু অত সুন্দর, অমন সহজ আর ওরকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খেলাগুলো দেখাতে পারে না। সে মনে মনে লজ্জা পেল। ছেলেটির সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে মনে হ'ল ছোট। তার অহঙ্কার ও আনন্দের বেলুনটা যেন হঠাৎ গেল চুপসে।

তার পাশ থেকে একটি লোক বলে উঠলো, "ছোঁড়াটাকে তিন বছর বয়স থেকে শিখিয়েছে, না হলে ও অমন কসরৎ দেখাতে পারে? দেখছো না, পা দুখানা পিছনে লতার মতো বেঁকিয়ে কি রকম করে মাথায় তুললে?"

এই খেলাটি দেখে বিজয়কেতু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দর্শকদেরও কারো মুখে কথা নেই।

তারপর আর একটি কসরৎ দেখিয়ে খেলা শেষ হয়ে গেল। বাজীকর ঢ্যাঙা, কালো, মুখ ভরা খোঁচা খোঁচা গোঁফ, মাথার ময়লা কাপড়ের পাগড়ি, খালি গা, খালি পা, ঢোলের কাঠি

সমেত হাতখানা বার বার কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে দর্শকদের কাছে এসে দর্শনী চাইতে লাগলো। খেলোয়াড় ছেলেটিও এগিয়ে এল।

সে প্রথমেই এল বিজয়কেতুর কাছে। তার দিকে কালো নধর হাতখানি বাড়িয়ে বললে, "দেও খোকাবাবু।"

বিজয়কেতু পকেটে হাত দিয়ে দেখলে কিছুই নেই। সে লজ্জিত হয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। পিঁপড়ের গাঁথিতে এক ফোঁটা জল পড়লে যেমন পিঁপড়েগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে চারধারে ছড়িয়ে পড়ে, দর্শকেরাও তেম্নি চারধারে ছড়িয়ে পড়লো। কেউ কেউ কিছু দিলেও।

বিজয়কেতু বাড়ির দিকে চললো। তার চোখে ভাসতে লাগলো খেলাগুলো। আকাশ আবার অন্ধকার করে এসেছে। সজল বাতাসের একটা দমকা বয়ে গেল। বিজয়কেতু তবুও চললো তেম্নি ঢিমে তালে। কিছুদূর গিয়ে সে হঠাৎ দেখলে তার আগে আগে চলেছে বাজীকর ও সেই ছেলেটি। বাজীকর থেকে থেকে ঢোলে ঘা দিচ্ছে আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। বিজয়কেতু জোর পায়ে চলে তাদের কাছাকাছি পৌঁছেছে এমন সময় কোন রকম সতর্ক না করে নামলো বৃষ্টি, প্রথমে ঝিরি ঝিরি তারপর মোটা ফোঁটা।

আর পাঁচজনের সঙ্গেই বাজীকর ও ছেলেটি তাড়াতাড়ি গিয়ে একখানা বাড়ির সরু গাড়ি বারান্দার তলায় গিয়ে আশ্রয় নিলে। বিজয়কেতুও ছুট্‌তে ছুট্‌তে সেই বাড়িরই দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো এবং ভেতরে না ঢুকেই বাজীকরকে হাত নেড়ে বললে, "এই দাঁড়াও। খেলা দেখবো।"

লোকটি তার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো যেন তার কথা সে বুঝতে পারছেনা বা বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিজয়কেতু আবার বললে, "যেও না, আমি আসছি।" বলে সে এক ছুটে ভেতরে ঢুকে গেল।

বাড়িখানি তাদেরই। ভেতরে ছিল বেশ লম্বা-চওড়া খানিকটা ঢাকা দালান। দালানের গায়ে খান দুই ঘর—বৈঠকখানা ও পড়বার ঘর। বৃষ্টিটা বেশ জেঁকে এসেছে।

মিনিট কতক পরেই বিজয়কেতু আবার ছুট্‌তে ছুট্‌তে বেরিয়ে এসে বাজীকরকে বললে, "এই ভেতরে এস।"

—"কাহে ?"

—"খেলা দেখবো।"

লোকটি ক্ষুদে খেলোয়াড়টিকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

বাইরে যারা ছিল একটু পরেই তারা শুনতে পেল ভেতরে ঢোলের আওয়াজ হচ্ছে। তাদের মধ্যে যারা সাহসী ও অতি কৌতূহলী তারা গেল ভেতরে ঢুকে। দেখলে বারান্দায় একটি ছেলে খেলা দেখাচ্ছে।

তার খেলা দেখতে ওপর থেকে নেমে এসেছেন মেয়েরা, এসেছেন কর্ত্তা, এসেছে কয়েকটি শিশু আর এসেছে চাকর বাকর।

ছেলেটি যেন আরো কৌশল ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খেলছে। বিজয়কেতু বুকে হাত দুখানা আড়াআড়ি করে রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

মেয়েদের কে যেন একজন বলে উঠলেন, বিজুর চেয়ে ঢের ভালো খেলে।

কথাটি বিজয়কেতুর কানে গেল, কিন্তু সে বিচলিত হল না, তেম্নি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

একটু পরে খেলা হয়ে গেল। কর্ত্তা ছেলেটির প্রশংসা করে বাজীকরকে চার আনা পয়সা দিলেন। বড়লোক বাঙালিবাবু দেখে বললে, "আউর কুছ্ দিজিয়ে হুজুর।"

কর্ত্তা বললেন, "আর না।"

—"বাবু এতে দুজনের খোরাকী চলবে কি করে?"

—"অন্য জায়গায় যাও।"

—"এতনা বরসামে খেল্ ক্যেইসে হোগা?"

তারপর সে যা বললে, তার মর্ম্ম হচ্ছে তিনদিন বৃষ্টি হওয়ার ফলে তারা ঘর থেকে বার হতে পারে নি। পুঁজি যা ছিল তিন দিন বসে বসে খেয়েছে। বাঙলায় যে এত বর্ষা তা তাদের জানা ছিল না। তারা শুনেছিল "কলিকাতা ভারী শহর।" কিন্তু এখন দেখছে, এখানে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে। কারণ খেলা না দেখালে খাবে কি?

কর্ত্তা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের দেশ কোথায়?"

—"জব্বলপুর।"

—"ছেলেটা তোমার লেড়কা?"

—"না। আমার কেউ নেই। ও আমার বোনের ছেলে। বোন মরে গেলে ওর বাপ আবার বিয়ে করে। আমি ওকে তাই নিয়ে এসেছি।"

—"ওকে খেলা শিখিয়েছে কে?"

—"আমি।"

এমন সময় সকলে একটি দৃশ্যে হঠাৎ চমকে উঠলেন। দেখলেন বিজয়কেতু তার রুপোর পেয়ালাটা এনে ছেলেটির হাতে দিচ্ছে।

কর্ত্তা ও গিন্নী হাঁ-হাঁ করে এগিয়ে এলেন।

কর্ত্তা তাড়াতাড়ি পেয়ালাটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বিজয়কেতুকে ধমক দিলেন, "কি হচ্ছে?"

—"ওকে পুরস্কার দিচ্ছি আমার রুপোর পেয়ালাটা। ও আমার চেয়ে ভালো খেলা জানে।"

—"তোমার পেয়ালাটা নিয়ে ও কোথায় রাখবে? ওর ঘর বাড়ি আছে? এখনি গিয়ে বেচে দেবে। ওরা এর মর্ম্ম জানে?" বলে তিনি গিন্নীর হাতে পেয়ালাটা রেখে বাজীকরকে আরও চার আনা দিয়ে বললেন, "এই ভাগো হিঁয়াসে।"

বাজীকর পয়সাগুলো নিয়ে সদলে সরে পড়লো।

বিজয়কেতু তার আগেই গিয়ে ঢুকেছিল পড়বার ঘরে।

সেদিন থেকে সে পেয়ালাটার আর খোঁজও করে নি। এবং তারপর আরও কয়েকবার কয়েকটি খেলায় সে পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু তাতে তেমন আনন্দ প্রকাশ করে নি। আনন্দ প্রকাশ করতে গেলেই তার মনে হয়েছে, জনসাধারণের মধ্যে তার চেয়ে ভালো খেলোয়াড় হয়তো আছে ঢের। তাদের কেউ রুপোর পেয়ালা দেয় না। তারা পেটের দায়ে যৎসামান্য পেয়ে লোককে নগরে, গ্রামে আনন্দ দিয়ে বেড়ায়।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আমার দেশের মানুষ

বিনয়কে ছেড়ে দিল।

জেল ফটকের বাইরে আসতেই একদল ছেলে তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল, সাড়া তুললো—জয় হিন্দ্! বন্দে মাতরম্! ইন্‌কিলাব্ জিন্দাবাদ!

সম্বর্দ্ধনার আধিক্যে বিনয় সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো, হাত জোড় করে বললো—"আমি তোমাদেরই মত একজন। আমাকে নিয়ে এতো চেঁচামেচি করার কিছু নেই।"......

কাকাবাবু সঙ্গে এসেছিলেন, হেসে বললেন—"তুমি হয়তো তাই মনে করছ, কিন্তু এরা তো তা ভাবতে পারছে না। ন'বছর জেলে কাটানো তো আর সহজ কথা নয়!"

"ন'বছর কি বলছেন কাকাবাবু, বিশবছর-ধরে জেল খাটছে এমন লোকও আছে।"

—"তা থাক, তাঁরা তোমার চেয়েও বড় তা আমি মানি, কিন্তু তা বলে আমাদের কাছে তুমিও নেহাৎ ছোট নও"—

ছেলেরা মাথা নেড়ে বললো—ঠিক কথা, বল ভাই বন্দে মাতরম্!

অপরের প্রাপ্যটুকু আত্মসাৎ করছে বলে বিনয়ের মনে হয়, একান্ত অপরাধীর মত দৃষ্টি নাবিয়ে রাখে পথের উপর। কাকাবাবু হাত ধরে মোটরে তুলে নেন।

ন' বছর পরে বিনয় বাড়ী ফেরে।

বাড়ী সুদ্ধ সবাই ঘিরে দাঁড়ায় চারি পাশে।

মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে ধরা গলায় মা বললেন—"কি চেহারাই হয়েছে, একটা দিনও বোধ হয় পেট ভরে খেতে পাস্‌নি।"

—"বলছ কি মা! ওজন বেড়ে গেছে, সবাই বলে মোটা হয়ে গেছি।"

কাকিমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"পরের ছেলেকে সবাই এমনই দেখে বাবা, কই নিজের ছেলে এমনি খেটে আসুক দিকি ন' বছর।"

মা বললেন—"ন' বছর, চার মাস আঠারো দিন।"

—"চার মাস নয় মা, তিন মাস আঠারো দিন।"

—"তিন মাস? সেই ৯ই আশ্বিন আর আজ ২৭শে পৌষ!"—আঙুলের পারে ভালো করে

গুণে দেখে মা বললেন—"তা বটে, আমারই ভুল হয়েছে। ন' বছর ধরে দিনের পর দিন হিসাব রাখাও তো সহজ নয়।"

বিনয় হাসলো, বললো—"আমিও হিসাব রাখিনি মা, বেরুবার সময় ওদের মুখ থেকেই হিসাবটা শুনে নিলাম।"

মা বললেন—"এই ক'টা বছর, আমি একটা দিনও সুস্থির হতে পারিনি বিনু। যখনি শুনি জেলের মধ্যে কোন গোলমাল হয়েছে তখনই মনে হয়েছে তোর কথা। তুই যে আবার সুস্থ দেহে কোনদিন ফিরে আসবি, এ আমি ভাবতেই পারিনি।"

কাকিমা এক রেকাবী সন্দেশ এগিয়ে দিলেন বিনয়ের দিকে, বললেন—"নে বাবা, মুখে হাতে জল দিয়ে আগে কিছু খেয়ে নে"---

—"এযে একেবারে রাজভোগ দেখি কাকিমা। এদ্দিন খবরের কাগজে পড়েছি, দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ কোথাও খাবার নেই, কলকাতার পথে ঘাটে লোক না খেয়ে মরছে"……

—তুই আর বকিসনে বিনু, খা—

বিনয় হাসতে হাসতে রেকাবিটা টেনে নেয়।

ছোট ছোট খুড়তুতো ভাই বোনেরা এসে ঘিরে ধরলো চারিপাশে, বিস্ময় ভরা চোখে তারা তাকিয়ে থাকে বিনয়ের পানে। বড় বোন মিনতি বললে- "কিরে সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? বড়দাকে প্রণাম কর্"—

এগিয়ে এসে টিপ টিপ করে তারা মাথা ঠোকে। সবাইকে বিনয় চিনতে পারে না, মিনতি পরিচয় করিয়ে দেয়, "এদেরকে তুমি দেখে গেছ বড়দা, ওই রমেশ, সুরেশ, কল্যাণী…আর এই তিনজনকে তুমি দেখনি, ভুটু, টুটু, নুটু,…তুমি জেলে যাবার পরে এরা জন্মেছে"—

নটু ভালো করে ঠাহর করে করে বিনয়কে দেখে তারপর বললে—"দিদি যে বললে বড়দা ঠাকুর, ঠাকুর তো কখনও সন্দেশ খায় না।"

—"খালি পেসাদ দেয় না?"—বলে বিনয় হাসতে হাসতে তিনজনের হাতে তিনটি সন্দেশ তুলে দিল।

এতক্ষণে ভুটু টুটু নুটুর চোখে বিনয়দা সহজ হয়ে আসে। সন্দেশ চিবুতে চিবুতে ভুটু বললো—"বড়দা, তুমি নাকি ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতি করতে? সেই ঘোড়াটা কোথায় গেল?"

—"পক্ষীরাজ ঘোড়া কি না, উড়ে চলে গেছে নিজের দেশে।"

কল্যাণীর দুবছর বয়সে বিনয় ধরা পড়ে, সে যেন কতই জানে এমনিভাবে মাথা দুলিয়ে বললো—"একটা শাদা ধপ্‌ধপে দুধের মত ঘোড়া। সেই ঘোড়ায় চড়ে বড়দা নেতাজীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো।"

বিনয় এবার হেসে ফেললো, বললো—"শুধু ঘোড়া নয় রে ভাই, একটা শাদা এরোপ্লেনও ছিল, সেইটা চড়ে আমি একদিন চাঁদের দেশে পালিয়ে গেছলাম, তারপর সেখান থেকে পুলিশ আমায় ধরে আনলো"—

ঝুটু সব চেয়ে ছোট, সে চোখ, ছুটো আরো বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলো—"সত্যি ?"

বিনয় বললো—"ঠাকুর কখনও মিছে কথা বলে ?"

কল্যাণী জিজ্ঞেস করলো—"বড়দা, তুমি সেখানে পাথর ভাঙতে ? দড়ি পাকাতে ? ঘানি টানতে ?"

—"ছেনি আর হাতুড়ি তৈরী করতাম, দেশের লোকের পায়ে যে শেকল জড়ানো আছে, সেইগুলো কাটবার জন্য"...

হাসতে হাসতে বিনয় জেলের গল্প সুরু করলো, দীর্ঘ ন' বছর কারাবাসের কাহিনী কত মানুষের টুকরো টুকরো পরিচয় ; টুকরো টুকরো কাহিনী।

গল্পগুজব হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে ছুপুরটা কোথা দিয়ে কেটে যায়, বিকালের দিকে ছেলের দল এসে সাড়া তোলে—"বিনয়দা তৈরী হয়ে নাও, এখনি যেতে হবে"—

—আমি তো সব সময় তৈরী ভাই—আধময়লা পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে বিনয় বেরিয়ে পড়লো।

মিনতি বললো—"একি, বড়দা, জামা কাপড়টা বদলে নাও, ক্লাবে কতজন আসবে তোমাকে দেখতে"—

—"তারা আমাকে দেখতে আসবে, আমার জামা কাপড়কে তো আর দেখতে আসবে না,"—হাসতে হাসতে বিনয় এগুলো।

ক্লাবের হলঘরটায় তখন রীতিমত এক সভা বসে গেছে। পাড়ার ছেলেমেয়েদের ভীড়। বিনয় গিয়ে দাঁড়াতেই সবার গুঞ্জন থেমে গেল। সেক্রেটারী বিনয়কে এনে বসিয়ে দিল সভাপতির আসনের পাশেই সভার কাজ সুরু হোলো।

বিনয় এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই সম্পর্কে সম্পাদক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাকে স্বাগত জানালো, তারপর সুরু করলো অভিনন্দন পত্র পড়তে ঃ

"হে দেশ প্রেমিক, তুমি যে দীর্ঘদিন কারাবাসের পর আবার আমাদের মাঝে ফিরে এসেছ, সেজন্য আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করি। তোমার আদর্শ আমাদের মাঝে পরিব্যপ্ত হোক, তুমি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে অগ্রগামী কর, হে কর্ম্মবীর, ইহাই আমাদের কামনা।

হে ত্যাগী শ্রেষ্ঠ, তোমার নিষ্ঠা আমাদের মাঝে নব-প্রেরণার উদ্বোধন করুক। আজকের মত এই দেশব্যাপী ছুর্দ্দিনে তোমার সত্যদৃষ্টি আমাদের দিক-নির্দ্দেশ করুক। তোমাকে পুরোভাগে রেখে আমরা যেন নতুন জীবনের জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেতে পারি।

বিনয় আর সইতে পারে না, সভাপতিকে বললো—"এসব কি? কতকগুলো স্তবপাঠ করে শোনাবার জন্যই কি এরা আমাকে এখানে ডেকে এনেছে?"

সভাপতি হয়েছিলেন বিনয়েরই কাকাবাবু। এ অঞ্চলের কংগ্রেসের কমিটির সভাপতি হিসাবে এই ধরণের সভায় সভাপতিত্ব করার অধিকার তাঁরই একচেটিয়া। তাছাড়া ভিতরে ভিতরে এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি নিজেই। নিজেই ভাইপোকে পল্লীবাসীর সামনে বড় করে ধরতে পারলে কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তাঁর খানিকটা গৌরব বাড়ে। কাকাবাবু বললেন—"এইটী তোমাকে শুনিয়ে সমিতির এই এতোগুলো ছেলে যদি খুসি হয় তাহলে তোমার দিক থেকে আপত্তি করার মত কোন কারণ তো আমি খুঁজে পাই না। ন'টী বছর নির্ব্বিবাদে জেলে কাটিয়ে এলে, আর জানা চেনা এই মানুষগুলিকে খুসি করতে সামান্য ঘণ্টাখানেক সময় চুপ করে বসে থাকলে তোমার এমন কি ক্ষতি হবে বাপু?"

নেহাৎ বাজে যুক্তি নয়, বিনয় গুম হয়ে বসে থাকে, নিজেকে অন্যমনস্ক রাখার জন্য সে আর কিছু ভাব্‌বার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রত্যেকটি কথা তার কানে এসে বেঁধে।

অভিনন্দন পাঠের পরে পল্লীর কয়েক জন্য মাতব্বর কয়েকটি কথা বলেন, তারপর কাকাবাবু বললেন—"বিনয়, এবার তুমি কিছু বল?"

বিনয় উঠে দাঁড়ালো, বললে—"আপনারা আমাকে কতকগুলি চমৎকার কথা শোনালেন, দেশপ্রেমিক, কর্ম্মবীর, ত্যাগীশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাণ, ইত্যাদি। বেশ গালভরা শব্দ, ভারী মিষ্টি। কিন্তু একটা কথা আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, আমাকে এভাবে ডেকে নিয়ে এনে গালি দেবার অধিকার আপনাদেরকে কে দিল? একটা ফেল-করা ছেলেকে 'পড়াশুনায় ভালো' বলা মানে তাকে ব্যঙ্গ করা, একটা খোঁড়া ছেলেকে 'ভালো চলতে পারে' বললে বিদ্রূপের মত শোনায়। আমার চেয়ে কত শত শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী বর্ত্তমানে, আমাকে ত্যাগীশ্রেষ্ঠ, কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ বলার অর্থ আমাকে উপহাস করা ছাড়া আর কিছু নয়, আমাকে এইভাবে উপহাস করার অধিকার আপনারা কোথায় পেলেন? ত্যাগ, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম সম্পর্কে যে সব বড় বড় কথা আপনারা বললেন, সে সম্বন্ধে আপনাদের মনে যদি সত্যিকারের কোন ধারণা থাকতো, তাহলে আজ আপনাদের গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী আর সিল্ক টুইলের সার্ট থাকতো না, থাকতো মোটা খদ্দর। সামান্য খদ্দরটুকু পরার নিষ্ঠা যখন আপনাদের নেই, বড় বড় দেশপ্রেমের কথা বলার অধিকারও আপনাদের নেই। সেই জন্যই আপনাদের ওই অভিনন্দন আমার কাছে গালি গালাজের মত শোনালো। আমি ও জিনিস গ্রহণ করতে পারবো না। ওটা আপনাদের ক্লাবেই ঝুলিয়ে রাখবেন। নমস্কার!"

বিনয় আর কিছু শোনার অপেক্ষা করলো না, ছিট্‌কে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

এলোমেলো পথে পথে ঘুরে বেড়ালো অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার আব্‌ছা অন্ধকারে দীর্ঘ পিচ্‌ঢালা

মসৃণ পথের উপর খুসিমত ঘুরে চলাফেরা করা বহু দিন ঘটে ওঠে নি। চলতে ভালো লাগে। খুসিমত এপথ দিয়ে বেরুনো যায়। দু' সারি উঁচু উঁচু অট্টালিকা জেলখানার উঁচু পাঁচীলের মত দৃষ্টিকে পঙ্গু করে না, দু-একটা জানালা দিয়ে দু-এক টুকরো আলো, ছেলেমেয়ের টুকরো টুকরো চীৎকার, বৈচিত্র্য বহন করে আনে। দীর্ঘ দিনের মনের পরিবেশ বদলায়! বিনয় পথে চলে।

পথের বুকে পর পর আলোর সারি জ্বলে উঠলো। মসৃন পথ। বছর দুয়েক আগে লাখ লাখ লোক এই পথের উপর অনাহারে মৃত্যু বরণ করেছে, এস্ফালটাসের উপর তার কোন দাগ নেই। কদিন আগে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তি কামনায় ছেলের দল, বন্দুকের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছে, একটা জাতীয় বিক্ষোভ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহে যাচ্ছে, তার কোন বহিঃপ্রকাশ ধরা পড়ে না কোথাও। নির্ব্বিকার জলস্রোতের মত মানুষ। জলের যেখানে একটুকরো ঢিল পড়ে, একটা বিক্ষোভ জাগে, পরক্ষণেই পিছনের স্রোত সেই বিক্ষোভকে সমাহিত করে দেয়। জলের দাগ থাকে না। এই মানুষগুলোর মুখেও অন্নাভাব বস্ত্রাভাবের দাগ নেই। মার্জ্জিত ধোপ দোস্ত শাহরিক সভ্যতা এদের ঠেলে নিয়ে চলেছে। মানুষের স্রোত, এস্ফালটাসের বাঁধা খাতে প্রবাহমান। সিনেমার দরজায় অজস্র মানুষের ভীড়!

সহসা বিনয়ের কেমন যেন মনে হোলো, এই মানুষগুলোর সঙ্গে পথ চলতে তার ঘৃণা করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি সে বাড়ী ফিরে এলো।

মা বললেন—"কিরে? ক্লাবে কে কি বললো?"

—"যত মিথ্যে কথা, আগড়ম বাগড়ম। এর চেয়ে জেলে ঢের ভালো ছিলাম!"

—"কেন, কি হোলো বল্ত?"

—"ভাবতাম বাইরে কাজ এগুচ্ছে, কিন্তু বাইরে এসে যা দেখেছি, এখানে আর আমি একদিন থাকতে পারবো না, ওখানে গাঁয়ের চাষাদের মাঝে কিছু কিছু কাজ করার চেষ্টা করবো।"

—"সবে তো আজ বেরিয়েছিস, এখনি এতো তাড়াতাড়ি কি আছে, দুদিন একটু খেয়ে ঘুমিয়ে দেহটাকে ঠিক করে নে, কাজ তো করবিই সারা জীবন ধরে।"

—"কিন্তু কলকাতার মানুষগুলোকে দেখলেই, আমার কেমন যেন ঘেন্না করছে!"

—"সে তো হবেই, ন'বছর জেল খেটে আজ বেরিয়েছিস, গাঁয়ে গিয়ে কালই একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে জেলে যেতে না পারলে মনটা সুস্থ হতে পারছে না, না? এখন তোকে আমি কোথাও যেতে দোব না।"

বিনয় শ্রান্তভাবে একখানি চেয়ারে বসে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পড়তে সুরু করলো।

কাকা ফিরতেই মা বললেন—"আজকের মিটিংয়ে কি হোলো বলো তো? বিনয় তো ফিরে এসেই বলে—কলকাতা ছেড়ে চলে যাব"—

কাকা হাসলেন, বললেন—"ঠিক বলেছে আমি ওকে সমর্থন করি। কাজের সময় কাউকে দেখি না, যত সব কথার ঢেঁকি। মিটিংয়ে লেকচার দিয়ে দেশোদ্ধার করবে অথচ পরতে কষ্ট হয় বলে খদ্দরটা অবধি কারুর গায়ে নেই। হুঁঃ!"

—"ওতো বলে কাল সকালেই আমি দেশে চলে যাব।"

—"পাগল নাকি, ওকে কখনও আমি এখন ছেড়ে দিতে পারি। এখন ওকে এখানে আমার সঙ্গে কাজ করতে হবে, এদিককার কংগ্রেসী দলটাকে ভালো করে এবার সংগঠন করবো। যত বাজে লোক কংগ্রেসের নাম ভাঙিয়ে নিজেদের সুবিধা করে নিচ্ছে, তাদের সঙ্গে মুখোমুখি বুঝাপড়া করতে হলে বিনয়ের মত একজন বেপরোয়া ছেলের দরকার, ওকে কি এখন ছেড়ে দিতে পারি? হাতের কাজ শেষ না করে ও কোথায় যাবে?"

কথাটা বিনয়ের মন্দ লাগলো না। খবরের কাগজখানা রেখে দিয়ে সে কাকার সঙ্গে আলোচনা করতে বসলো,—সত্যই এই শহরের বুকে ভালোমত কাজ কিছু করা যায় কি না? এবং কিছু করতে হলে কি ভাবে করা যেতে পারে?

কাকা বললেন—"আমরা যা করতে চাইব তাই হবে, আমাদের মুখের উপর কথা বলার সাহস কারুর নেই। তবে কি জান, ভালো কর্ম্মীদের সারাক্ষণ এই কাজে লাগিয়ে রাখতে হলে, তাদের খাওয়া পরার খরচ বইতে হবে। এবং সেই টাকা জোগাড় করতে হলে চাঁদা তুলতে হবে।"

—"কিন্তু লোকে আমাদেরকে সে টাকা দেবে কেন?"

—"দেবে কি দেবে না, সে ভাবনা আমি ভাববো'খন, তবে টাকাটার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে।"

—"সত্যিকারের কাজ কিছু হলে, দায়িত্ব নিতে বাধা কি?"

কাকাবাবু তখনই বসে একটা আবেদন পত্রের খসড়া করে ফেললেন, বিনয় তার তিন চার খানা নকল করে দিল, কাকাবাবু সেগুলি নিয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন—পরদিন প্রায় সব ক'খানি খবরের কাগজে বিনয়ের পল্লী উন্নয়ন কাণ্ডের নাম বেরুলো। আর সেই টাকা থেকে কি কি সৎকাজ করা হবে তারও একটা ফিরিস্তি দেওয়া হোলো, শেষে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানানো হোলো অর্থ ও সহানুভূতি প্রার্থনা করে।

চাঁদা তোলা সুরু হোলো, সপ্তাহ দু'য়েকের ভিতরেই কাকাবাবু প্রায় হাজার চল্লিশ টাকা সংগ্রহ করলেন। এমন ভাবে টাকা উঠবে বিনয় কল্পনা করতে পারে নি। কাকা বললেন—"অন্য সময় হলে এমন হোত না, এখন যত সব মিলিটারী কনট্রাকটের টাকা, দুপাঁচশো দিতে লোকের কিছু বাধে না!"

বিনয় উৎসাহ পায়, বলে—"এইবার তাহলে রীতিমত কাজ সুরু করে দেওয়া যাক্

কাকা বললেন—"দাঁড়াও, আরো কিছু উঠুক!"

কিন্তু ঠিকমত কত টাকা যে উঠলো তার হিসাব একমাত্র কাকাবাবুর পকেটেই থাকে, বিনয় কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলেন—এবার একদিন খাতাপত্র নিয়ে বসে হিসাবটা ঠিক করে নিতে হবে!

কিন্তু আরো দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে খাতাপত্র নিয়ে বসার সময় কাকাবাবুর হয় না। ইতিমধ্যে বিনয় শুনতে পায় কাকাবাবু টালীগঞ্জের দিকে একটা বাগান কিনছেন। বিনয় একদিন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসলো—"আপনি একটা বাগান কিনছেন বলে শুনলাম, সে কি এই ফাণ্ডের টাকা থেকে?"

—"হ্যাঁ। উনিশ হাজার টাকা দাম পড়লো, দুবিঘে পাঁচ কাঠা জমি। সস্তাই হয়েছে বলতে হবে। ওখানে আমি একটা চরখা আশ্রম করবো বলে ঠিক করেছি।"

—"ফাণ্ডের টাকা খরচ করলেন, তা কমিটীকে কিছু জানালেন না?"

—"এতে আর জানবার কি আছে? উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া নিয়ে কথা, ওখানে যখন চরখা চলবে, তাঁত বসবে, তখন আর কারুর কিছু বলার থাকবে না।"

"নিজের নামে কিনেছেন তো?"

—"তাতে কি হয়েছে। বিশবছর ধরে কংগ্রেসের কাজ করছি, তবু দেশের লোক বিশ হাজার টাকা দিয়ে আমায় বিশ্বাস করতে পারবে না? যে সময়টা আমি এই কংগ্রেসের কাজে নষ্ট করি সেই সময়টা ব্যবসায় লাগালে লড়াইয়ের এই ক'বছরে আমি কি আরও বিশ হাজার রোজগার করতে পারতাম না?"

—"তা হয়তো পারতেন, তবে কি না এটা সাধারণের টাকা"···

—"সেজন্য তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না, টাকার হিসাব সব তো আমার কাছেই আছে···"

বিনয়ের আর কথা বলার প্রবৃত্তি হোলো না। এতদিন কাকাবাবু ফাণ্ডের কোন হিসাব দেন নি কেন তা আজ বিনয়ের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

কাকাবাবু বললেন—"দাঁড়াও না, তোমাদের একটা ব্যবস্থা আমি করে দোব।"

—"না না, আমাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না, কাকাবাবু আমাকে ছেড়ে দিন, সাধারণের টাকা আমি চুরি করতে পারবো না।"

—"চুরি করা মানে? আমরা চুরি করছি। তুমি যে ন'বছর জেল খেটে এলে, আমি যে সারাটা জীবন কংগ্রেস করলাম এর কোন মূল্য নেই? তোমার কাজের যদি কোন মূল্য থাকে, তাহলে তোমার বেঁচে থাকারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু তুমি কি বাঁচবে হাওয়া খেয়ে?

রেশনের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালে এক সের চাল তুমি এম্‌নি পাবে? এই যে বিধবার তুমি একমাত্র ছেলে, ন'বছর জেলে ছিলে, এই ন'বছর তোমার মায়ের খরচ পত্র চললো কি ক'রে তা দেশের লোক একবারও খবর নিয়েছে?...কি চুপ করে রইলে যে বলো? শুধু আদর্শ দিয়ে পেট ভরে না, তার সঙ্গে টাকার দরকার, আমি তাই ঠিক করেছি টাকা যা তুলবো তার অর্দ্ধেক আমার জন্য আর অর্দ্ধেক দেশের কাজের জন্য। ভবিষ্যতে না হলে খাব কি? দাঁড়াব কোথায়? দেশ দেশ করে সারা জীবন কাটিয়ে শেষ বয়সে কি উপোস করে মরবো?"

হঠাৎ কথামালার একটা কথা বিনয়ের মনে পড়ে, 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।' কাকার মুখের প্রতিটি রেখা অত্যন্ত কুটিল বলে মনে হয়। সে সেখান থেকে উঠে পড়লো। টাকার হয়তো খুবই প্রয়োজন আছে, যুদ্ধের চাহিদায় মানুষের চেয়ে টাকার মূল্য বেশী করে ধরার হয়তো চেষ্টা চলছে, তা বলে সত্যই কি আদর্শের চেয়ে টাকা বড় হবে! জেলের মধ্যে সে যে দীর্ঘ ন'বছর কাটিয়ে এলো, টাকা দিয়ে তার মূল্য না ধরলে তার নিষ্ঠাটুকু কি মিথ্যা হয়ে যাবে?

যত ভাবে ততই বিরক্ত হয়ে ওঠে, কাকার প্রতিষ্ঠিত ফাণ্ডের সম্পাদক হবার জন্য একটা অস্বস্তি জেগে ওঠে মনে। তাকে সামনে রেখে সাধারণের অর্থ কাকাবাবু আত্মসাৎ করবে, এ সে কিছুতেই সইতে পারবে না। একবার ভাবে মানুষগুলোকে সাবধান করে দিয়ে আসে, কিন্তু যারা টাকা দিয়েছে আর যারা দেবে তাদের কাউকেই তো সে চেনে না। কত টাকা উঠেছে তাও তার জানা নেই। বিনয় অস্থির হয়ে ওঠে ভোরের দিকে জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাড়ী থেকে।

তারপর দুদিন আর কোন খবর নেই। দুশ্চিন্তায় মা যখন প্রায় অন্নজল ত্যাগ করেছেন, এমন সময় একখানা চিঠি এলো। বিনয় লিখেছে—'কাকাবাবুর ফাণ্ডের সেক্রেটারীর পদ সে ছেড়ে দিল। অর্থের জন্য আদর্শকে সে ক্ষুন্ন করতে পারবে না, কলকাতার মানুষের কাছে আদর্শ যখন অর্থের চেয়ে বড় হবে, তখন আবার সে তাদের মাঝে ফিরে যাবে।'

কাকাবাবু শুনে হেসে উঠলেন, বললেন—"ও না থাকলে কি আর কাজ চলবে না? হুঁ!"

সন্ধ্যায় কংগ্রেসের অফিসে গিয়ে কাকাবাবু বললেন—"বিনয় গেছে কাছাকাছি একখানি গ্রাম ঠিক করতে যেখান থেকে আমাদের কাজ সুরু করতে হবে। এদিকে আরো টাকা চাই। কাজ একবার সুরু করে তো আর থামিয়ে রাখলে চলবে না। পুরো দমে সবাই টাকা তোলো হে!"

কর্মীরা সবাই মোটা মোটা টাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। টালিগঞ্জে নতুন-কেনা বাগানটার চারিপাশে ভালো করে পাঁচীল দিতে কত টাকা খরচ হবে কাকাবাবু মনে মনে তারই একটা খসড়া করেন!

ধীরেন্দ্রলাল ধর



তবু তারা এলো—সবাই এলো—তারা চললো এগিয়ে। প্রভাতের সূর্য তখন গাছের ফাঁকে—এক কণা রোদ ঝিলিক দিয়ে পড়েছে অগ্রগামীর মুখে। তারা চলেছে একসাথে সবাই—কোথায় চলেছে যেন। সূর্য উঠতে না উঠতে যে যেথায় ছিলো—একে একে চলে এলো—কোন এক অদৃশ্য আকর্ষণে—ভাববারো সময় পেলো না যাচ্ছে কোথায় তারা।

যাচ্ছে তারা সবাই এক সাথে—গায়ে গা লাগিয়ে—চোখে ঘুম নেই—পায়ে জড়তা নেই—সোজা যেদিকে দেখা যাচ্ছে বাতাসে উড়ছে তাদের নিশান—শত উৎসাহ শত উদ্দীপনায় চিরউজ্জ্বল—মনে মনে প্রণাম জানালো তারা ঐ নিশানকে—যে উড়ছে সবার আগে—সবার উর্ধ্বে।

তারা শুনলো কি যেন নেই—কি যেন তারা চেয়েছিলো—আর কি যেন তাদের নেই—। একজন—দুজন—তিনজন—সবাই। সবাই চেয়ে দেখলো কি যেন নেই—তারা ভাবলো সে কি তাদের ছিলো কোন দিন—যা নেই তা কি ছিলো—ছিলো কি? বুঝলো না—কিন্তু দেখলো যা নেই সে যে তাদেরই—তাদেরই নিজের—তাদের বড়ো আপনার—প্রাণের। তারা শুনলো যা নেই সে কেবল তাদেরই—তাই তারা ছুটলো জানতে—কোথায় তাদের আপনার জিনিষ—কোথায় তাদের বেদনা—যে নিদ্রায় ঘুমিয়েছিলো এতো কাল—ছাই চাপা আগুন কেবল অন্তরকে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছিলো—আর উঠছিলো শিরিশ ধোঁয়া। নিরেট পাথর—স্তব্ধ খাড়া পাহাড় ভুমিকম্পে খাক হয়ে ভেঙে গেলো—খান্ খান্ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো—আগুনের ঝিলিক্—ভুমিকম্প। তারা দেখলো বাতাসে যেন কে কথা কইছে—কে যেন চুপি চুপি সব বলে গেলো—তারা যা চেয়েছিলো তাই বলে গেলো। সবাই তখন বুঝলো রক্ষা নাই—পথ আছে, যেতে হবে। সংগে সংগে যে যেথায় ছিলো মাছির মতো কিলবিল করে চলে এলো—চোখে

চোখে কি যেন বলাবলি করলো—আবার চোখ নাবিয়ে নিলো—ভ্রূ ঈষৎ কুঁচকে গেলো—কপালের ভাঁজগুলি দৃঢ় হলো—ঘেমে মুখখানি উঠলো ভিজে—কান দুটি রাঙা হলো।

বাতাস গরম হতে লাগলো—কে যেন বেরিয়ে এলো ভিড়ের মধ্য থেকে—চুলগুলি রুক্ষ—রক্তিম চোখ মেলে চাইলো তাদের দিকে—কি যেন বলতে চাইলো—গলায় কর্কশ আওয়াজ বেরিয়ে এলো—ঘড়ঘড়ে গলা দিয়ে ভাঙা বেসুরা সুরের মতো বেরিয়ে এলো দুটি কথা—'আমাদের যেতে হবে।'

তারা সবাই সম্মতি জানালো—ঘাড় নাড়লো একে একে নীরবে, যেমনি করে ঝড়ের মুখে গাছগুলি মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় একটি একটি করে—তারা শুনলো তাদের চিরমৌন মনের কোথায় যেন বিক্ষোভের আগুন এতো কাল পরে রক্তিম হয়ে উঠেছে—যেন পশ্চিমে আগুন লেগেছে—তারা বিশ্বাস করতে পারলো না তারা কোথায়—তারা চলেছে না দাঁড়িয়ে পড়েছে—পাশে চেয়ে দেখলো সে আছে কিনা—যে ছিলো। তারা দেখলো পাশে পাশে চলেছে অসংখ্য জনতা তারাই। তারাই পিল পিল করে হেঁটে চলেছে—সবাই যেন হারানো সত্ত্বা—গতির সাথে তাল খেয়ে, অংগটাকে নিশ্ছিদ্র রেখে তারা চলেছে।

বাতাসের হু হু শব্দ—একটানা—আবার নীরব। রাস্তা দিয়ে তারা চললো—দুপাশে বিস্মিত দৃষ্টি আর উৎসাহিত চোখের জ্যোতি তাদের নতুন চেতনা জাগালো—তারা ক্রমে সংখ্যায় বেশি হয়ে পড়লো—তারা দেখলো—পেছনে এসেছে আরো—আরো অনেক—তাদের অচেনা···কিন্তু তারাও এসেছে···পেছনে···অনেক দূর পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ তারা শুনলো সামনে বাধা···বিশ্বাস হলো না···মনে হলো সব মিছে···এ সমুদ্রের কাছে সবই মিছে···উত্তাল ঘূর্ণিতে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে তারা···সব ভেঙে খান্ খান্ হয়ে পড়বে···তারা নড়ে চড়ে দাঁড়ালো···তারা শুনলো কে যেন কথা কইছে···কে যেন তাদের বলছে···'আর যাবার দরকার নেই···ফিরে যাও···তোমাদের তাগদ্ বোঝা গেছে···এবার ফিরে গিয়ে জীবনে বাঁচো···তোমার প্রাণের চেয়ে বড়ো আর কিছুই নেই···ফিরে যাও···সেই অমূল্য ধনকে রক্ষা করো।'

তারা বললো···'পাগল,···পাগলামির হবে জয়?'···কেউ বললো···'দুঃসাহস···গুঁড়িয়ে দাও মাথাটি···গুঁড়িয়ে দাও।' কিন্তু সে কে, কে বললো একথা? তারাই কি? তারা বললো··· 'যেতে হবে।' কে যেন এগিয়ে এলো···আবার সেই রুক্ষ চুল, রক্তিম চোখ···সে এলো তাদের কাছে···সে বললো 'বাঁচতে আমরা চাই মানুষের মতো সেই হচ্ছে সব চাইতে প্রিয় আপনার। তারই জন্যে যেতে হবে।'

'যেতে হবে'—তারা সবাই বললো—'যেতে হবে এগিয়ে।' মুহূর্তে তারা দেখলো—আকাশে

বিদ্যুৎ—আগুনের শিখা। তারা শুনলো মৃত্যুর ফেটেপড়া গম্ভীর আওয়াজ। বুকের ভেতর কোথায় যেন উত্তাল হ'য়ে নেচে উঠলো। রক্তিম ভয় রক্তিম মুখোস গুঁড়িয়ে দিয়ে তারা যাবে এগিয়ে। তারা জবাব দিলো—সবাই মিলে গিয়ে জবাব দিলো তারা—'প্রতিকার চাই।' তারা শুনলো মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়েছে তাদেরই আত্মীয় তাদেরই আপনার জন। সাহস করে তারা এগিয়ে গেলো। এগিয়ে গেলো যে যেভাবে পারলো—যেদিক থেকে আসছে মৃত্যু—সেইদিকে।

হঠাৎ কি যেন হলো—কি যেন বিপরীত বাতাস বয়ে গেলো। হুহু করে সবার কানে কানে। তারা পিছু ফিরলো—পেছনে চললো—সামনে নয় পেছনে, সব ভুল হয়ে গেলো।

তারা জানলো না কি হোলো—কোথায় যাচ্ছে তারা?

ক্ষীণ স্বর তারা শুনলে—গোঙানী মৃত্যুর ডাক—তারা ফিরতে পারলো না। কে যেন তাদের ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেললো—কে যেন তাদের পাগল করে দিলো। তারা পালালো একদিকে নয় দুদিকে নয় অনেক দিকে তারা ছুটলো। তারা কি চেয়েছিলো?

মৃত্যু তাদের জবাব দিলো। তারা ফিরে গেলো—ফিরে গেলো মৃত্যুর মুখ থেকে। যেখানে গেলো সেখানে আর পূর্বের জগত দেখলো না তারা দেখলো কে মাতাল যেন সব ওলটপালট করে সব ছিন্নভিন্ন করে মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে গেছে—শাল পাতার ঘরখানি তেমনি আছে, পাকা কুঠি তেম্‌নি দৃঢ়—সুমুখের রাস্তাও তেম্‌নি আছে—তেম্‌নি সব কিছু—কিন্তু মূল চেতনার দৃঢ় সূত্রটি গেছে ছিঁড়ে—পাকানো জটের মতো ঘোরালো—সে যেন বলছে কিছুই নেই, কিছুই থাকবে না যদি না। যদি না—কি সে? কি বলছে তাকে? সে শুনলো না, বুঝলো না—রুক্ষ জীবনের কোথায় যে সুরের ফাটল? সে চায় বাঁধতে। কেন—কেন গেলো না সে এগিয়ে? কেন মৃত্যুর ভয় তাকে উৎকণ্ঠিত করলো? জীবন কেন এতো প্রণয়ীর বেশে হাজির হোলো? কোথায় সে পালাবার ঠাঁই? কোথায় সে মৃত্যুর এপারের জীবনের জগত যেখানে সে ফিরে এলো? ফিরে এলো কোথায় সে? ভুল---সে ভুল বুঝলো—তারা বুঝলো ভুল---

আবার কে যেন কানে কানে বলে গেলো—কি যেন চুপি চুপি বলে গেলো---তারা বুঝতে পারলো সব—তারা মাথা নাড়লো, চোখে চোখে তারা বুঝলো—

প্রভাত এলো—আবার কুয়াসা ঘিরে নিশ্চল চাঞ্চল্য। হঠাৎ ফেটে বেরুলো সূর্য—পূর্বের দিনগুলি থেকে আরো স্বচ্ছ আরো জীবন্ত। তার ডাক আরো স্পষ্ট—সে উঠলো মৃত্যুর সমুদ্র থেকে নতুন জীবন নিয়ে, নতুন আলো নিয়ে।

তারা ঘিরে এলো—ঘিরে এলো আবার চারদিক থেকে—স্বপ্নের ঘোর তখনো ভাঙেনি। তখনো তারা দেখছে ঐ সূর্য যে উঠলো কেবল নিবিড় অন্ধকার থেকে—তার নিশ্চুপ ডাক

কান খাড়া করে শুনলো তারা। কে যেন বলছে, কে যেন ডাকছে তাদের—তারা বুঝলো সময় হয়েছে। তারা অভিনন্দন জানালো, এগিয়ে এলো।

তারা বললো 'তারা যাবে একেবারে শেষ সীমানা পর্যন্ত, থামবে না—একেবারে জীবনের দ্বার পর্যন্ত পৌছবে।' তারা চললো এগিয়ে—আবার সেই রক্তিম চোখ, আবার সেই বিশাল চলা—দৃঢ় ঠোঁটের কোনায় বিরক্তির স্পষ্টোক্তি। পাশে পাশে চলেছে অসংখ্য—তারা দেখলো অসংখ্য—তারা সবাই ছিলো। তারা দেখলো তার পাশে রয়েছে সে—চিনলো তাকে চোখে চোখে ।

তারা চললো এগিয়ে, রোদঝরানো পথ দিয়ে হেঁটে চললো একের পর এক লাইন ধরে—যেদিকে যাচ্ছিলো সেই দিকে তেমনি ভাবেই চললো। তারা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে জানিয়ে দিলো তাদের ঘোষণা। যেদিক দিয়ে গেলো সেইদিকেই শুনলো সবাই তাদের ঘোষণা—সবাই এলো ঘিরে—এলো তাদের কাছে—তাদের সাথে চললো তেমনিভাবে যেমনি ভাবে চলেছিলো ওরা—।

মুহূর্তে কি যেন হয়ে গেলো—বিরাট আলোড়নে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো—তারা সোজা হয়ে দাঁড়ালো, সবাই বুঝতে চেষ্টা করলো কি হোলো । কিসের আওয়াজ যেন ছড়িয়ে পড়লো—তারা আবার ঝুঁকে এলো হটবে না আর—এগিয়ে যাবে ঠিকই তাদের লক্ষ্যে। তবু তারা বুঝলো উপায় নেই, এগিয়ে গেলো—কি হলো যেন! ঝরা পাতার মতো ঝরে গেলো—আবার ছড়িয়ে পড়লো, ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। ফিরে গেলো কেন যেন।

আবার সেই রক্তিম চোখ—কে যেন ডাকলো—'যেতে হবে—ফিরবে না তারা'—আবার যেন কে বলে গেলো—বাতাসে আবার তাদের ঘোষণা শুনলো—চোখে চোখে সেই দৃষ্টি—সেই নীরব ভাষা—আবার ঘিরে এলো যে যেদিকে ছিলো, তেমনি করে গায়ে গায়ে ঘেঁসে দাঁড়ালো। আবার তারা দেখলো—তেমনি করে দেখলো—তেমনি নিবিড় করে—সামনে চেয়ে দেখলো বিপুল জনতা—আবার তারা এগিয়ে গেলো—।

কৃষ্ণপ্রসাদ

ট্রেনের একটি ঘটনা

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল বোম্বাইগামী বি এন আর মেলের একটি মধ্যম শ্রেণীর কামরায়।

কামরাটির চার ভাগের তিন ভাগ বেঞ্চী জুড়িয়া একদল ছাত্র-ছাত্রী চলিয়াছে, জেমসেদপুরে টাটার কারখানা দেখিতে, একটি বেঞ্চী দখল করিয়াছেন রায় সাহেব সেন, সস্ত্রীক বোম্বাই চলিয়াছেন,—প্রাক-পেন্সন ছুটি ভোগ করিতে, হাওয়া বদলাইতে। মেঝেয় বসিয়াছে কয়েকজন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। তৃতীয় শ্রেণীতে স্থানাভাব বশতঃ মধ্যম শ্রেণীতেই ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মেঝেয় বসিবার জায়গা যাহাদের হয় নাই তাহারা যে যেখানে পারিয়াছে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। দরজার হাতল ধরিয়া ফুটবোর্ডের উপর পা রাখিয়া চলিয়াছে আরো কয়েকজন।

মজিদ চলিয়াছে চাকরীর সন্ধানে জেমসেদপুরে। শুনিয়াছে সেখানে কাজের অভাব নাই। তাহার বয়সী ছেলেরা সেখানে পাঁচ সিকে দেড় টাকা রোজ কামায়। কলিকাতায় বিড়ি বাঁধার একঘেয়ে কাজে বিরক্তি ধরিয়াছিল তাহার। বিনা টিকিটেই চলিয়াছে।

বাঙ্কের উপর আধ-শোয়া অবস্থায় চলিয়াছে জীবন। ফর্সা রোগা রুগ্ন চেহারা। বয়স ১৫।১৬ হইবে। হাতে একটা মোটা ইংরেজী বই।

হাওড়া ষ্টেশন হইতে ট্রেন ছাড়িল যথা সময়েই। ভীড়ের চাপে কামরার মধ্যে যে গুমোটের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর হইল কয়েক ঝলক বাতাসে।

রায় সাহেব সেন দ্বিতীয় শ্রেণীরই টিকিট কাটিয়াছিলেন। কিন্তু ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলেন সব কটি দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কামরাই গোরা সৈন্যরা দখল করিয়া বসিয়াছে। এ তাঁহার এলেকা নয়। বুঝিলেন এখানে গরম হইলে কাজ হইবে না, নরম হইয়াই চেকার হইতে

গার্ড পর্য্যন্ত বার কয় ছুটাছুটি করিলেন। হাতের মুঠায় দশ টাকার নোটটি হাতের মুঠাতেই রহিয়া গেল। কোন ফল হইল না। নিতান্ত বিরক্তির সহিতই মধ্যম শ্রেণীর কামরাটিতে ঢুকিয়া পড়িলেন। তুইজনের শুইবার মত স্থান মিলিল না। একটি বেঞ্চে গৃহিণীকে শোয়াইয়া অপরটিতে নিজের জন্য বিছানা পাতিতে ছিলেন এমন সময় হুড়মুড় হুড়মুড় করিয়া ছাত্র-ছাত্রীর দল আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল কামরাটির মধ্যে।

রায় সাহেব সেনকে নিজে আর কষ্ট করিতে হইল না। ছাত্রদের একজন তাঁহার বিছানা গুটাইয়া রায় সাহেব গৃহিণী যে বেঞ্চে শুইয়া ছিলেন সেই বেঞ্চে রাখিয়া দিল। রাগে রায় সাহেবের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তিনি গৃহিণীর শিয়রে আসিয়া বসিলেন।' একটি মেয়ে রায় সাহেবের কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—'এঁর কি খুব অসুখ করেছে?'

প্রশ্নটা যাঁহার সম্বন্ধে তিনি মুদ্রিত চক্ষে পাশ ফিরিয়াছিলেন। রায় সাহেব এই ফাজিল মেয়েটির দিকে রক্তচক্ষু হানিয়া সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।' একটি ছাত্র ক্ষমা প্রার্থনার সুরে হাত জোড় করিয়া বলিল—"আপনার শোবার জায়গাটা জোর করে নিয়ে নিলাম কিছু মনে করবেন না স্যার। আমরা জেমসেদপুরে নেবে যাবো।"

রায় সাহেব সেই হইতেই জানলার বাহিরে মুখ করিয়া ছিলেন। ইচ্ছা হইল ছেলেটির গালে এক চড় কসাইয়া দেন কিন্তু সাহস হইল না। ট্রেন ছাড়িলে সোজা হইয়া বসিলেন।

মজিদ পকেট হাতড়াইয়া একটি বিড়ি বাহির করিল। নিজের হাতের তৈরী বিড়ি। বিড়ি বাঁধার কাজ জীবনে করিবে না আর। পার্শ্ববর্ত্তী ছাত্রটির নিকট হইতে দেশলাই চাহিয়া সে বিড়ি ধরাইল।

জীবন সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া সকলকে এতক্ষণ দেখিতেছিল।

ট্রেন ছাড়িতে হাতের মোটা বইটি খুলিয়া পড়িতে সুরু করিল।

ছাত্র ছাত্রীরা সোর গোলে কামরাটিকে মাৎ করিয়া রাখিয়াছিল এতক্ষণ। হঠাৎ যেন কেহ তাহাদের উপর যাতুদণ্ড বুলাইয়া দিয়াছে। প্রকৃতির প্রতি তাহাদের যে এতটা ভালোবাসা ছিল জানালার বাহির হইতে তাহাদের চোখ মুখ না দেখিলে আর বুঝিবার উপায় নাই।

খড়্গপুরে জন কয়েক যাত্রী নামিল ও সেই ফাঁকে একটি ভিখারী ছেলে কামরায় ঢুকিয়া পড়িল। ট্রেন ছাড়িলে কিছুক্ষণ পরে গলা খাঁকারী দিয়া সে গান জুড়িল। গান ঠিক নয়—সংস্কৃত শ্লোক টানিয়া টানিয়া আওড়াইতে লাগিল সে—

প্রলয়ো পয়োধি জলে
ধৃতবানসী বেদম্
কেশব ধৃত মীন শরীর

ছেলেটির গলা বেশ পরিষ্কার। শুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত শ্লোক। সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হইল তাহার প্রতি। হাড় বার করা বাঙ্গালী বাঙ্গালী চেহারা। কনুইয়ের পর আর ডান হাতটি নাই। কপালে ইঞ্চি পরিমাণ একটি ক্ষতের দাগ। গান শেষ করিয়া সে হাত পাতিল। ছাত্র ছাত্রীর দল এতক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া গান শুনিতে তন্ময় ছিল। তাহাদের কেহ কেহ ছেলেটিকে পয়সা দিল।

রায় সাহেব যেন তাঁহার মনিব্যাগ খুলিয়া ছেলেটির দিকে একটি সিকি ছুঁড়িয়া দিলেন। ছেলেটি সিকিটি কুড়াইল না, স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রায় সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিল। বিস্মিত রায় সাহেব মুখ ঘুরাইয়া লইলেন। ছেলেটির এই আচরণে অনেকেই বিস্ময় বোধ করিল। ছাত্রদের একজন মেঝে হইতে সিকিটি কুড়াইয়া দিতে গেল এমন সময় মজিদ হাত বাড়াইয়া তাহাকে বাধা দিল। "রাখো"—মজিদের কর্কশ কণ্ঠে আর কিছু বাহির হইল না। লোকটির ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিয়াছে ভিখারী ছেলেটি। মজিদের মন খুসিতে ভরিয়া উঠিতেছে। ইত্যবসরে ভিখারী ছেলেটি আর একটি গান ধরিল—

"একবার বিদায় দাওনা ঘুরে আসি
অভিরামের দীপান্তর মা,
খুদিরামের ফাঁসি।"

বেদনাভরা কণ্ঠে গানটি টানিয়া টানিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গাহিল। গান থামিলে সে হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখ মুছিল। ছাত্র ছাত্রীদের যাহার কাছে যাহা ছিল পয়সা, ডবল পয়সা, আনি দোয়ানী, উঠিয়া গিয়া ছেলেটির হাতে দিয়া আসিল। একটি মেয়ে হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ট্রেনের গতি অনেকটা মন্থর হইয়া আসিয়াছে। কামরাটির মধ্যে ইতেমধ্যেই যে থমথমে আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল মেয়েটির কান্নায় তাহা আরো গাঢ় হইল। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি তখন মেয়েটির দিকে। মজিদ একজন ছাত্রকে জিজ্ঞসা করিল, 'ও কাঁদছে কেন?' ছাত্রটি উত্তর দিল, 'বোধ হয় গান শুনে।'

"গান শুনে?" বিস্মিত মজিদ প্রশ্ন করিল।

ছাত্রটি বলিল, "হ্যাঁ। স্বদেশী গান শুনলেই ওর মনে কি জানি হয়। ও চোখের জল সামলাতে পারে না। ওর এক কাকার ফাঁসি হয়েছিল বোমার মামলায় আর এক দাদা আজ ১৫ বছর হোলো জেলে রয়েছে। তাদের কথা মনে পড়ে গেলে ও কি রকম হয়ে যায়।"

মেয়েটির প্রতি মজিদের সহানুভূতি জাগিল।

তাহার মনে পড়িল ছোট ভাইএর কথা।

গত কলিকাতা হাঙ্গামায় মিলিটারীর গুলিতে প্রাণ দিয়াছে সে। মজিদ কেমন যেন অন্য-মনস্ক হইয়া পড়িল।

ভিখারী ছেলেটি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল। কামরার হাওয়া কিছুটা হাল্কা হইলে পর সে গুন গুন করিয়া সুর ধরিল।

রায় সাহেব গৃহিনী পাশ ফিরিয়া এতক্ষণ গান শুনিতে ছিলেন, স্বামীকে শুনাইয়া চাপা গলায় মন্তব্য করিলেন, "ন্যাকা।"

গান শুনিয়া মেয়েটির ফুঁপাইয়া কান্নায় তিনি মনে মনে বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন।

গুন গুন সুর চড়িল। ছেলেটি গাহিতে সুরু করিল

"জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্য বিধাতা"

জীবন বাঙ্কের উপর আধশোয়া অবস্থায় ইংরাজী বইটিতে এতক্ষণ মুখ ঢাকিয়াছিল। চোখ ও কান খোলাই ছিল। 'জন-গণ-মন' কানে প্রবেশ করিতেই সে উপর হইতে চিৎকার করিয়া উঠিল 'থামো'।

ভিখারী ছেলেটি হঠাৎ থামিয়া গেল।

বাঙ্ক হইতে জীবন নামিল। সকলের দৃষ্টি তাহার দিকে।

রায় সাহেব সবিস্ময়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—মণ্টু.

রায় সাহেব গৃহিনী ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

"কই ? কোথায় ?"

মণ্টু ! জীবন রায় সাহেবের ডাকে সাড়াও দিলনা. ফিরিয়াও চাহিল না। হাত জোড় করিয়া সে সুরু করিল ঃ

"আমি গানে বাধা দিলাম, সে জন্য আপনাদের কাছে মাপ চাইছি। ইনি যে গান সুরু করেছিলেন সেটা বিশ্বকবি রচিত আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। প্রত্যেক জাতই তার জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান দেয় দাঁড়িয়ে উঠে। দেড়শ বছরের পরাধীনতা কি আমাদের এতটা নির্জীব করে দিয়েছে যে, আমরা উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান দেখাতে পারি না ? আমার অনুরোধ এ গান সুরু হোলে আপনারা সকলে উঠে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান দেখাবেন।"

জীবন একটু থামিল। তারপর ভিখারী ছেলেটির দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি এইবার সুরু করুন।"

খুসিতে ভিখারী ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে গলা চড়াইয়া সুরু করিল—

জন-গণ-মন-অধিনায়ক

জয় হে

ভারত ভাগ্য বিধাতা

সঙ্গে সঙ্গে সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল।

দাঁড়াইলেন না কেবল রায় সাহেব সেন ও তাঁহার গৃহিণী। তাঁহাদের মণ্টুর দিকে চাহিয়া থাকিতেও তাঁহাদের লজ্জা হইতেছিল। যাহারা বসিয়াছিল তাহারা দাঁড়াইয়া ওঠায় জীবন আড়াল পড়িল। উভয়েই সেই ফাঁকে জানলার বাহিরে মুখ ঘুরাইয়া বসিলেন।

ভিখারী ছেলেটি ইতিপূর্ব্বে 'জন-গণ-মন অধিনায়ক' গান বহুবার গাহিয়াছে। কিন্তু আজিকার মত প্রাণঢালা গান সে ইতিপূর্ব্বে গাহে নাই।

মেয়েটির চোখে আবার যেন কি পড়িয়াছে। সে রুমাল দিয়া চোখ রগড়ানো সুরু করিল।

গান শেষ হইতে না হইতে ট্রেনটি একটি ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

যাত্রীদের ওঠানামার ফাঁকে জীবন কখন নামিয়া পড়িয়াছে।

রায় সাহেব ও গৃহিণী বার কয় 'মণ্টু', 'মণ্টু' করিয়া ব্যাকুল ভাবে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায় মণ্টু?

ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছে ততক্ষণে।

ছাত্র ছাত্রীরা ভিখারী ছেলেটিকে ডাকিয়া নিজেদের মধ্যে বসাইল। মজিদ নিজের জায়গা ছাড়িয়া একটু আগাইয়া আসিল।

রায় সাহেব স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"দেখলে ছেলের কাণ্ড! আর আমি কি সত্যিই তোকে ধরিয়ে দেবো নাকি? সরকারের নুন খাই বলে কি আমার আত্মীয় পর জ্ঞানও নেই?" গৃহিণী কহিলেন "কি চেহারা হয়ে গেছে দেখেছো? স্বদেশী করে বলে কি এদের পেট ভরে খেতেও নেই নাকি?"

"আমার দিকে একবার তাকালো না পর্য্যন্ত!" রায় সাহেব অভিমানের সুরে কহিলেন "আমি তোর বাপ না হয় নই আমি তোর কাকা ত? রাগের মাথায় কোন দিন কি বলেছি আর অমনি বাড়ী ছেড়ে চলে গেলি? আচ্ছা আমি কি কোন দিন হাকিমী মেজাজ তোর ওপর দেখিয়েছি?" রায় সাহেব যেন চুপ করিলেন।

এদিকে ছাত্র ছাত্রীরা ভিখারী ছেলেটাকে ঘিরিয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। বাহিরের প্রাকৃতিক দৃশ্যে তাহাদের আর কোন আকর্ষণ নাই।

একটি ছেলে প্রশ্ন করিল—"তোমার হাত গেল কি করে?"

ভিখারীটি উত্তর দিলো—"মিলিটারীর গুলি খেয়ে।"

যে ছাত্রীটি গান শুনিয়া চোখের জল রুখিতে পারে নাই সে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "মিলিটারীর গুলি—কেন?"

ভিখারী ছেলেটি অসোয়াস্তী বোধ করিতেছে যেন। এতগুলি কৌতূহলী মুখ। বলিল, "সে অনেক ইতিহাস বাবু। আপনারা ত কাগজে পড়েছেন।"

ভিখারী ছেলেটির মুখে বাবু কথাটা ইহাদের কানে বিশ্রী লাগিল। একটি ছাত্র জিদ ধরিল—"বলই না।"

"মেদিনীপুরে আমার বাড়ী", ছেলেটি সুরু করিল, "গোরারা এসেছিল আমাদের গ্রাম লুট করতে।" ছেলেটি থামিল।

"তার পর।"

"আমাদের বাড়ী চড়াও করলো দশ বারটা গোরা।" ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, "সে সব কথা আর আপনারা নাই বা শুনলেন বাবু, চোখের সামনে কে আর পারে নিজের মা বোনকে বে-ইজ্জৎ হোতে দেখতে?" ছেলেটির চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল, "আমি ভিকিরী নই। আপনাদের মতই আমি স্কুলে পড়তাম। মা ছিল, বাপ ছিল, জায়গা, জমি ছিল। কিন্তু এখন আর কিছু নেই। খেটে খাবো যে হাতটাও গেছে। জেলে কয়েকটা স্বদেশী গান শিখেছিলাম, তাই গেয়ে চেয়ে-চিন্তে এখন চলে।" ছেলেটি চুপ করিল।

"জেলেও গিয়েছিলে নাকি?"

"হ্যাঁ, চুরি ডাকাতি করে না—ওঁর কৃপায়" বলিয়া সে রায় সাহেব সেনের দিকে ইঙ্গিত করিল।

রায় সাহেব সেন চিন্তিত মুখে শূন্যে চাহিয়া আছেন। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের এমন আয়াস ও আনন্দের নীড় ছাড়িয়া জীবন সরিয়া পড়িল কেন? পাগল আর কি? আর হয় ত ফিরবে না। কিংবা মতিগতি ভালো হইলে আসিতেও পারে।

ছেলে মেয়ের দল ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে রায় সাহেবের দিকে চাহিল।

—"উনি সে সময় আমাদের জেলায় ছোট হাকিম ছিলেন। আমাদের ফাঁসি দিতে পারেন নি সেইটেই ওঁর বড় আপশোষ ছিল। ওঁকে আমি ভুলবো না কোন দিন।"

ভিখারি ছেলেটী বলিল। "তাই বুঝি ওর পয়সা তুমি নিলে না?" একটি মেয়ে প্রশ্ন করিল।

ভিখারী ছেলেটী উত্তরে বলিল—'হ্যাঁ।'

একটী. ছেলে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ হাতড়াইয়া সে সিকিটী খুঁজিয়া বাহির করিল। তারপর সেটী হাতে লইয়া সে রায় সাহেব সেনের নিকট গিয়া বলিল—"আপনার পয়সা।"

অন্যমনস্ক রায় সাহেব হাত বাড়াইয়া সিকিটী লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্ত্রী থাবা মারিয়া সেটী তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া জানালার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। ছেলেটী ফিরিয়া আসিয়া আপন স্থানে বসিল। আর সঙ্গে সঙ্গে উঠিল হাসির হুল্লোড়।

যাত্রীদের অনেকেই অনেকক্ষণ ধরিয়া সমস্ত ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতেছিল, তাহারাও যোগ দিল হাসিতে। মজিদ হাত তালি দিয়া উঠিল।

ভিখারী ছেলেটি কিন্তু হাসিতে যোগ দিল না। স্থির দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল রায় সাহেবের দিকে। রায় সাহেবও কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তার পর মুখ ঘুরাইয়া বসিলেন।

ট্রেনের গতি মন্থর হইয়া আসিয়াছে। ভিখারী ছেলেটি এখানে নামিবে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মজিদ তাহাকে প্রশ্ন করিল—"তুমি এখানে নামবে নাকি?" "হাঁা" ভিখারী ছেলেটি উত্তর দিল।

মজিদ পকেট হাতড়াইয়া একটি দোয়ানী বাহির করিয়া ভিখারী ছেলেটির বাঁ হাতে গুঁজিয়া দিল। যে মেয়েটি রুমাল দিয়া চোখ মুছিতে ছিল সে আঁচলের গিঁট খুলিয়া একটী টাকা বাহির করিয়া দিল। অন্য ছাত্র ছাত্রীরাও কিছু কিছু পয়সা দিল। যাত্রীদের মধ্য হইতেও কেহ কেহ উঠিয়া আসিয়া পয়সা দিয়া গেল দ্বিতীয় বার।

ট্রেন থামিলে ভিখারী ছেলেটী তাড়াতাড়ি বাঁ হাত আর ডান কনুই এক করিয়া সকলের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া নামিয়া পড়িল।

রায় সাহেব গৃহিণী কর্ত্তাকে ঠেলা দিয়া বলিলেন, "যাওনা, নেমে গিয়ে দেখে এসো না আমাদের সেকেণ্ড ক্লাশটা খালি হয়েছে কি না?"

রায় সাহেব কোন সাড়া দিলেন না। ভিখারী ছেলেটীর মুখখানি ভাসিয়া উঠিল তাঁহার মনের পর্দ্দায়। কোথায় যেন দেখিয়াছেন ইহাকে। কোথায়?

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

বিনয় চট্টোপাধ্যায়

আরণ্যক

হয়তো এখানে ছিলো একদিন গভীর সমুদ্র।

সীমাহীন জলরাশি প্রভাতের সূর্য-কিরণে গলিত স্বর্ণাভ। প্রখর দুপুরে ওর ঊর্ধ্বমুখী তরংগগুলো জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো কেঁপে কেঁপে ওঠে। সূর্যাস্তের পটভূমিকায় ওই জল জীবন্ত সৃষ্টির রক্তপ্রবাহ। ধূসর গোধূলিতে কম্পনরত সবুজ জলে নীল আকাশের প্রতিবিম্ব এক অপূর্ব বর্ণ-সমন্বয়। তারপর অন্ধকার রাত্রির কালো ছায়া ওই অনন্ত জলরাশিকে সাজিয়ে তোলে ভয়াবহ রূপে। আর সেই প্রগাঢ় কালো রূপের অন্তরালে লুকানো থাকে সৃষ্টির রহস্য।

দুপুরের এই শান্ত সমাহিত সমুদ্র হয়তো চাঁদের আকর্ষণে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠতো কোনো কোনো তারাভরা রাত্রিতে। ধপ্‌ধপে জ্যোৎস্নার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তো জলোচ্ছ্বাস। কিন্তু সে জলোচ্ছ্বাসের স্বাক্ষর আজ কোথাও নেই এখানে।

ওই জলরাশির অতল তলায় ছিলো শক্ত মাটি। আর এই মৃত্তিকাগর্ভের অনেক অনেক নিম্নস্তরে টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটছে মাটীর বিদ্রোহী আত্মা। কতো পাথর আর মাটী, কতো জানা না জানা ধাতু, কতো বিষাক্ত বাষ্প, কী অপরিমেয় উত্তাপ তরল অগ্নির মতো টল্‌টল্‌ করছে; দংশনোদ্যত বিষাক্ত সাপের ফণার মতো ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। কঠিন মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে ওরা উঠতে চায় ওপরে। ওই অগাধ জলরাশির বুক চিরে দু' ফাঁক ক'রে দিয়ে ওরা উঠতে চায় আরো ঊর্ধ্বে। মহাশূন্যের বুকে এঁকে দিতে চায় অস্তিত্বের কঠিন স্বাক্ষর।

মাটীর অতল তলায় সেই যুগ যুগান্তরের জ্বলন্ত জাগরণ, সেই অশান্ত বিদ্রোহ আজও শান্ত হয় নি।

তথাপি সেদিন মাটীর বিদ্রোহী আত্মা কঠিন ও তরল, উষ্ণ ও শীত সমস্ত বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিলো এই এইখানে। দ্বিধাবিভক্ত জলরাশির ক্রমঅপসৃয়মান পথে গড়ে' উঠলো এই পর্বত, এই উপত্যকা, এই সমতলভূমি। সূর্য, মেঘ আর মাটীর অবদানে ক্রমে ক্রমে জন্ম নিলো তৃণ, লতা, বৃক্ষ। যাদুকরী প্রকৃতির শিল্পী হাত রচনা করলে এখানে গভীর অরণ্য।

অবশেষে এই অরণ্যে শব্দিত হলো পাখীর কাকলি-গানের মাঝে মাঝে বুনো শুয়োরের হিংস্র গর্জন। মাটীর বুকে অংকিত হ'লো কতো আরণ্যক্ জীবের পদচিহ্ন। অজস্র নখ আর দাঁতের আঘাতে কতো আঁচড় লাগলো ধরিত্রীর সর্বাংগে। এক জীব করলে অপরকে আক্রমণ। তৃণ-শ্যামল মাটীর বুকে লাল রক্তের দাগ ক্রমশঃ কালো হ'য়ে জমে উঠতে লাগলো।

আরও অনেক অনেক পরে একদল স্বাস্থ্যদৃপ্ত কৃষ্ণকায় মানুষ ওই পাহাড়ের আশে পাশে, ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বাঁধলে ঘর। সৃষ্টি হ'লো গৃহস্থের। বনফল আর বুনো পশুর মাংসে ওরা করে জীবন ধারণ। শিকারের সাফল্যে ওরা আনন্দে উপ্‌চে উঠে মাদল বাজায়, নাচে, গান করে। ওদের এ আনন্দ উৎসব অরণ্যের সত্তাকে সচকিত করে তোলে। শব্দের অনুরণনে বায়ুস্তর হয় চঞ্চল। দিবস ওদের কর্মময় আর রাত্রি উৎসব-বাসর।

পৃথিবীর আর এক প্রান্তে তখন একদল শ্বেত মানুষ সভ্যতা শয়তানের দূত, পরিকল্পনা ক'রে চলেছে বস্তু-বিনিময় আর বাণিজ্যের। বঞ্চনা আর শোষণের নীল ইস্পাত-ফলাটাকে ওরা ধারালো ক'রে তুলছে। ওদের কল্পনায় ক্রমশঃ ফুটে উঠছে এক স্বর্ণ-সিংহাসনের ছবি। যেখানে বসে ওরা উদ্ধত গর্বে শাসন করবে পৃথিবীর শান্ত অধিবাসীদের।

অতএব ছিট্‌কে পড়লো ওরা দেশে দেশান্তরে, বদমায়েস বুদ্ধির পাথেয় নিয়ে। তারপর যেখানে যেখানে ওরা পিলপে-গাড়ী করলে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের জীবনকে বঞ্চনা আর লাঞ্ছনায় জর্জরিত ক'রে গড়ে উঠলো ওদের শয়তানী অভিযানের অস্ত্র-শস্ত্র। এই অস্ত্র-শস্ত্রেরই একটী শাখা, এক রেলপথ আমার পূর্ব-বর্ণিত পার্বত্য-অঞ্চলের শান্ত সমাহিত জীবন যাত্রাকে কলুষিত ক'রে ছুটে যেতে চায় আরো শিকারের সন্ধানে।

এই রেল লাইন এঁকে বেঁকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাহাড়ের অন্তরালে কিছু দূর গিয়েই অকস্মাৎ ফুরিয়ে গেছে। লাইনের দু' ধারে ক্রমশঃ উচু হ'য়ে উঠেছে পাহাড়। কোথাও সমতল, কোথাও সোজা দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও ঢালু হ'য়ে নেমে গেছে কোন অতল খাদে। খাদের অপর পারেই আবার খাড়া হ'য়ে উঠে গেছে অনেক উর্ধ্বে। এর বহির্সজ্জা কোথাও নরম সবুজ ঘাসে ঢাকা; কোথাও ঘন বনের গাঢ় সবুজ প্রলেপ; কোথাও বা কালো পাথর চক্‌চক্ ক'রে নিজের কঠিন অস্তিত্ব প্রচার করছে।

এই উপত্যকার কিছু দূরে গিয়ে রেললাইনকে আরো বিস্তৃত করবার আয়োজন চলছে। বিজ্ঞান-বুদ্ধি-দৃপ্ত মানুষ, বাণিজ্য লোভী মানুষ, আধিপত্য আর শোষণ লোলুপ মানুষ সামনের ওই অটল পর্বতটাকে দেবে উড়িয়ে। ওই খাদের উপর ঝুলিয়ে দেবে ব্রিজ। চারিপাশের ওই গভীর বনকে করবে নিশ্চিহ্ন। আর এগিয়ে নিয়ে যাবে ওই রেল-লাইন সামনে···দূরে··· আরও···আরও দূরে······

পাথর কেটে চলেছে কুলির দল, অর্থাৎ এই পার্বত্য অঞ্চলের শান্ত অধিবাসীরা। শ্লীপার রেখে যাচ্ছে একের পর এক। লোহার ভারী লাইনগুলোকে টেনে এনে বসাচ্ছে সমান্তরাল রেখায়।

খটাখট্-খটাখট্, ঝন্-ঝন্, দুম্-দাম্ শব্দ আর শব্দ। অবিশ্রান্ত এই কঠিন শব্দ প্রান্তরের শান্ত নিথর পরিবেশকে কলুষিত করে চলেছে।

আর কে জানে, হয়তো সভ্যতার এলাকার বাইরে এই শান্ত, শ্যামল প্রকৃতির কোলে লালিত ওই কৃষ্ণকায়, স্বাস্থ্যহত নিরক্ষর মানুষগুলির অকলংক সাবলীল জীবন-যাত্রায়ও অলক্ষ্য হাতে কলংকের প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে নিপুন শিল্পীর মতো।

কুলিদের দলপতি লোটন সর্দারের একমাত্র শিশুপুত্র সেদিন রাত্রি শেষের নিস্তব্ধ অন্ধকারে নিস্পন্দ দেহ এলিয়ে দিলো মায়ের কোলে। অন্ধকারের বুক চিরে প্রতিধ্বনিত হলো সন্তান হারা জননীর মর্মছেঁড়া কান্না। আর পিতার পাথরের মতো শক্ত বলিষ্ঠ বুকখানা কয়েকবার কেঁপে কেঁপে উঠলো।

পরদিন লোটন সর্দার আর তার অনুগত অনেকে যথা সময়ে কাজে যোগ দিতে পারলো না। আর যারা কাজে এলো তাদেরো অনেকে অসময়ে এসেছে। কাজেও যেন আজ ওদের জীবন নেই।

অথচ এ এক রীতিমতো বিপর্যয়। বেছে বেছে এই দিনটীতেই কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে সাহেব কর্তৃপক্ষ এলো তদারকের কাজে। অজস্র বিশৃঙ্খলা আর ক্রুটী শাসকের জাত ইংরেজ মানবের চোখে কদর্য হয়ে ফুটে উঠলো। ধমকের ধাক্কায় আর প্রশ্নের আঘাতে জর্জরিত হ'য়ে উঠলো অন্যায্য দায়িত্ববানের দল। অশান্তির উত্তপ্ত হলকা প্রকৃতির প্রান্তরে এই কর্মক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে।

অবশেষে এলো সর্দার ও তার সহকর্মী অনুচরের দল। বর্ষার ঘন কালো একটা মেঘের চাপের মতো লোটনের থম্থমে অভিব্যক্তি।

বৈদ্যুতিক বেগে সর্দারের দিকে এগিয়ে গেলো ক্যাপ্টেইন্ টোয়াইনহ্যাম্। গর্জে উঠলো, 'হোয়াই সো লেইট? ইউ ড্যাম সোয়াইন, নিগার---'

হতচকিত সর্দার শুধু চোখ তুলে তাকালে। ওর অতল দৃষ্টিতে অসহায় বেদনার ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠলো।

—'গেট আউট্ ইউ সোয়াইন্, ইউ সন্ অফ এ বিচ।' অগ্নি উদ্গীরণ করলে টোয়াইন্হ্যাম্। শিক্ষা আর সভ্যতার প্রতিনিধি বুঝি বা ফেটেই পড়বে এখনি একটা আগ্নেয়গিরির মতো।

শান্ত পায়ে অসভ্য লোটন কর্ম-কেন্দ্রের দিকে পা বাড়ালে। খৃষ্ট-ভক্তের বাণী ও কিছুই হৃদয়ংগম করতে পারলো না। তথাপি স্বীকার করে নিলে ও নিজের ত্রুটী। সত্যিই কাজের টাইম আজ অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে।

এরও পরে কাজে যোগ দেয়ার ধৃষ্টতা ?

ক্যাপ্টেইন টোয়াইনহ্যামের উষ্ণ রক্ত স্রোত মাথার দিকে ছল্কে উঠলো। সবুট পায়ে ও মারলে এক জোরালো লাথি। লোটনের পায়ের সামনের হাড়টায় একটা শব্দ উঠেই ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটলো। হাঁটুটা চেপে ধরে করুণ ভংগীতে ও কুঁক্ড়ে বসে পড়লো মাটির ওপর।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে উঠে দাড়ালো সর্দার। দাঁড়ালো সটান হ'য়ে। এক ঝলক অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে শ্বেত মানুষের মুখের ওপর। শোষিত সমগ্র মানবের প্রতিনিধিত্ব করলো এই দৃষ্টি।

ক্যাপ্টেইন সচকিত হ'য়ে উঠলো। কোমরের বেল্টের বাঁ দিকে চামড়ার খাপে মোড়া আগ্নেয়াস্ত্রটাকে ওর ডান হাতখানা আপনাআপনিই স্পর্শ ক'রে ফেললে।

সর্দার আহত পায়ে বিকৃত ভংগীতে স্থানত্যাগ করলো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে অনেকক্ষণ। শীর্ণা চাঁদ পাহাড়ের শিখর ছাড়িয়ে অনেক উচুতে উঠে পড়েছে। আবছায়া জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট স্বপ্নের এক অদ্ভুত অব্যক্ততা। ঝিরঝিরে হাওয়ায় কাঁপছে গাছের পাতাগুলো। বনানীর মর্মর সংগীত হাওয়ার ঢেউএর মাথায় মাথায় পিছ্লে পিছ্লে পড়ছে।

লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে টোয়াইন্হ্যামের বসত্—বোগীখানা। দূরে কয়েকটা তাঁবুতে লোকজন ভীড় ক'রে আছে। ওদের এইখানেই থাকতে হয়। ওই পাশাপাশি কয়েকটা তাঁবুই ওদের অফিস এবং আবাস। আজ সমস্ত দিন ধ'রে প্রচুর কাজ গেছে। অজস্র কাজ কাল ভোর থেকেই শুরু হবে আবার। সুতরাং জরুরী বোধে আজ টোয়াইন্হ্যামকেও থেকে যেতে হ'লো। ফাঁকা আকাশের নীচে সবুজ ঘাসের নরম আস্তরণের ওপর একখানা ডেক্-চেয়ারে টোয়াইন্হ্যাম অর্ধ-শায়িত। পাশে টেব্লের ওপর শূন্য ও পূর্ণ কতকগুলো বীয়ারের বোতল। গেলাসটার গা

বেয়ে ফেণা গড়িয়ে পড়ছে। এ্যাশ্‌ট্রেতে রেখে দেয়া জ্বলন্ত সিগারেটের ধোঁয়া এলোমেলো হাওয়ায় পড়ছে ছড়িয়ে।

অকস্মাৎ শন্‌ শন্‌ শব্দে বায়ুস্তরের বুক চিরে উড়ে এলো এক মৃত্যুবাহী অস্ত্র। একটা খালি বোতলে লেগে তীরের ফলা গেলো ঘুরে। একের পর একটা বোতল প্রথমে পেরলে তারপর মাটিতে প'ড়ে গেলো। ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে রাত্রির নীরবতা ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেলো। লাফিয়ে উঠলো ক্যাপ্টেইন টোয়াইনহ্যাম। ওর নেশা বুঝি গেলো নষ্ট হ'য়ে।

—'হোয়াট্‌ এ হেল্‌ অফ ইট্‌।' চীৎকার ক'রে উঠলো ক্যাপ্টেইন্‌।

ওর কাঁধের নীচে ডান হাতটাকে ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে তীর খানা। সেখান থেকে উপ্‌চে পড়ছে রক্ত। ঠিক তেমনিই লাল রক্ত যেমন বেরিয়েছিলো কৃষ্ণকায় লোটনের দেহ থেকে।

টোয়াইনহ্যামের বোগী থেকে ছুটে এলো বয়, খানসামা, ক্লীনার। তারপর এসে জুটলো টেণ্টের যতো বাসিন্দারা।

নির্জন প্রান্তরের শান্ত রাত্রি উত্তেজনা, আলোচনা আর কোলাহলে হ'য়ে উঠলো মুখর। টোয়াইনহ্যামকে নিয়ে গিয়ে বোগীতে ওঠানো হ'লো। দেয়া হ'লো ফার্ষ্ট-এইড্‌। বশংবদের দল সাহেব ক্যাপ্টেইনের যা শুশ্রূষা করলে তা একমাত্র মুমূর্ষুরই প্রাপ্য।

দূরে, অনেক দূরে একটা মহুয়া গাছের আড়ালে জ্যোৎস্নার প্রহেলিকায় কেঁপে উঠলো এক ছায়ামূর্ত্তি। ধীরে ধীরে সে ছায়া দূরান্তরে মিলিয়ে গেলো।

•

সুতরাং লোটনের বিচার হবে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই কিছু। কিন্তু পরিস্থিতি বিচার ক'রে পরোক্ষ প্রমাণে ইংগিত পাওয়া যায় যে ওই দিনই টোয়াইনহ্যামকে তীর মেরে হত্যার প্রচেষ্টা লোটন সর্দার ছাড়া আর কারও নয়।

বিচার কক্ষে অনেক লোক। ইংরেজ ক্যাপ্টেইনকে হত্যার চেষ্টা করেছে এক কৃষ্ণকায় নগন্য গ্রাম্য সর্দার। টোয়াইনহ্যামের আঘাতটা বড়ো নয়। বড়ো শ্বেত মানুষের প্রভুত্ব আর প্রেস্টিজ। লোটনের ফাঁসি রদ্‌ করে কে? কেউ বললে। কেউ দণ্ড স্থির করলে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অবধি। কেউ কেউ বললে, ভারি তো জখম; ও দু এক বছর জেলই যথেষ্ট। আর অনেকে বললে, না, সর্দার বেকসুর। প্রমাণ তো কিছুই নেই। প্রত্যেকটি মানুষ গুঞ্জনমুখর। মামলার মতো মামলা বটে। আর একটিও মানুষের মতো স্থান বিচারকক্ষে নেই। ভেতরে ও বাইরে চতুর্দিকে জনতা জমাট বেঁধে গেছে। দেশী ও সাহেবী। সান্ত্রীর কড়া বন্দোবস্ত। সর্দারের অজস্র অনুগতদের জমায়েৎ ও উত্তেজনা এবং শ্বেতত্বের গর্ব ও তার অপমানের গ্লানি

সব মিলিয়ে সমগ্র আবহাওয়াটাকে রীতিমতো ভারী ক'রে তুলেছে। বিচারের সময় যতোই এগিয়ে আসতে লাগলো, উপস্থিত সকলের ব্যাকুল আগ্রহ ক্রমশঃ চঞ্চল পরিণতি লাভ করলো। ক্রমশঃ আবার থিতিয়ে এলো সমস্ত উত্তেজনা। এখনি বিচার সুরু হবে।

মাটিতে ছুঁচ পড়লে শব্দ শোনা যায়। এতো অজস্র মানুষের উত্তেজিত উপস্থিতিতে এমন নিশ্ছিদ্র নিশ্চুপতা যেন স্রেফ একটা ভোজবাজি। প্রত্যেকের মন সংশয়ের স্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

অপমানিত মানবাত্মার প্রতিমূর্তি ওই নির্ভীক নিরক্ষর কৃষ্ণকায় মানুষ। শৃংখলিত দুটি হাত সর্দারের। কিন্তু অপরাধের গ্লানি ওর কোথাও স্পর্শচিহ্ন এঁকে দিতে পারেনি। ওর অবিন্যস্ত চুলগুলো বার বার কপালের ওপর এসে পড়ছে। উদ্ধত মস্তকে দাঁড়িয়ে লোটন সর্দার। দাঁড়িয়ে আসামীর কাঠগড়ায়।

বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে লোটন শুধু রুক্ষ কণ্ঠে বললে, ও বেকসুর।

বিচারক প্রশ্ন করলেন ঃ যে সময়ে ক্যাপ্টেইন আহত হন্ সে সময়ে সেদিন তুমি অতো রাত্রেও বাড়ী ছিলে না। কিন্তু অন্য অন্য দিন তুমি ওই সময়ে বাড়ীতেই থাকো। তা ছাড়া সাক্ষী আছে, যে তোমায় ওই সময়ে মহুয়া-বনের দিকে যেতে দেখেছে। যে মহুয়া বনের দিক থেকে তীর এসেছিলো। তুমি সে সময়ে মহুয়া বনের দিকে গিয়েছিলে ?

—হেঁ, হুজুর !

—তাহ'লে মহুয়া-বনে গিয়েছিলে ?

লোটন কঠিন ভংগীতে মাথা নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

—সেখান থেকে যে তুমি তীর মারোনি, তার সাক্ষী আছে ?

—না, হুজুর। সেথাকে আর মানুষ ছিলো নাইক। আমি একাই ছিলেম।

—আচ্ছা, বেশ। তাহ'লে তুমিই তোমার সাক্ষী ! কেমন ?

—হেঁ হুজুর।

—বেশ তাহ'লে ধ'রে নাও তুমি বেকসুর। তুমি আসামী নও। তুমি সাক্ষী দেবে তাহ'লে ?

—নিশ্চয়।

— আচ্ছা ! তুমি তাহ'লে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবে কেন ? তুমি তো শুধু সাক্ষী। গিয়ে দাঁড়াও ওই সাক্ষীর কাঠগড়ায়। সত্য সাক্ষী দাও।

—আসামী যদি লয়, তো ইটিকে খুলে দে কেনে। শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দুটি লোটন বিচারক কে লক্ষ্য করে তুলে দেখালে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ! নিশ্চয়ই ! তুমি তো এখন আসামী নও। তুমি মাত্র সাক্ষী। সত্য সাক্ষী দেবে।

প্রহরীর দিকে ইংগিত করলেন বিচারক। লোটনকে শৃংখল মুক্ত করা হলো।

লোটনের মুখে চোখে অদ্ভুত একটা আভা ফুটে উঠলো। অভিব্যক্তিতে ভেসে উঠলো প্রসন্নতা। ওর বুকে অনুরণন উঠলো, ও আসামি নয়। ও বেকসুর। ও খালাস। ও শুধু সাক্ষী। সত্য সাক্ষী দেবে। ওর মনের অতলে যে ক্ষীণ শব্দে ঝংকৃত হচ্ছে, আমি আসামী নয়, আমি আসামী নয়—সেই শব্দ ক্রমশ জোরে, আরও জোরে বাজতে বাজতে অবশেষে ওর সমস্ত সত্তাকে ঝন্‌ঝনিয়ে তুললো। ও আসামী নয়, ও সাক্ষী। ও সত্য সাক্ষী দেবে। ও আসামী নয়।

ঝড়ের মতো গিয়ে উঠলো লোটন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। প্রথমেই চীৎকার করে বললে, আমি আসামী নয় হুজুর। ওর রক্তকণিকায় ছিটকে পড়লো ওই একই কথার প্রতিধ্বনি ঃ 'আমি আসামী নয়।' ওর আত্মা ঘোষণা করলে, ও আসামী নয়।

একবার সদ্য শৃংখল মুক্ত হাত দুটো লোটন তুলে ঘুরিয়ে দেখে নিলে। একবার দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলে ওই আসামীর কাঠগড়াটার দিকে। একবার কাঠগড়ার কাঠের মোটা রেলিঙের ওপর হাত বুলিয়ে নিলে। সাক্ষীর কাঠগড়ায় ও দাঁড়িয়ে। তারপর উত্তেজনায় প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে লেটান ব'লে উঠলো, 'আসামী আমি লয় হুজুর। আমি সাক্ষী। সত্যি সাক্ষীটি বলবো। কেউ ছিলো নাই কো মহুয়া বনে। আমি একাই ছিলেম। ওই সাহেব, হুজুর !---লোটন টোয়াইনহ্যামকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বিচারকের কাছে নিবেদন করলে-- সকালে আমাকে বেকসুর মেরে দিলে জুতোর ল্যাথি। রাগ সইতে পারলেম না হুজুর। রেতের বেলাকে দিলেম আমি তীর মেরে। উকে মারবার লেগে লয় হুজুর। শুধু ওর খুন দেখবার লেগে। বেকসুর উ আমার খুন লিইছিলো। সত্যি সাক্ষিটী কইলেম। আমি আসামী লয় হুজুর। কেউ ছিলো নাইক সেথাকে। দিলেম ওই খালভরাটাকে এক তীর মেরে। হুজুর আমি বেকসুর। সত্যি সাক্ষিটি কইলেম। আমি আসামী লয়।'

উত্তেজনায় হাঁপিয়ে উঠেছে লোটন। ওর চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। প্রশস্ত বুকখানা উঠছে কেঁপে কেঁপে। চীৎকার করে ও সর্বশেষে আবারো ঘোষণা করলে, আমি আসামী লয় হুজুর। আমি বেকসুর।

ওর অপমানিত ক্ষুব্ধ আত্মা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে, ও নির্দোষ, ও নিরপরাধ।

ঘরের প্রতিটি বায়ু স্তরে ওর কণ্ঠস্বর গম্‌গম্ করে প্রতিধ্বনিত হ'লো। ওর ঘোষণা উপস্থিত প্রত্যেকের বুকে গিয়ে মারলে ধাক্কা। অজস্র দর্শকরাও তখন উত্তেজনায় কাঁপছে।

বিচারকের মুখে গাম্ভীর্য ঘনতর হয়ে উঠলো।

ক্যাপ্টেইন টোয়াইনহ্যাম পা নাচিয়ে মেঝেতে একটা অদ্ভুত বুটের শব্দ তুলছে।

—ওখান থেকে নেমে এ দিকে এসো। কঠিন কণ্ঠে বিচারক আদেশ করলেন।

সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে পা নামানো মাত্রই বিচারকের ইংগিতে প্রহরী আবার লোটন সর্দারের হাতে বিদ্যুদ্গতিতে পরিয়ে দিলে শৃংখল।

—তুমি আসামী। গিয়ে দাঁড়াও ওই আসামীর কাঠগড়ায়। দৃঢ়তর ভংগীতে কর্কশ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন বিচারক।

—বিচারটি ভালো ক'রে করিস হুজুর। আমি আসামী লয়। গর্জে উঠলো কৃষ্ণকায় মানুষ। সর্বাংগে একটা অদ্ভুত ঝাঁকানি দিয়ে উঠলো ও।

সংগে সংগে দুজন প্রহরী দুদিক থেকে ওর হাত চেপে ধরলে।

দূরে বহুদূরে, মহুয়াবন পেরিয়ে, ওই উচু পাহাড়ের শেষ চুড়টারও ওপারে সূর্যের ওপর এসে পড়ল এক টুকরো কালো মেঘ। সংগে সংগে পৃথিবীর আলো এলো স্তিমিত হয়ে।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



জলে বাঘ

আফ্রিকা বা আমেরিকার জঙ্গলে বাঘ ও মানুষের লড়াইয়ের গল্প শুনতে আমরা অভ্যস্ত, আমাদেরই বাড়ীর পাশে সুন্দরবনের জঙ্গলে দিনের পর দিন বাঘে আর মানুষে যে কত লড়াই চলে সে ইতিহাসের কথা আমরা জানিনা। সুন্দরবনের চাষীর মুখে কতকগুলি সত্য ঘটনা শুনবার সুযোগ হয়েছিল। তারই একটা কাহিনী শোনাতে চাই।

তখন কদিন ধরে বৃষ্টি ঝম্ ঝম্ করে পড়ছিল। জ্যৈষ্ঠ মাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সুন্দরবনের আবাদে লাঙ্ল পড়তে এখনও বেশ কদিন দেরী আছে। একবার লাঙল হাতে করলে চাষীদের মাঠেই পড়ে থাকতে হবে। তার আগে মাসের হাট-বাজার করে রাখা চাই। ফটিক সেনার নতুন গিন্নি বলল, "যাওনা, যাহো'ক কিছু রোজগার করে নিয়ে এসো ?"

ফটিকও এই কথাই ভাবছিল। গিন্নির কথায় সে আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পরদিনই ওরা ছয়জনে দুই ডিঙ্গি নিয়ে "আল্লা আল্লা" বলে বেরিয়ে পড়ে। গোসাপ মেরে চামড়া বিক্রী করাই স্থির হয়েছে।

গত বছর অজন্মার ফলে পশর নদীর এধারে চাষীরদল গোসাপ আর রাখেনি। পশরের পূর্ব পাড়ে বাঘের বড় আড্ডা। কাজেই বাঘের আশ্রয়ে সেখানে এখনও কিছু গোসাপ বেঁচে আছে। ওদের ডিঙ্গি এগিয়ে সেই দিকে লক্ষ্য করে চলল।

ডিঙ্গিতে অস্ত্র বলতে কয়েক খানা কাটারি আর কয়েকটি বাঁশের লাঠি। ঐ অস্ত্র নিয়েই ওরা বনে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত।

একরাত চলবার পর ওরা পশর নদী পার হয়ে যায়। ফটিক সেনাই ওদের মাতব্বর। সে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—

"ঐ ছাখ্ ধনপতি-গাঙ্ দেখা যায়। ঐ গাঙ দিয়েই আমাদের আবার বনে ঢুকতে হবে।"

জায়গা মতো এসে ওরা ছদলে ভাগ হয়ে গোসাপের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। ফটিক সেনার চাচাতো ভাই আদাড়ে সেনা। সে কিছুতেই চাচার দলে যাইতে চায় না। অল্প বয়স, চাচার খরবদারি তার মোটেই ভাল লাগেনা।

গাঙের ডান পাড় ধরে ফটিক সেনার দল চলে আর বাঁ পাড়ে চলেছে আদাড়ে সেনার দল। সবাই চুপচাপ্। কথা বলবার জো নেই। সাড়া পেলেই গোসাপের দল ছুটে জলে পড়বে।

হঠাৎ ঝুপ্ঝাপ্ আর চটাপট্ শব্দ। ফটিক সেনারা একই যায়গায় তিনটি গোসাপ পেয়েছে। লাঠির বাড়িতে ওদের শেষ করেই ঝট্পট্ কোমর থেকে ছুরি বের করে চামড়া ছুলে ফেলে। ওদের উল্লাসের অন্ত নেই; কিন্তু তাই বলে মুখে কথা বলবার উপায় নেই।

ফটিক শুধু মনে মনে গিন্নির কথা আওড়ায়—"যাওনা, যাহোক কিছু রোজগার করে নিয়ে এসো।"

অবসর নেই; আনন্দে উৎসাহও বেড়েছে। কাঁচা চামড়া কাঁধে ফেলে ওরা আবার এগিয়ে চলে। বেলা গড়িয়ে এসেছে। এবার ওদের ফিরবার সময়। সামনে একটা 'শিয়ে' গাছের শিষের মত সরু খাল। সুযোগ পেয়ে ওরা শিষের মাঝ দিয়ে হাঁটু জলে এগিয়ে চলে। মাঝখানে ফটিক, কয়েক হাত সামনে সুরমান আর কয়েক হাত পেছনে মোমিন।

সুরমান—"চাচা, কিসের যেন গন্ধ আসছে!"

ফটিক—"ভীতুকে নিয়ে আচ্ছা মুস্কিলে পড়েছি! নাকে আঙুল দিয়ে চল্।"

সুরমান ফটিকের চোখ এড়িয়ে একবার বুকে হাত দিয়ে দেখে—সত্যই সে ভয় পেল কিনা।

বেলা যত গড়িয়ে যায় বনের নিস্তব্ধতা যেন তত থম্থমে হয়ে উঠ্ছে। সামান্য একটা পাতার শব্দে যেন ওদের বুকটা কেঁপে ওঠে। সামনে শিষের উপরেই নারকেল গাছের পাতার মত দেখতে এক ঝাড় গোলপাতা নুয়ে পড়েছে। সুরমান মাথা নীচু করে অতি সাবধানে পাতা সরিয়ে চলেছে। একটি, ছটি, তিনটি পাতা সবে ছাড়িয়ে সে মাথা উঁচু করেছে।—

বজ্র হুঙ্কারে সারা বনটা কেঁপে ওঠে। গাঁ, গাঁ, গাঁ—বাঘ ফটিক সেনাকেই লক্ষ্য করে লাফ মারে। হাঁটু জল, তার নীচে আবার সুন্দর বনের নরম কাদা। বাঘের চাপে ফটিক কাদায় ডুবে যায় আর বাঘও কাদায় ডুবতে থাকে। বাঘ ও ফটিক মুখোমুখি। মৃত্যুর

সামনে ফটিক মরিয়া হয়ে ওঠে। সরে পড়বার বদলে সে বাঘের গলা দুহাতে জাপ্‌টে ধরে এক পাশে কাৎ করে তাকে জলের মাঝে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে ওঠে, "কই তোরা শীগ্‌গীর আয়! আয়!"

কারও সাড়া নেই। বাঘ যখন লাফিয়ে পড়ে তখন তার ল্যাজের বাড়িতে সুরমান সেই যে কাৎ হয়ে জলে পড়ে ছিল, সেই ভাবে সে পড়েই আছে। মোমিন ওদিকে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

বাঘ ফটিকের বেয়াড়া সাহসে মুহূর্ত্তের জন্য থম্‌কে গিয়েছিল কিন্তু ফটিকের আর্ত্তনাদ শুনে সে মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার দুর্জয় হিংসায় দুপায়ে দাঁড়িয়ে ফটিকের ঘাড়ে কামড় বসিয়ে দেয়। বিড়ালের ছানার মত ফটিক এবার বাঘের মুখে নুয়ে পড়ল। গোসাপের চামড়া তখনও তার কাঁধে ঝুলছিল কিন্তু এবার তা খালের জলে ঝপ্‌ করে পড়ে যায়। বাঘ একবার মোমিন ও আরেকবার সুরমানের দিকে তাকিয়ে চাপা গোঁ গোঁ শব্দে ফটিককে নিয়ে বনের মাঝে মিলিয়ে যায়।

দেখতে দেখতে আদাড়ে সেনার দলটী বাঘের হাঁক ডাক শুনে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির।

আদাড়ে—"চাচা! চাচা কই?"

কেউ কথা বলে না। আদাড়ে ছুটে গিয়ে মোমিনকে এক চড় মারে। চড় খেয়ে মোমিনের জ্ঞান ফিরে আসে কিন্তু কিছুই সে বলতে পারেনা। সুরমান কোন মতে বলে—"ঐ পথে নিয়ে গেছে"।

আদাড়ে সেনা তার চাচাকে ফিরিয়ে আনবেই। রক্তের দাগ ধরে ওরা খুঁজতে গিয়েছিল। বাঘকেও পেয়েছিল। কিন্তু অর্দ্ধভুক্ত শিকারের সামনে বসা বাঘের সে হিংস্র মূর্ত্তি দেখে ওরা ফিরে আসে।

ওরা নৌকায় এসে রাতের রান্না করতে থাকে এমন সময় সুরমান আবার বলে ওঠে—"কিসের যেন গন্ধ আসছে!" সবাই কান খাড়া করে শুকনো ডালের শব্দ শুনতে থাকে। সুরমানকে তাড়া দেবার এবার কেউ নেই! তখনই সবাই ডিঙ্গি ছেড়ে দিয়ে বাড়ী রওনা হ'ল।

ফটিক সেনার কাঁধের সেই গোসাপের চামড়া খুঁজে নিয়ে আসতে আদাড়ে সেনা ভোলেনি। সেই চামড়া শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, শেষে পোকায় কেটে ঝাঁঝরা করে দিল—তবুও ফটিকের নতুন গিন্নি সেই চামড়া আজও কাউকে বিক্রী করতে দিলনা।

শিবশঙ্কর মিত্র



আমার বাড়ী

জ্যাঠামশাইর সঙ্গে তার বাবার কিই যে হল নীলমাধব কিছুই বুঝতে পারল না। সারাদিন বাড়িতে একটা থমথমে ভাব, মা বোধ হয় চোখের জল মুছল—ঠিক বুঝতে পারল না সে। রতন, পটলা, শিউলী কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না, বোধ হয় জ্যাঠাইমা বারণ করে দিয়েছেন। আর জ্যাঠামশাইর সে কি মেজাজ! সারাদিন বকছেন একে ওকে। কাচের গ্লাসে ময়লা ছিল, উঠোনে ছুঁড়ে মারলেন, গ্লাসটা চুরমার হয়ে গেল, চাকরটার মাইনে কাটা গেল ছু'দিনের। মা-ই রান্না করত, মার বদলে সেদিন বিকেলে জ্যাঠাইমা গিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরে। রাত্রে সবাই খেয়ে গেল, নীলমাধবের ডাক পড়ল না। ক্ষিধেয় তার পেটের মধ্যে চোঁ-চোঁ করছে, ঘুমও আসছে না যে ঘুমিয়ে পড়বে। এক সময়ে ঘুমিয়ে সে পড়লই। মা যখন তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে খেতে নিয়ে গেল রান্নাঘরে তখন অনেক রাত, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, সারা বাড়িটা নিঝুম।

'কি দিয়ে খাব মা? তরকারি কোথায়?' নীলমাধব প্রশ্ন করল।

'জল দিয়ে মেখে নুন দিয়ে খা কোন রকমে,' মা সুরমা বলল, 'তরকারী ফুরিয়ে গেছে।'

'না, আমি খাবনা, যাও।' নীলমাধব রাগ করল। 'খেয়ে নে, রাগ করে না খাবার সময়' বলল সুরমা, 'রোজ কি তরকারী থাকে।'

'নুন দিয়ে কি খাওয়া যায় নাকি?' বলল নীলমাধব।

'না খাওয়া যায় না!' সুরমা এবার রাগ করল, 'নবাব পুত্তুর না? বাপ যার এক পয়সা রোজগার করতে পারে না তার আবার অতশত বায়না কেন? খাবি ত খা, না হলে দূর হয়ে যা।'

দূর হয়ে যেতে কিন্তু নীলমাধব পারল না। ভাতে জল ঢেলে দিয়ে তাতে এক খাবলা নুন মেখে নিল, 'একটা কাঁচা লংকা দাওনা মা।'

'কাঁচা লংকা নেই।' বলল সুরমা।

নুন দিয়েই খেয়ে নিল সে; জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ভাত কৈ মা? তুমি খাবে না।'

'আমার জ্বর হয়েছে।' উত্তর দিল সুরমা।

'জ্বর হয়েছে না আরও কিছু!'

'হ্যা রে সত্যি বলছি! তাড়াতাড়ি খেয়ে নে অনেক রাত হয়ে গেল।'

নীলমাধব মা-র কথা বিশ্বাস করবার ভান করল, কিন্তু সে জানে জ্বরের কথা সত্যি নয়, আসলে হাঁড়িতে ভাত নেই।

অনেক কষ্টে ভাতগুলো খেল সে, তরকারির অভাবে নয়, মা-র জন্যে আর ভাত নেই বলে।

আঁচাতে গেল সে। সুরমাও বাতি নিবিয়ে রান্না-ঘরের শিকল তুলে দিল।

•

বাবা আজ তিন দিন বাড়ি আসেনি। অথচ—নীলমাধব আশ্চর্য হয়ে গেল কেউ তার বাবার খোঁজ করছেনা; জ্যাঠামশাই পর্যন্ত কিছু বলেন না। এই ত সেবার পাশের বাড়ির চাকর কালীচরণ গাড়ি-চাপা পড়ে হাসপাতালে মারা গেল, চার দিন পরে বাড়ির লোক খোঁজ পেয়েছিল। বাবা গাড়ি-চাপা পড়েছে—এ-কথা ভাবতেই নীলমাধবের কান্না আসে। ফাঁক পেলেই এক ছুটে সে বড় রাস্তার ধারে চায়ের দোকানটার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। রাস্তায় হাজার হাজার লোক যাতায়াত করে, বাবাকে সে দেখতে পায় না। এই দোকানেই অনেকদিন আগে সে বাবার সঙ্গে চপ খেয়েছিল, কি চমৎকার যে খেতে! স্বোয়াদটা যেন জিভের ডগায় এখনও লেগে আছে। উঁকি মেরে সে দেখল দোকানের মধ্যে, একটা লোক চামচ দিয়ে চপ কাটছে।

'এই ছোড়া ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে র‍্যা?' চায়ের দোকানের একটা লোক দরজার পাশ থেকে তাকে জিজ্ঞেশ করল।

'দেখছি।' নীলমাধব উত্তর দিল।

'কি দেখছিস?' আবার প্রশ্ন হল।

'রাস্তার লোক।'

'রাস্তার লোক।' লোকটা মুখ ভ্যাংচাল তাকে 'দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা!' তেড়ে এল লোকটা।

নীলমাধব হাওয়া।

'মা, বাবা বাড়ি আসছে না কেন?' নীলমাধব মা-কে জিজ্ঞেস করল।

'যা এখান থেকে, কোথায় গেছে আমি তার কি জানি।' সুরমা তাকে ধমক দিল।

'বলনা মা।'

'গেলি এখান থেকে?'

সন্ধ্যার পর বাবা এল। চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। জামা কাপড় ময়লা। মা-র সঙ্গে কিই যে ফিসফাস কথা হল নীলমাধব কিছুই শুনতে পেল না।

পরদিন শেষ রাত্রে মা তাকে জাগিয়ে দিল ঘুম থেকে। মাটীতে ট্রাংকের ওপর বিছানা বাঁধা। রাস্তায় রিক্সা দাঁড়িয়েছিল, তারা যখন উঠে বসল — তখনও রাস্তার গ্যাস লাইট নেভায়নি।

রিকসা চলতে আরম্ভ করেছে, বাবার কোলে বসে নীলমাধব মা-কে জিজ্ঞেস করল, 'মা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'সেই যে—মামার বাড়ী—মনে আছে?' সুরমা বলল, 'পাল্কী করে গিয়েছিলি? দু'ধারে ধান ক্ষেত আর বাঁশঝাড়।'

'নৌকোয় চড়ে যেতে হয় নদীতে?' নীলমাধব জিজ্ঞেস করল। সেই কত দিন আগে মা-র সঙ্গে গিয়েছিল মামার বাড়ী। মা তৈরী করে দিয়েছিলেন কাগজের নৌকো, সে ভাসিয়ে দিয়েছিল জলে—আজও তার মনে আছে। আবার কতদিন পরে নদীতে ভেসে ভেসে পাল-তোলা নৌকো দেখতে দেখতে সে যাচ্ছে মামার বাড়ী! রাত্রে খাবার পর দিদিমার কোলের কাছে বসে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে বাগানে পেয়ারা পাড়তে যাওয়া। গোরা, নিতু, মাধু আর আন্নু। গোরাটা কি পাজি গাছের আগ-ডালে বসে আন্নুকে বলত—'কোঁচড় পাত, পেয়ারা ফেলে দিচ্ছি।' আন্নুটা তার ফ্রক দিয়ে কোঁচর তৈরী করে ওপর দিকে তাকিয়ে থাকত! গোরা তার মাথা টিপ করে ছুঁড়ে মারত পেয়ারা, বেচারা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকত মাটিতে। ভাবতে ভাবতে নীলু হেসে ফেলল। অন্নপূর্ণা মেয়েটা কি বোকা!

'কি রে হাসছিস কেন পাগলের মত?' সুরমা জিজ্ঞেস করল।

'মা আন্নু কত বড় হয়েছে?' নীলমাধব তাকাল মার মুখের দিকে।

'দাঁড়া দেখি! তোর চেয়ে এক বছরের ছোট, তা হলে হোল এগারো।'

'মা, ওরা আমাকে চিনতে পারবে?'

'কারা?'

'গোরা, নিতু, আন্নু!'

'শোন ছেলের কথা! ভাই ভাইকে চিনতে পারবে না?'

মনে মনে কোলকাতার গল্প তৈরী করতে লাগল নীলমাধব। তাক লাগিয়ে দেবে ওদের।

শিয়ালদা ষ্টেসনের সামনে রিকসা থামল, নেমে পড়ল ওরা।

কয়েকটা কুলি দৌড়ে এসে ট্রাঙ্ক আর বিছানাটা ঝাপটে ধরল। নীলমাধবের বাবা ধমক দিলেন, 'যাও হটো! হাম লে যায়গা।'

ট্রেণ যখন ছাড়ল তখন ভোর হয়ে গেছে।

সারাটা পথ নীলু নড়ল না জানলার কাছ থেকে। মাঠের পর মাঠ ছুটে যাচ্ছে ট্রেনের সঙ্গে। দূরে একটা ছোট পাহাড় যেন তাদের রেলগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে, নীলমাধব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কখন—এক সময়ে জানলার ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন বিকেলের আর দেরি নেই, ট্রেণটা দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফরমে। কুলি যাত্রির সঙ্গে চারিদিক মুখর। নীলমাধবের মনে হল সে তখনও স্বপ্ন দেখছে। ট্রেণের জানলা থেকে দেখা যায় বিরাট নদীটা দূরে মাঠের প্রান্তে আকাশের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

গরম বালির ওপর পা পুড়ে যায়, নীলমাধব লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে, পেছনে তার মা আর বাবা। অসংখ্য নৌকা বাঁধা ঘাটে। মাঝিরা ডাকাডাকি করছে যাত্রিদের।

নৌকায় উঠেই নীলমাধব বলল, 'মা আমি বাইরে বসব।'

'এখন না, আগে সরু খালে গিয়ে পড়ুক নৌকা', সুরমা বলল, 'তারপর এখানে পড়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা তোকে, কুমীরে খেয়ে ফেলবে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নীলমাধব জিজ্ঞেস করল, 'কুমীরে খেয়ে ফেললে তুমি কি করবে মা?'

'আমি বসে বসে কাঁদব।'

'তারপর কি করবে?'

'তারপর আমিও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব—যেন আমাকেও কুমীরে টেনে নিয়ে যায়।'

নীলু হাসল, আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাবা কি করবে?'

'বাবা ফিরে যাবে কোলকাতায়।'

'বাবা জলে ঝাঁপ দেবেনা?' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল নীলমাধব।

'না।'

'কেন?'

'বাবা যে পুরুষ মানুষ, পুরুষ মানুষ জলে ঝাঁপ দেয়না।'

নীলমাধব ভাবল কয়েক মিনিট, কিন্তু এ-উত্তরের অর্থ বুঝতে পারল না। সে-ও যাবে কুমীরের পেটে, মা-ও যাবে কুমীরের পেটে আবার বাবা ফিরে যাবে কোলকাতায়। মনে মনে ঠিক করল বাবাকে জিজ্ঞেস করবে এর অর্থ কি? আর—মা-র মুখ দেখেও মনে হলনা মা ঠাট্টা করছে।

'মা, হঠাৎ নদীটা সরু হয়ে গেল কেন?' নীলমাধব জিজ্ঞেস করল।

'আমরা খালে এসে পড়েছি কিনা তাই।'

'এটাও ত নদী।'

'না, এটা খাল। বর্ষাকালে পাহাড়ের ওপর জল জমে জমে নিচে গড়িয়ে আসে, নানা দেশের ওপর দিয়ে সে জলের ধারা সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, সেই ধারাকে আমরা বলি নদী, ছোট ছোট খালগুলো মানুষে অনেক দিন ধরে মাটি কেটে কেটে তৈরী করে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাতায়াতের সুবিধার জন্যে বা মাঠে চাষের জল নেবার জন্যে।'

খালের দু'পাশে ঘন জংগল। গাছের ডালে অসংখ্য বাদুড় ঝুলে রয়েছে। নীলমাধব দেখে অবাক হয়ে গেল। 'ওগুলো অমন করে ঝুলে আছে কেন মা?'

'অমন করেই ওগুলো ঝুলে থাকে সারা দিন, তারপর রাত হলে উড়ে যায় আকাশে ফলের সন্ধানে। দিনের বেলা বাদুড় চোখে দেখতে পায়না।'

'কাক ত দেখতে পায়।'

'কাক আর বাদুড়ের চোখ সমান নয়।' বলল সুরমা।

উত্তরটা নীলমাধবের পছন্দ হলনা, কিন্তু তবু সে চুপ করে রইল। মন তার ঘুরে বেড়াচ্ছে দিদিমার কোলের কাছে, দালানে পায়রার ঝাঁকের পেছনে পেছনে। তাল পুকুরের পাড়ে বাঁশ-ঝাড়ের ছায়ায়, পেয়ারা গাছের ডালে, চৌধুরী দীঘির পূবধারে কৃষ্ণচূড়া গাছটির নিচে যেখান থেকে নির্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাক শোনা যায়, দেখা যায় কাঠবেড়াল লাফাচ্ছে গাছ থেকে গাছের শাখায়। মাছরাঙ্গা দীঘির জলে ছোঁ মারল, তার ঠোঁটের মধ্যে সাদা মাছটার গায়ে সূর্যের আলো পিছলে পড়েছে। একটা পাকা কতবেল ঝড়ে পড়ল মাটিতে। এক ঝাঁক চড়ুই ঝগড়া করছিল নিচে, ফুড়ুক করে উড়ে পালাল। কি একটা ফুলের অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধে নিশ্বাসটা ভারি হয়ে আসছে, গাছ পালার আড়াল দেখা যায়না কোথায় কি ফুল ফুটে আছে। শুকনো ডালটায় ফড়িং উড়ে আসে, নীলমাধব ছোট একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারে। ফড়িংটা পালিয়ে যায়—আবার আসে উড়ে, সেই ডালটায় বসে। আবার ঢিল মারে নীলমাধব, পালায় আবার, আবার উড়ে আসে। কি আশ্চর্য

কাণ্ড একবার দেখ ! নিজে তাড়া করল এবার ফড়িংটাকে। কোথায় যে মিলিয়ে গেল কে জানে। শুকনো ডালটার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ—আর ফিরে এল না ফড়িংটা। দীঘির জলে বিকেলের সোনালী রোদের ছায়া পড়েছে, জলকে মনে হচ্ছে যেন গলানো সোনা। একটা সাদা বক উড়ে এসে বসল জলের ধারে। আস্তে আস্তে লম্বা লম্বা পা ফেলে দেখতে লাগল এ-পাশ ও-পাশ। কি অদ্ভুত ভাবে গলাটা লম্বা করে দিয়ে দেখে। ঝপ করে জলের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে ধরে ফেলল একটা ছোট মাছ। গলাটা উঁচু করে দিয়ে টপ করে গিলে ফেলল। আশ্চর্য! কি বোকা। মাছগুলো টেরও পায় না। কিন্তু কাঁটাশুদ্ধ কেমন করে গিলে ফেলে ? ওদের গলায় কি কাঁটা ফোটে না ? একটা মাছ ঘাই মারল জলে, বকটা পালিয়ে গেল সেই শব্দে। ছোট ছোট ঢেউগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে কেমন মিলিয়ে গেল জলের মধ্যে।

'মা, বড় মামা এখনও মাছ ধরেন ছিপ দিয়ে ?' নীলমাধব জিজ্ঞেস করল।

'কি জানি।'

'বড় মামাকে বলবে আমায় একটা ছিপ তৈরী করে দেবে ?'

'তুই বলিস।'

'মাছ ধরবার সময় কাছে গেলে বড় মামা বড় বকে।'

'তোরা যে গোলমাল করিস, মাছ পালিয়ে যায় না ?'

'জলের নিচে মাছ গোলমাল শুনতে পায় ?'

'পায়।'

'মা, আর কতক্ষণ আছে ?'

'ঐ যে দেখা যাচ্ছে ঘাট, ঐ ?'

গলা বাড়িয়ে দেখল নীলু।

ঘাটে যখন নৌকো ভিড়ল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

দু'পাশে ধানক্ষেতের মাঝখানে সরু পথ দিয়ে তারা এগিয়ে চলল। পেছনে মাঝিটা আসছে ট্রাংক আর বিছানা নিয়ে।

'ঐ যে মা দেখা যাচ্ছে, ঐ বাড়িটা, না ?' নীলমাধব মায়ের হাত চেপে ধরল।

'হ্যাঁ রে। বড়মামাকে, দিদিমাকে, মামীমাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিবি। ভুল না হয় যেন।'

ঘাড় নাড়ল নীলমাধব।

লক্ষী আর মাধু দাঁড়িয়েছিল বাইরের বারান্দায়। দৌড়ে খবর নিয়ে গেল ভেতরে।

দিদিমা এলেন বেরিয়ে, ছোটখাটো মানুষ, মাথার চুলগুলো প্রায় সাদা হয়ে এসেছে। বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসো বাবা, বসো,—এতদিনে মনে পড়ল?'

বাবা কিছু বললেন না, একটু হেসে দিদিমাকে প্রণাম করলেন। মায়ের উপদেশ নীলমাধব ভুলেই গিয়েছিল—সেও প্রণাম করল। দিদিমা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, কপালে দিলেন একটা চুমো, 'লক্ষী মাণিক আমার।'

নীলমাধব মুখ ফিরিয়ে জামার হাতা দিয়ে কপালটা মুছে ফেলল। একি রে বাবা! চুমো দেবার সময় থুথু লাগিয়ে দেয় কেন?

মা-কেও দিলেন কয়েকটা চুমো। নীলমাধব লক্ষ্য করল—মা কিন্তু আঁচল দিয়ে মুখ মুছলেন না।

গোরা, নিতু, মাধু, অনি, লক্ষ্মী, সবি সবাই এসে দাঁড়াল। দিদিমা ধমক দিল, 'কি দেখছিস হাঁ করে, পিসেমশাই আর পিসিমাকে প্রণাম কর।'

একসঙ্গে নিচু হতে গিয়ে লক্ষ্মী আর মাধুর মাথা ঠুকে গেল। দু'জনেই মাথায় হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নীলমাধব না হেসে পারল না।

ভেতরের বারান্দায় নীলমাধবকে ঘিরে বসল সবাই। চিড়িয়াখানা আর যাদুঘরের গল্প করতে করতে খাবার সময় হয়ে গেল। মামীমা ডাকতে এলেন খেতে। বাবার খাওয়া হয়েছে, বাবা বড়মামার সঙ্গে গল্প করছেল। নীলমাধবের ইচ্ছে ছিল গল্প বলে ওদের তাক লাগিয়ে দেয়, মাধু আর সবি ত সিংহের গল্প শুনতে শুনতে তার গা ঘেঁষে বসেছিল। সাতটি ছেলেমেয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে আর সে বলে যাচ্ছে গল্প। গল্পের আর শেষ নেই।

কিন্তু মামীমার তাড়ায় খেতে না গিয়ে পারল না তারা।

খাবার পর পাশাপাশি শুয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প করল তারা যতক্ষণ না দিদিমার তাড়া খেয়ে চুপ করল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবাকে আর দেখতে পেলনা নীলমাধব। মার মুখ খানি বিষন্ন গম্ভীর। দিদিমার কাছে বসে আছে, মনে হল দিদিমা যেন বকছেন। নীলমাধব দেয়ালের পাশ ঘেঁসে দাঁড়াল। শুনতে পেল দিদিমা বলছেন:

'বলিস কি রে? জোয়ান লোক কাজকর্ম্ম করেনা—দাদার ঘাড়ে বসে খাচ্ছে!'

বুঝিয়ে না দিলেও নীলমাধব বুঝতে পারল বাবার কথা হচ্ছে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

দিদিমা আবার বলছেন, 'বলতে পারিসনা কিছু, বার করে দিতে পারিসনা ঘর থেকে।'

'ঘরে কি বসে থাকে এক মিনিট?' মা বলল, 'সারাদিন ত ঘোরে। চাকরির জন্যে ঘুরে ঘুরে চেহারাটা কি রকম হয়েছে একবার দেখলে?'

'টাকা রোজগার করতে না পারলে পুরুষের চেহারার আবার মূল্য কি ?' উত্তর দিলেন দিদিমা, 'ঘুরলেই ত হলনা দিন রাত, আড্ডা দেয় নয় ত তাস পেটে বা নেশা করে।

'কি যা তা বলছ মা ? বৌদি শুনতে পাবে।'

'পাকনা শুনতে, হাত পা গুটিয়ে দুবেলা গিলতে পারে সে, আর আমি বলতে পারিনা। নিজে বৌ ছেলেকে খেতে দিতে পারেনা আবার বড় ভাইয়ের মুখে মুখে কথা, দিয়েছে ত তাড়িয়ে ? শিক্ষা হয়েছে এবার ? তাই বুঝি দাদার ঘাড়ে ফেলে চলে যাওয়া হল চোরের মত।'

'চোরের মত যাবে কেন ?' বললেন মা, 'ওর অবস্থার কথা ও ত বড়দাকে খুলেই বলেছে সব। চাকরি যোগাড় করতে পারলেই আমাদের নিয়ে যাবে কোলকাতা। দাদা কি কয়েকটা দিন বোন আর বোনের ছেলেকে খেতে দিতে পারেন না ?'

'পারলেও খেতে দেওয়া উচিত নয়। তাতে কুঁড়েমির প্রশ্রয় দেয়া হয়, সে লোকটা গাঁজা খেয়ে বেড়াবে আর বৌ-ছেলেকে খাওয়াবে অন্য লোক ?'

'তুমি ত এমন কোন দিন ছিলেনা মা ? এত দিন ত সে রোজগার করেছে, খাইয়েছে, পরিয়েছে, আজ হঠাৎ তার চাকরি চলে যাওয়াতে রাতারাতি লোকটা বদলে গেল নাকি ? আবার চাকরি পেলে আমরা চলে যাব তোমাদের বাড়ি ছেড়ে, মনে রেখো, সেই আমার শেষ যাওয়া। যদি খেতে না পেয়ে রাস্তার ধারে ভিক্ষে করতে হয় কোন দিন তাহলেও তোমাদের নাম করব না।'

দিদিমা চুপ করে রইলেন। মা চলে গেল রান্নাঘরে। নীলমাধব এল পেছনে পেছনে। 'আজ থেকে আমি রাঁধব বৌদি' সুরমা বলল মামীমাকে, 'তোমার ছুটি ! শুধু বসে বসে খাওয়াটা ভালো দেখায় না। তবু সান্ত্বনা থাকবে কাজের বদলে দুবেলা খেতে পাচ্ছি।' সুরমা কেঁদে ফেলল। নীলমাধব নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেল।

* * * * *

নীলমাধবের সমস্ত গল্প যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে, উৎসাহ গেছে শেষ হয়ে। সারাটি দিন পালিয়ে বেড়াল সে। কারুর সঙ্গে কথা বললনা ভাল করে।

গোরা জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে কি হয়েছে তোর ?'

'কিছু হয়নি ত !' বলল নীলমাধব।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞেস করল, 'ভাই নীলুদা পিসিমা কাঁদছেন কেন ?'

'কাঁদছে নাকি ?'

'দেখে এলাম।'

'জানিনা।'

'দিদিমা বকেছে সকালে আমি জানি, বুড়িটা ভয়ানক পাজি, দিন রাত খালি বকে সবাইকে। দাঁড়াও না দেখাচ্ছি মজা !'

রাত্রে শোবার ঘর দেখে নীলমাধবের কান্না পেল। স্যাঁৎসেঁতে, ভিজে ঘর ; ঠাণ্ডায় মাটিতে পা ফেলতে অস্বস্তি লাগে। মাটির ওপরেই মাদুরে বিছানা পাতা হয়েছে। লণ্ঠনের বদলে একটা তেলের কুপি জ্বলছে। ধোঁয়ায় ভরে গেছে সমস্ত ঘর, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ছোট জানলার ও-পাশেই গোয়াল আর কচু বন। এক মিনিট চুপ করে দাঁড়াতে পারলনা নীলমাধব। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে বসছে পায়ের ওপর, মাঝে মাঝে এক ঝাপটা হাওয়া আসে—যেন চুরি করে, হাওয়ায় গোবরের গন্ধ, দম আটকে আসে।

সমস্ত বাড়িটা নিঝুম, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। দূরে কোথায় শিয়াল ডেকে উঠল। কচু বনের মধ্যে কি একটা সর সর করে উঠল। নীলমাধব মায়ের কাছে সরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের শব্দ মা।'

'বোধ হয় গোসাপ !' সুরমা বলল।

কয়েক মিনিটের নিস্তব্ধতা।

নীলমাধব বলল, 'মা, মামীমার কাছ থেকে একটা মশারি চেয়ে আনব।'

'দূর পাগল !' সুরমা ওকে টেনে নিল বুকের কাছে।

ট্রাংক খুলে ময়লা, তালিমারা একটা মশারি বার করে খাটিয়ে ফেলল সুরমা। 'আয়, শুবি আয়, আর মশা কামড়াবে না !'

নীলমাধব কাঁথাটা টেনে দিল গায়ের ওপর। ফাল্গুনের মাঝামাঝি, রাত্রের দিকে ঠাণ্ডা পড়ে। ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিল সুরমা। নীলমাধবকে টেনে আনল বুকের কাছে। সমস্ত দিনের বেদনা আর দুঃখ যেন তার দূর হয়ে গেল।

কতক্ষণ পরে নীলমাধব বলল, 'মা, তুমি কিচ্ছু ভেবো না, আমি বড় হয়ে অনেক টাকা রোজগার করব।',

'সেই আশায় ত বুক বেঁধে আছি রে।'

'আমরা আর মামার বাড়ি থাকব না।'

'না।'

'বাবাকে তুমি কাল চিঠি লিখে দাও, আমাদের নিয়ে যাবে।'

'চিঠিত লিখে দিয়েছি, তোর বাবা এলে এখান থেকে পালাব আমরা।'

'বাবা কবে আসবে ?'

'শিগ্গিরি। রাত হল ঘুমো।'

নীলমাধব ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়ে।

রজত সেন



চুনী ঘোঘো

আমার মামা—চুণীকান্ত—একেবারে দুর্দান্ত। বয়সে আমার চাইতে বেশ কয়েক বছর বড়ই। তিনি আমার উপর রাতদিন নজর রাখছেন। অবশ্য এতে তাঁর কী লাভ তা আমি জানিনা, চুণীমামাও জানেন কিনা সন্দেহ। লিচুগাছের উপর থেকে, আমগাছের তলা থেকে তিনি যে আমাকে কতবার ফিরিয়ে এনেছেন তার লেখা জোখা নেই। ফিরিয়ে ত এনেছেনই আবার বাবার কাছে বলেও দিয়েছেন। উত্তম মধ্যম মাঝে মাঝে যা বাবার কাছ থেকে খেয়েছি তা ঐ চুণীমামার দৌলতে। শুধু আমার নয় পাড়ার সব ছেলের উপর ছিল তাঁর নজর। কে কি খায়, কে কি চুরি করে, কে কোথায় যায়, কে কতক্ষণ পড়ে, কী গোপন পরামর্শ আমরা করি—সবই প্রায় চুণীমামার জানা। অবিশ্যি কী করে জানতে পারেন সেটা কিছুতেই জানা যায় না। আমরা সন্দেহ করি আমাদের মধ্যেকার কোন বিভীষণের কাজ। কিন্তু সে যে কে তা কিছুতেই বুঝতে পারি না। চুণীমামার জন্য আমাদের কত কাজ মাটী হয়ে গেছে তার শেষ নাই। একবার আমরা কয়েকজন—অনেক গোপনে, গ্রামের পাশে আমাদের ইব্রাহিম কাকার বাড়ি থেকে মুরগী কাটিয়ে এনেছিলাম—ইচ্ছে ছিল বনভোজন করব। বন ভোজনটা গোপনে চলেনা—মুরগীটাকেই গোপনে চালাতে চেয়েছিলাম। রান্না বান্নাও করেছিলাম। এলেন চুণীমামা। কী রান্না করছিসরে? মাংসের গন্ধ যে! দিবি নাকি কিছু? বলে বসে পড়লেন। ভাগ দিতেই হ'ল। গাঁয়ের লোকে জানত আমরা হাঁসের মাংস খাচ্ছি—চুণীমামা খেতে বসে বেশ খাচ্ছেন, খাওয়া দাওয়া শেষ করেছেন—আমরা ভাবলাম

বুঝি বিপদটা কেটে গেল। আমরা তখন বেশ চোখোচোখি করছি—হাসি ঠেলে উঠ্ছে চুণীমামা টের পান্নি বলে। আঁচিয়ে এসে তিনি আবার বসলেন আমাদের পাশেই। বসে আস্তে আস্তে বললেন, খাসা রেঁধেছিস ত তোরা! কত নিল একটার দাম? কটা কিনেছিলি?
—আমরা ভাবলাম বুঝি হাঁসের কথাই হ'চ্ছে—বল্লাম, তিনটে হাঁস ছ' টাকা নিয়েছে।
—আহা হাঁসও রেঁধেছিস নাকি তোরা? দেত খানিকটা? বলে তিনি আবার একখানা পাতা টেনে নিলেন। তারপর বললেন, হাঁস-মুরগী, বলি ব্যাপার কি? টাকাটা কে খরচ করছে?

আমি বললাম, টাকাটা সবাই মিলে তুলেছি কিন্তু মুরগীর কথা কাউকে বলবেন্ না কিন্তু!

চুণীমামা বললেন, আরে পাগল্!

চুণীমামা কিন্তু কথা রাখেন নি ঠিক প্রচার করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে বনভোজন করা নিষেধ হয়ে গিয়েছিল্ বাড়ী থেকে।

এমনি আমাদের চুণীমামা—ভয় করব না ত কি করব।

চুণীমামার জন্য কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না। লুকিয়ে লুকিয়ে মাঝে মাঝে পদ্মায় যেতাম, মাঝিদের বলে টলে নৌকায় চড়তাম, কয়েক আনা খরচ হ'ত, কিন্তু নৌকোয় আরামের অভাব হত না। টাটকা টাটকা ইলিশ মাছ নৌকোর উপরেই ভাজা করে খেতে যে কী আরাম লাগত! কয়েকবার গেছি—প্রায় বারই চুণীমামার কাছে ধরা পড়ে গেছি।

চুণীমামার এই রকম আমাদের পেছনে গোয়েন্দাগিরির ফল হয়েছিল এই যে চুণীমামাকে আমরা রীতিমতো ঘৃণাই করতাম। ছোট বয়সে এ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন সকলেরই থাকে। দুরন্তপনা সকলেরই করা উচিত এই ছিল আমাদের মত। সেই মতের উপর কুড়ুল চালাতেন চুণীমামা। যা নয় তাই বলে তিনি নালিশ করতেন বাবা কাকাদের কাছে, বুঝতে পারতাম না কেন তিনি আমাদের পেছনে লেগেছেন, কিন্তু মনে মনে তাঁর উপর রাগ ছিল—সেই রাগের স্ফূর্তি না হওয়ায় সেটা ঘৃণায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমাদের দলে সিগারেট খেত কেবল অবনী, কিন্তু চুণীমামার কল্যাণে গ্রামের কোন কোন লোক, এবং বাড়ির সকল লোকেরই ধারণা হয়ে গিয়েছিল আমরা সকলেই সিগারেট খাই—ফলে কাঁচা পয়সা হাতে খুব কমই পেতাম। প্রয়োজন হ'লে বাড়ি থেকে বলা হ'ত, কী দরকার বলো আনিয়ে দিচ্ছি।

এইবারে বলি চুণীমামার চেহারাটা কী রকম ছিল। অত্যন্ত রোগা চেহারা, লম্বা, হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তোলা, বয়স বাইশ তেইশ কি আরও বেশী। হাঁটতেন বকের মতো ভঙ্গীতে, কথা বলতেন বেশ কেটে কেটে। মিশ্তেন ছোট বড় সকলের সঙ্গেই—কিন্তু মনে হোতো সকলেই তাঁকে ভয় করত। চুণীমামা আমাদের ঠিক আত্মীয় ছিলেন না—কিন্তু আমাদের বাড়িতেই থাক্তেন এবং শুনেছি তাঁর ছোটবেলা থেকেই আছেন—কারণ চুণীমামা ছিলেন

কোন দূর সম্পর্কের পিসেমশাইএর ছেলে, চুণীমামার বাবা মা কেউই ছিলেন না বলেই আমাদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলেন, লেখা পড়াও কিছু কিছু শিখেছিলেন, কিন্তু তাকে আমরা কেন মামা বলতে সুরু করি সেটা এখনও রহস্যাবৃত।

চুণীমামার বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের মনে যে উত্তাপ জমে উঠেছিল তার ফলে সব সময়ে আমরা তাকে জব্দ করবার জন্য মতলব আটতাম। ভাবতাম কি করে বাছাধনকে এমন শিক্ষা দিতে পারি যার পরে সে আর আমাদের পিছনে লাগতে সাহস করবে না। বেদম মার দেওয়া ছাড়া কাউকে যে জব্দ করা যায় সে জ্ঞান তখনও হয়নি। বয়স আমাদের তখন পনেরো। আমরা এমন ভাবে প্রচার করলাম যেন আমরা গ্রাম থেকে একমাইল দূরের নীলকুঠিতে চুরুট খাওয়া শিখ্তে যাচ্ছি। দেখানোর জন্য দশটা দশ পয়সার চুরুটও কিন্লাম। ব্যাপারটা যাতে চুণীমামা টের পায় বিশেষ ভাবে সেই ব্যবস্থাই করেছিলাম। দলের একজন পাণ্ডা গোছের হলেও মনে মনে আমি এটা জানতাম মার দেবার সময় আমি কিছুতেই সেখানে থাকতে পারব না। কেমন যেন লজ্জা বোধ করছিলাম। আমি স্থির করেছিলাম ব্যাপারটা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখ্ব।

বিকেলের দিকে ছটো লাঠি এবং দশটা চুরুট নিয়ে নীলকুঠির দিকে আমাদের অভিযান সুরু হল। নীলকুঠিতে গিয়ে, অবনী একটা চুরুট ধরাতেই চুণীমামা পাশের এক ঝোপ থেকে আবির্ভূত হলেন। আমরা আগেই জানতাম চুণীমামা নীলকুঠিতে বসে আছেন। চুণীমামা আসবামাত্রই সবাই লাঠি দিয়ে তাকে দমাদ্দম মারতে আরম্ভ করল। আমরা জান্তাম চুণীমামা একথাও বলে দেবেন—আমাদের যে সে ভয় ছিল না তা নয়। কিন্তু চুণীমামাকে মার লাগানোর মধ্যে ভয়ের থেকে উত্তেজনাটা অনেক বেশি হয়েছিল। ওরা মারে আর চুণীমামা চীৎকার করেন—দারুণ মার খাবার পরে আমি দূরে আর থাক্তে পারলাম না—এসে বল্লাম, এখন ছেড়ে দে। ওরা সবাই চুণীমামাকে ছেড়ে দিল। চুণীমামা টলতে টলতে গ্রামের দিকে যেতে লাগ্লেন—অবনী বললো, কেমন? আর আমাদের পেছনে লাগবে?

চুণীমামা চলে যাচ্ছেন অনেক দূর থেকে দেখ্তে লাগলাম, তিনি যত গ্রামের দিকে এগিয়ে যান আনন্দটা কমে গিয়ে আমাদেরও মনের মধ্যে ভয়টা এগিয়ে আসতে লাগল। তখন চিন্তা হল গ্রামের গিয়ে আমরা কী কৈফিয়ত দেব?

অবনী, গোরা এরা অনেক পরামর্শই দিল—কিন্তু গ্রামে পৌঁছনোর পর এগুলোর ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। ভয়ে ভয়ে বাড়িতে ফিরে সাধারণ ব্যবহারই পেলাম হাত পা ধুয়ে পড়তে বসলাম। বাবার তামাক খাওয়ার শব্দ দূর থেকে পাচ্ছিলাম কিন্তু অন্য দিনের

মতো তাঁর হুঙ্কার আমাকে অভ্যর্থনা করলনা। অর্থাৎ যেদিন যেদিন চুণীমামা আমাদের বিরুদ্ধে বলতেন, সেদিন সেদিন হুঙ্কারটাই প্রত্যাশিত ছিল। বুঝলাম চুণীমামা কিছুই বলেন নি।

একদিন গেল দুদিন গেল তিনদিন গেল—চুণীমামা একবারও বল্লেন না এবং আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার সুরু করলেন যেন সেদিন কিছুই হয়নি। নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—দু একটা ব্যাপারে পয়সাও দিতে লাগলেন। একদিন বললেন, সিগারেট খাস্‌না ওতে 'লাঙস্‌' খারাপ হয়। মুরগী খাস ত লুকিয়ে খাস। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাড়িতে এর পর থেকে একদিনও তিনি নালিশ করেন নি।

আমরা নিশ্চিন্ত হলাম—কিন্তু বুঝতে পারলাম না—চুণীমামার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের আসল কারণটা কি। অথবা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বালকদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। আমাদের কাছে হেরে যাবার লজ্জায় না নিজের গোয়েন্দাগিরির প্রতি বিশ্বাস হারানোতে।

সে প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয়নি।

"হিমাচল"

ফার্স্ট প্রাইজ

দেহের অনুপাতে মাথাটা অস্বাভাবিক রকম বড় হ'লেও মগজে কিছুই থাকে না কেলোর—লেখাপড়ার কথা তো একেবারেই না। অথচ ফিচলেমি আর কূটবুদ্ধিতে এসো, তালও তুমি পাবে না কেলোর একটি কথার। কোন তক্কে যে কি কথা বলে ফেলে, সাধারণ লোকের পক্ষে তা বোঝাও দুস্কর। পাঁচটা কথা জড়িয়ে মড়িয়ে এমন একটা তালগোল পাকিয়ে তোলে যে দু-মিনিট কান খাড়া ক'রে শুনলে মাথার ভেতরটা দেখবে ঘুরতে আরম্ভ ক'রেছে তোমার। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে বলে যদি প্রতিবাদ কর তো আরও মুস্কিল। কেলোর কণ্ঠাটা দেখবে তখন অমনি লাটাইএর মত নাচতে সুরু ক'রেছে টক্ টক্ ক'রে। মনে হবে, কেলো তখন স্রেফ কথার সূতো ছেড়ে যাচ্ছে বেহুঁস হ'য়ে। ঘাড়টা ওর কেতরে লম্বা হ'য়ে এগিয়ে যাবে। আর চোখেরও কোন পলক পড়বে না। একটু পরেই তুমি বুঝতে পারবে যে কেলোর উল্টোপাল্টা কথার তোড়ের মুখে তোমার মাথাটাও কাটা ঘুড়ির মত লাট খেতে খেতে ভোঁচক্কর মেরে গোঁত্তা খেতে সুরু করেছে। সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, না বুঝলে কেলো তোমার হাতে ধরবে, পায়ে ধরবে, কিন্তু কথা তার তোমার শুনতেই হবে। আপদ বিপদের সময় আবেগ আর তোড়—দুটোই আবার বেড়ে যায় কেলোর কথার। বিশেষ অসুবিধে দেখলে বের করে সেই ভিজে ভাঙ্গা গলাটা। বক্তব্য যাই হোক না কেন, গলা শুনলেই তোমার মনে হবে খুব একটা উঁচু স্তরের কথা বলছে কেলো। অবিশ্বাস করতে তোমার নিজের মনটাই কেমন কেমন করবে। মনে হবে, এত ছোট আমার মন! কেলোর কথার এমনি ইন্দ্রজাল। সুনাম দুর্নাম মিশিয়ে কেলোর বেশ নামডাক আছে পাড়ায়। কেলোকে বাদ দিয়ে তল্লাটে যে কোন অনুষ্ঠান হবে, এ কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। সব ব্যাপারেই হড়বড় করে একটু বেশী বকে বটে কিন্তু কেলো না থাকলে আবার হয়ও না কোন কাজ। গেট সাজাতে হবে, কেলো অমনি সটান দা নিয়ে গিয়ে উঠলো দেবদারু গাছে। বাসা ভাঙ্গার অপরাধে দল বেধে কাকেরা এসে কেলোর মাথা ঠুকরে চুল তুলে নিলে, হাজার হাজার লাল পিঁপড়ে লাইনবন্দী করে এসে কামড়ে একেবারে ফুলিয়ে দিলে কেলোর গা হাত পা, তারপর গাছ মুড়িয়ে ডাল কাটার দায়ে চড় চাপড়টাও উপরি পাওনা হলো কেলোর কিন্তু দেবদারু পাতা এনে গেট সে ঠিক তোমার সাজিয়ে দেবে যথা সময়ে।

বারোয়ারী ব্যাপারে চাঁদা তুলতে হবে, কেলো চললো অমনি খাতা নিয়ে বাড়ী বাড়ী। বৈঠকখানার বুড়ো কত্তাকে ফাঁকি দিয়ে চার আনার জায়গায় দেখবে কেলো ঠিক একটি টাকা জোগাড় করে এনেছে বাড়ীর মেয়েদের কাছ থেকে।

আবৃত্তি প্রতিযোগীতা হবে পাড়ায়—মঞ্চ বাঁধতে হবে। কুচপরোয়া নেই, নারকেল পাতার দড়ি আর ছুরি ট্যাঁকে করে কেলো অমনি নেবে গেল বাঁশের খুঁটি বাঁধতে। হাতুড়ি, বাটালি, ইট, কাঠ পর্দা—সব কিছু নিয়ে খাওয়া নেই, নাওয়া নেই দুদিন দু-রাত্তির ভুতের মত কাজ করে গেল কেলো।

এই রকম সব কাজেই কেলোর উপস্থিতি একেবারে অপরিহার্য্য। কাজ করতে আর কাজ বাগিয়ে নিতে কেলোর জুড়ীদার ছোটদের মধ্যে পাড়ায় আর কেউ নেই। দোষ যেমন, গুণও আবার তেমনি কেলোর অনেক।

এত করেও গুণীসমাজে কিন্তু তেমন সমাদর পায় না কেলো। বিশেষ করে ইদানীং সে ভাল করেই লক্ষ্য করেছে যে সে একজন ক্লাবের ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজের সময় সকলেই অবিশ্যি খুব কেলো কেলো করে কিন্তু কাজ ফুরোতেই কেউ তার আর নাম উচ্চারণও করে না। শতমুখের প্রশংসা পায় তখন শুধু তরুণ সঙ্ঘের গুইরাম, নিতাই, ট্যারা মিত্তির আর রামকানাই। তিনশবার ঢোক গিলে দু পাতা কবিতা মুখস্থ বলেই রায় সাহেব বটুকেশ্বর ঘোষের হাত থেকে সসম্মানে কেমন সোনা রূপোর পদক নিয়ে যায় হাসতে হাসতে। সে কি খাতির! গুইরাম আর নিতাই একটা কথা বলে কি আর অমনি যেন ধন্য হয়ে যায় পাড়ার ছেলে মেয়েরা। কিন্তু কেলো! ভাবতে বসে আক্ষেপটা যেন দলা হ'য়ে উঠে আসে কেলোর কণ্ঠনালীতে। থেকে থেকে আত্মধিক্কারে কেমন কান্না কান্না পায়। তাই সে এবার ঠিক করেছে প্রতিযোগিতায় নামবে। বি-গ্রুপে আবৃত্তি করতে হবে তাকে রবীন্দ্রনাথের দুই বিঘা জমি।

খবরটা মুখে মুখে চাউর হয়ে গেছে সারা পাড়ায়, কেলো এবার কম্পিটিশন দিচ্ছে।

মণ্টু ঘোষ আবার গুইরামের দলের। ঠাট্টা করে শুধু একবার বলেছিল,—ফুটফরমাশ খাটিস, বাহবা পাস, সেই তো তোর ছিল ভাল। সে সব ছেড়ে আবার আর্টের ব্যাপারে মাথা গলাতে এলি কেন!

প্রথমটা কিছু বলে নি কেলো। কথা শুনে চুপ করে গুম মেরে ছিল। তারপর ফের না যেই সেই কথা বলা অমনি দুই বিঘা জমির প্রথম লাইনটা চু কিত্ কিত্এর মত করে টেনে বিশ্বাসদের কামরাঙ্গা তলায় মণ্টু ঘোষকে ফেলে য়্যাসা ঘা কতক ক'সলে যে তারপর থেকে গুইরামের দল একেবারে ঠাণ্ডা।

কিন্তু গুইরামের দল ঠাণ্ডা হলেও কেলো নিজে আশ্বস্ত হতে পারে নি। দুই বিঘের এক বিঘে কবিতাও মুখস্থ হয় নি কেলোর। যখন পড়ে তখন অবিশ্যি ঠিকই মনে থাকে কিন্তু তারপরই কেমন

যেন সব ভুল হয়ে যায়। বই বন্ধ করে আবৃত্তি করতে গেলেই তোড়ের মুখে সব নিজের কথা এসে পড়ে। চেষ্টা করেও কেলো রোধ করতে পারে না। আজ বাদে কাল গুইরামের দলের সঙ্গে তাকে বোঝাপড়া করতে হবে। পরাজয়ের কথা মনে করতেও গা-টা কেমন যেন কাঁটা দিয়ে উঠছে তার থেকে থেকে।

সারা রাতটা সে দিন আর কেলোর ঘুমই হলো না ভাল করে। চোখ বুজলেই ছ্যাখে গুইরাম মঞ্চের ওপর বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে গড় গড় করে তুই বিঘা জমি মুখস্ত বলে বটুকেশ্বর ঘোষের সম্মাসী হাত থেকে পদক নিয়ে যাচ্ছে; আর সে অসহায় ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে কেবল তাই দেখছে। বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠে ঘুম ভেঙে যায় কেলোর অতর্কিতে। জেগে ছ্যাখে, রাত তখনও অনেক। ফর্সা হ'তে ঢের বাকি আছে।

ভোর না হ'তেই ঘুম ভেঙে যায় কেলোর। শুনেছিল, ভোর বেলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লে পড়া খুব ভাল মুখস্থ হয়। দৃকপাত না করে সে বিছানার ওপর বসেই তারস্বরে চেঁচাতে সুরু করে। বাড়ীর সকলে তো অবাক, এত মনোযোগী ছেলে হ'লো কবে থেকে কেলো!

তারপর বিকেল বেলা। সারা গাঁ-টাই যেন উজোড় হয়ে এসে জমেছে তরুণ সঙ্ঘের উঠোনটায়। মোটা দড়ির ব্যবধান রেখে ভাল দিকে বসেছে পুরুষেরা; আর বাঁ পাশে চিকের আড়ালে বসেছে মেয়েরা। তরুণ সঙ্ঘের ছেলেরা সব বয়েজ স্কাউটের পোষাক পরে সামরিক কায়দায় শৃঙ্খলা বজায় রাখবার চেষ্টা করছে সভার। তবু গোলমাল থামছে না। দমকা হাসির ফোয়ারায় মাঝে মাঝে মাথার ওপরকার চাঁদোয়াটাই যেন উড়ে যেতে চাইছে।

দূরে মঞ্চের ওপর বসেছেন রায়-সাহেব বটুকেশ্বর ঘোষ। আবলুষ কাঠের মত কালো এক তাল মুখের ওপর হাসি হাসি ঠোঁট তুখানা দেখে মনে হচ্ছে তামাক খাওয়া টিকের গায়ে বুঝি আগুন ধরে গেছে। সহর বাজারে চাল কলের কারবার আছে বটুকেশ্বরের; তা ছাড়া তল্লাটের চালানী ব্যবসাটাও তাঁর মুঠোর মধ্যে। গাঁয়ের ফুড কমিটির সেক্রেটারী আর মহকুমা হাকিম নাকি বটুকেশ্বরের কথায় ওঠেন বসেন। প্রতি বছর মোটা টাকা ডোনেশন দেন বলে সামাজিক অনুষ্ঠানেও বটুকেশ্বরের দহরম মহরম অপ্রতিহত। হয় সভাপতির পদ নয় প্রধান অতিথির আসন—বটুকেশ্বরের একেবারে একচেটিয়া।

এ হেন সম্মানী বটুকেশ্বর ঘোষের ধারে কাছে ঘেঁসাও শ্লাঘার কথা। পাশেই বসেছেন বাহাত্তুরে বুড়ো হাড় কেপণ নরেন হালদার—মাথাটা সব সময়ই তার ঠক্ ঠক্ করে নড়ছে। এ ছাড়া গাঙ্গুলী মশাই, কেষ্ট মিত্তির, ভুলো বোস, গলা কাটা ডাক্তার বাড়ুয্যে—গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বররা সকলেই উপস্থিত আছেন। সভার গুরুত্ব বজায় রেখে সকলেই মুখগুলো যথাসম্ভব রাশভারী করে বসে আছেন। এক বটুকেশ্বর ঘোষই মাঝে মাঝে ফর্সা

চাদরের ভেতর থেকে গলাটা কচ্ছপের মত লম্বা করে বাড়িয়ে মুখটা নরেন হালদারের কানের ওপর চেপে ধরছেন আর ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসছেন। রসিকতাটা না বুঝে ভুলো বোস আর গলা কাটা ডাক্তারও দ্যাখন হাসি হাসতে আরম্ভ করেন। না হেসে উপায় নেই। বটুকেশ্বর ঘোষ যখন হাস্‌ছেন তখন না বুঝে বোকার মতই সকলকে হাসতে হয়।

এতক্ষণে সুরু হয় বাঘের খেলা। রায় সাহেবে বটুকেশ্বরের নির্দ্দেশ মত সেক্রেটারি রমাকান্ত রায় জোর গলায় এক এক করে প্রতিযোগীদের নাম ডেকে ওঠে। প্রথমে ডাক পড়ে, গুইরাম দত্ত।

লবঙ্গ চিবিয়ে গলা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায় গুইরাম। আবৃত্তি ক'রে ক'রে গুইরাম এখন একেবারে ওস্তাদ হয়ে গেছে। তুই বিঘা জমি তো তুচ্ছ কথা, গোটা চয়নিকাটাই কণ্ঠস্থ হয়ে আছে গুইরামের।

সুরু হলো আবৃত্তি। সভায় মৃদু গুঞ্জন ছাপিয়ে গুইরামের গলা উঠলো, শুধু বিঘে তুই মোর ছিল ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে···

এক নিঃশ্বাসে কথার ঘোড়া ছুটিয়ে গেল গুইরাম· তুই বিঘা জমির ওপর দিয়ে কোথাও এতটুকু বাধলো না বা কাটলো না। ধন্য ধন্য করতে লাগলো সভার সকলে— বাঃ গুইরাম, সাবাস গুইরাম। অনেকেরই ধারণা হলো মেডেলখানা গুইরাম এবারও মারবে।

গুইরামের পরই ডাক পড়লো নিতাই মিত্তিরের। সঙ্গে সঙ্গে পাটকাঠির মত রোগা পটকা একটা ছেলে ভিজে বেড়ালের মত রায় সাহেব বটুকেশ্বর ঘোষের চেয়ারের পাশ দিয়ে গুঁড়ি মেরে এসে ফাৎনার মত লাফিয়ে উঠলো সকলের চোখের সামনে। তারপর কায়দা মাফিক সভাপতিকে হাত তুলে একটা নমস্কার করে ঢোক গিলে তেড়ে ধরলো— শুধু বিঘে তুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে···

হুঁকার খোলের মত ছোট্ট ঐ মাথাটার ভেতরে যে কি করে অত বড় একটা অজাগরী কবিতা ভরতি ক'রে এনেছিল নিতাই, সকলেরই এই বিস্ময়। প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু গলার মিষ্টতায় আর উচ্চারণে নিতাই বুঝি গুইরামকেও মেরে দিয়ে গেল। আবৃত্তি শেষ হ'তে স্বয়ং বটুকেশ্বর ঘোষ আবার নিতাই চন্দরের শুটকো মাথাটায় হাত বুলিয়ে বল্লেন, বেশ হয়েছে, যাও। রোগা পটকা হ্যাংলা নিতাইটা ওর আন্দাজে খুব ভালই আবৃত্তি করে গেল বলতে হবে।

তারপর একে একে ডাক পড়তেই এলো ট্যারা মিত্তির, রামকানাই আর মন্টু ঘোষ। ট্যারা মিত্তির তো মাঝখানে গুলিয়েই ফেল্লো। শেষকালে বেআইনি ভাবে ধরতাই দিতে ঢোক গিলে আর আমতা আমতা করে কোনমতে শেষ করলে।

রামকানাইটা মন্দ বলে না। কিন্তু একটা ওর মহা দোষ এই যে ভুলে যেতেই জিব কেটে ফেলে। গোটা আবৃত্তিটা করতে করতে কমসে কম ত্রিশ বার জিব কেটে কি কেলেঙ্কারী করলে না রামকানাই! সকলেই ধরে নিল রামকানাইএর ভবিষ্যত অন্ধকার।

মণ্টু ঘোষের আবার সব তাতেই একটু কায়দা করা চাই। নাম ডাকতেই পেছন থেকে একেবারে আবৃত্তি করতে করতেই থিয়েটারী ঢংএ সামনে এসে নমস্কার করে দাঁড়ালো। আর কি যে প্যাঁচ শিখিয়ে দিয়েছে ওর মামা!···যেখানে সেখানে ছেদ্ কেটে বসে। ফলে তার মানেই সব সময় ধরা যায় না। আর এত সুর টানে, যে শুনলে মনে হয় আবৃত্তি করতে করতে গান গাইছে। মোদ্দা কথা জমাতে পারলো না মণ্টু ঘোষ। তবে কায়দাটা একেবারে নতুন। ফলাফল এখুনি হলপ করে বলা যায় না।

এইবার কেলোর পালা। নাম ডাকতেই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের গেঞ্জি আর সার্টটা একটু টেনেটুনে যুৎ করে নিলে। তারপর জিব্ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুখানা ভাল করে চেটে নিয়ে রায় সাহেব বটুকেশ্বরের সামনে এসে ঠ্যাং ভেঙ্গে বেঁকে দাঁড়ালো।

গুইরাম ও আর প্রতিবেশীরা এতক্ষণ পাশের একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে ছিল। কেলোকে দেখে সবাই এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বসলো—দেখা যাক কি করে এবার কেলো! সভার ভেতরেও প্রথমটা একটা চাপা হাসির গুঞ্জন ফেনিয়ে উঠেছিল কিন্তু শান্তি বাহিনীর সাময়িক হস্তক্ষেপের ফলে গোলমালটা ঠিক দানা বাঁধতে পারল না।

যথারীতি নমস্কার করে কেলো এবার আবৃত্তি সুরু করলে। সুরুতে বিড় বিড় করে আপন মনেই কি যেন সব বললে, বোঝা গেল না। তারপরই আর কি একেবারে ফেটে পড়লো কেলোর হেঁড়ে গলা—অনেকটা আণবিক বোমার মতই। পাড়ার কেষ্টধন মিত্তির খুব নাম করা অভিনেতা। অবিকল কেষ্টবাবুর কায়দায় সামনে পেছনে হটে আবৃত্তি সুরু করলো। সকলে তো অবাক নকল করলে কি করে কেলো কেষ্ট মিত্তিরকে!

কারো আবৃত্তি শুনে চঞ্চল হয়ে ওঠেন নি বটুকেশ্বর, এবার তাঁকেও ঘাড় বাঁকিয়ে কেলোর দিকে ফিরে চাইতে হলো। শেষ না হতেই জনতার ভেতর থেকে করতালি পড়তে লাগলো ঘন ঘন। বাহাত্তুরে বুড়ো নরেন হালদার পর্য্যন্ত তারিফ করে উঠলেন, বা বাবা, বেশ হচ্ছে। দেখে শুনে গুইরামের লম্বা গলাটাও কুঁকড়ে ছোট খাটো হয়ে গেল। শেষকালে কি কেলোই মেডেলখানা মারবে নাকি!

বেশ হচ্ছিল। কিন্তু মাঝখানে ঘটে গেল এক বিপর্যয়। আবৃত্তির তোড়ের মুখে সব নতুন নতুন লাইন এসে পড়তে লাগলো কেলোর। দুই বিঘা জমির আসল লাইন গুলো একেবারে গোলমাল হয়ে গেছে মাথার মধ্যে। অথচ ভেবে চিন্তে ধরতাইটা যে আবার

ঠিক করে নেবে কেলো তারও অবসর নেই। থামলেই মুস্কিল। বিলকুল ধরা পড়ে যাবে—গোঁজামিল দিচ্ছিল এতক্ষণ কেলো। কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে মিল রেখে আর কতক্ষণ আবৃত্তি করা যায়। তবু থামলে চলবে না। আরও কিছুক্ষণ অন্ততঃ চালিয়ে যেতেই হবে যে করে হোক।

কেলো ঝড়ের বেগে আবৃত্তি করে চলেছে তুই বিঘা জমি। খুব অসুবিধে বোধ করলে কেলো ডান হাতের আঙ্গুলটা একেবারে দূর মাঠের গাছপালাগুলোর দিকে তাক্ করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জোর গলায় আবোল তাবোল আবৃত্তি করে চলে—দূরে অতি দূরে দেখা যায় শুধু গাছেদের মাথা নড়ে···এমনি তোড় আর আবেগ যে সন্দেহ করবারও অবসর থাকে না কারো। চুপ করে সকলে শুধু আবৃত্তিই শুনে যায় কেলোর।

কিছুক্ষণ পরই কেলো ধরতাই পেয়ে যায় শেষের দশ লাইনের। আর যায় কোথায়। জনতার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে সে তখন টিপে টিপে প্রত্যেকটা লাইন আবৃত্তি করে যায়। তারপর শেষ লাইনে 'আমি আজ চোর বটে'র জায়গায় এমন দরদ দিয়ে মুচড়ে বলে ওঠে কেলো যে নরেন হালদারের মুখ চেয়ে রায় সাহেব বটুকেশ্বরের চোখেও জল এসে পড়ে। আবৃত্তি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় সভাপতি থেকে কোলের বাচ্চা শিশুটা পর্য্যন্ত হাততালি দিতে আরম্ভ করেছে আনন্দে। চারদিক থেকে ধ্বনি ওঠে, সাধু সাধু, বেশ বলেছ ভাই, সাবাস কেলো। রায় সাহেব বটুকেশ্বর ঘোষ তো খুসী হয়ে জাপটেই ধরলেন কেলোকে সকলের সামনে।

অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে, কিন্তু মানুষের উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। প্রতিযোগীতার শেষ ফলাফল জানবার জন্যে সকলেই অধীরভাবে প্রতীক্ষা করে বসে আছে।

গুইরাম আর কানাই কেলোর অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা দেখে ভয় পেলেও আশা হারায়নি। দল বেধে মঞ্চের একটা কোনে বসে তারা শুধু কেলোর আবৃত্তির সমালোচনা করছে।

আর কেলো এত সাফল্য সত্ত্বেও মনের দুঃখে বনের ধারে গিয়ে চুপটি করে বসে আছে; আর ভাবছে গোঁজামিলটা টের পেলেই তো তার সমস্ত দেমাক আজ ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। গুইরামের দলের সামনে মুখ তুলে সে আর ইহজনমে কথা বলতে পারবে না। অনিশ্চিত শঙ্কায় তার বুকের ভেতরটাও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

হঠাৎ কেলোর যেন মনে হলো সমস্বরে কারা যেন তার নাম ধরে ডাকছে। চারদিকে খালি কেলো কেলো ডাক—গোটা সভার লোকগুলোই যেন তাকে সন্ধান করে ফিরছে। প্রথমটা সন্দেহ হ'লো বুঝি বা গুইরামের দল—প্রতিযোগীতায় বাজী জিতে তামাসা ক'রতে আসছে তার সঙ্গে। দুঃখ ও অভিমানে কেলোর চোখদুটো ছল ছল করে উঠলো অন্ধকারে। কিন্তু একটু পরেই সেক্রেটারী রাধাকান্তর গলা শুনে কেলো বুঝতে পারলো যে তার মনের

এই সন্দেহ একেবারেই মিথ্যে। তবে কি সে প্রতিযোগীতায় জিতে গেছে! কথাটা মনে করতেও বুকের ভেতরটা টিপ্ টিপ্ করে ওঠে কেলোর। দ্বিধাগ্রস্ত মনে সে শুধু দু এক পা করে সভামণ্ডপের দিকে এগিয়ে যায়।

হঠাৎ তরুণ সঙ্ঘের বিলকুল সভ্য চারদিক থেকে ছুটে এসে কেলোকে ঘিরে একেবারে জয়ধ্বনি দিতে সুরু করে দিলে। কেলো কোন কথা বলবারও ফুরসুৎ পেলো না। সঙ্গে সঙ্গে চ্যাংদোলা করে তুলে ধরে সকলে তাকে একেবারে মঞ্চের ওপর খাড়া করলে।

রায়বাহাদুর বটুকেশ্বর ঘোষ এতক্ষণ পদকটা হাতে করে শুধু কেলোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। সামনে পেয়ে এবার তিনি মেডেলখানা কেলোর গলায় ঝুলিয়ে দিলেন—একেবারে ফার্ষ্ট প্রাইজ।

চোখদুটো আবার ছল ছল করে উঠলো কেলোর। এবার কিন্তু দুঃখে নয়, আনন্দে।

বিজন ভট্টাচার্য্য



সত্যেশ সত্যি সত্যি ডিটেকটিভ হয়ে উঠল।

সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে সত্যেশ, ছাত্র এমন কিছু ভাল নয়। তবে পাশ করে যায় এই পর্য্যন্ত। ধরন ধারণ, চাল চলন ঠিক আর পাঁচটা ছেলের মত। কিন্তু ছাতের কোনের ঘরটিতে ছুটির দিনে সত্যেশ জানলার ধারে যখন প্রভাস বাড়ুয্যের কাহিনী পড়তে শুরু করে, তখন সত্যেশ সম্পূর্ণ আলাদা। প্রভাস বাড়ুয্যের নাম কে না জানে! মসে মাসে একখানা করে বই বেরুচ্ছে প্রভাস বাড়ুয্যের গোয়েন্দাগিরি নিয়ে। কিন্তু সবাই পড়ে গল্প, প্রভাস বাড়ুয্যের অস্তিত্ব ঐ বইয়ের পাতা পর্য্যন্ত—কিন্তু সত্যেশের কাছে প্রভাস বাবু জ্বল জ্বলে সত্যি। মাসের প্রথম দিকে লুকিয়ে কিনে আনা বইটা সত্যেশ শুধু পড়েনা, নিলকমলকে পিছিয়ে দিয়ে, তাড়িয়ে দিয়ে সত্যেশ প্রভাস বাড়ুয্যের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। নিলকমলকে বাদ দিয়ে অবিশ্যি প্রভাস বাড়ুয্যের চলেনা। গোয়েন্দা জগতে নিলকমলের মত সহকারী পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কথা। কিন্তু বেচারা নিলকমল—সত্যেশের কাছে ওর মত হাস্যাস্পদ জীব আর দ্বিতীয় কেউ নেই। ও খুটিয়ে খুটিয়ে ওর কাজ, কথা, ওর সাহসের পরীক্ষা সব পড়ে, তারপর নিজে দাঁড়ায় ওর যায়গায়—প্রভাস বাড়ুয্যে অবাক হয়ে যায়, ঐ

অতটুকু ছেলের এত বুদ্ধি! ছাদের ঘরের কোনটিতে বসে সত্যেশ ভাবে সেই দিনের কথা যেদিন প্রভাস বাড়ুয্যের সঙ্গে ওর দেখা হবে।

কেউ জানে না। একথা কেউ জানেনা। ভাইবোনদের সঙ্গে সত্যেশের ঝগড়া হয়, গৃহশিক্ষকের কাছে বকুনি খায়, স্কুলে পড়া বলতে না পারায় বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে, বাবা উপদেশ দেন, মা সস্নেহ তিরস্কার করেন কিন্তু তারা কেউ জানেনা সত্যেশ মনে মনে ডিটেকটিভ্। বাড়ীর চাকর, ঝি, ভিক্ষা নিতে আসে ভিখিরি, ফেরিওয়ালা হেঁকে যায় কত কিছু—কিন্তু সত্যেশের চোখ কেউ এড়াতে পারেনা মায় ছোট বোনের স্কুলের খাতাগুলি পর্য্যন্ত ও চুপচাপ দেখে রাখে। অবিশ্যি গোয়েন্দার চুপ করে থাকাই নিয়ম—সে সব জানবে, কিন্তু মুখের ভাবে কিছু বোঝা যাবেনা। প্রভাস বাড়ুয্যে ঠিক এই কথাই কতবার বলেছেন নিলকমলকে, সত্যেশ গুণে বলে দিতে পারে, সত্যেশও নিয়মটা মানে, কিন্তু মাঝে মাঝে বাহাদুরির লোভ সামলাতে পারেনা।

খাবার টেবিলে ছোট বোন লিলি আব্দার ধরেছে বাবার কাছে—লিলির ন্যাকামো সত্যেশ একেবারে সহ্য করতে পারেনা—গম্ভীর মুখে বলতে সুরু করে—জানো বাবা, ক্লাস পরীক্ষায় লিলি অঙ্কে পেয়েছে গোল্লা, আর তোমাকে মিথ্যে বলেছে তিরিশ। লিলি যেন আকাশ থেকে পড়ে। ওর মুখটা হয়ে যায় থমথমে, তারপর হঠাৎ হেসে ওঠে, হাসতে হাসতে ও লুটীয়ে পড়ে, কোন রকমে হাসির ফাঁকে ফাঁকে ওর কথা বেরোয়—উঃ বাবা ছোড়দাটা কি মিথ্যেবাদী জানা বাবা ছোড়দা রোজ রোজ ক্লাশে বেঞ্চের উপর দাড়িয়ে থাকে। বাবা এক চুমুক চা খেয়ে জিজ্ঞেস্ করেন, তুমি কি করে জানলে?

—শিউলি বলেছে। শিউলির মেজদা পড়ে ছোড়দার সঙ্গে একক্লাসে। মাগো শিউলির বলার কী ভঙ্গী! মনে মনে লিলি মাথা খুড়ছে মা কালীর পায়ে, হে মা কালী এ যাত্রায় কথাটা চাপা পড়ুক মা—একে বেঁকে হেসে হাত নেড়ে কি রকম করে কথাগুলো বল্লে একক্লাস মেয়ের সামনে—কিন্তু মা কালী কথা শুনলেনা, বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু অঙ্কে তুমি কত পেয়েছ? লিলির মুখটা কালো হয়ে উঠল,—পেয়েছি ত্রিশ; ঠিক ত্রিশ।

—খোকা যে বলছে তুমি শূন্য পেয়েছ। লিলি উঠে দাঁড়াল,—বেশ আমি খাতা এনে দেখাচ্ছি। সত্যেশ চুপ চাপ চা খাচ্ছিল, অপরাধী কখন কি করে ও সব জানে, তাড়া নেই, ধীরে সুস্থে বল্লে—খাতা দেখিয়ে কি আর হবে, খাতায় নিশ্চয়ই ত্রিশ লেখা আছে, কিন্তু লিলি শূন্যই পেয়েছে। সত্যেশের বাবা একটু চটে উঠলেন, খাতায় লেখা রয়েছে ত্রিশ, তুমি কি করে জানলে শূন্য পেয়েছে? সত্যেশ আর সত্যেশ নেই, প্রভাস বাড়ুয্যের মত মুখ টিপে একবার হাসল, তারপর একটু হেঁয়ালি করে বলল,—আমি জানি, তুমি না হয় অঙ্কের দিদিমণির কাছে লিখে জানতে পার।

এত বড় বিপদের একটা আশঙ্কা লিলির হয়নি। ও বেচারা কি করে জানবে সত্যেশ কার শিষ্য, কার কাছে শিখছে গোয়েন্দাগিরি, এবার লিলি একেবারে কেঁদে ভেঙ্গে পড়ল। বাবার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে উঠল ভয়ানক ঘোলাটে। সারাদিন অপিসের খাটুনির পর এ সব কাহাতক সহ্য করা যায়। তিনি চটে উঠলেন সত্যেশের উপর, আর তুমি, তুমি রোজ বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাক? পড়াশুনো আজকাল এই হচ্ছে! লিলি এক ফাঁকে মুখ তুলে যোগ দেয়, হ্যা বাবা রোজ। লিলির মনে মনে তখনও প্রশ্ন ছোড়দাটা জানলে কি করে? আর গোয়েন্দা সত্যেশ হঠাৎ অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হক্‌চকিয়ে যায়। আম্‌তা আম্‌তা করে কি একটা বলতে বলতে বাবা উঠে পড়েন, ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটে ঐখানেই। কিন্তু বেচারী লিলি ঠিক বুঝতেই পারলোনা কি করে সত্যেশ এত গোপনীয় ব্যাপারটা ধরে ফেলল। অঙ্কে শূন্য পেয়েছিল সত্যি, আর শূন্যের পাশে তিন বসিয়ে দিয়ে ত্রিশও করেছিল, তখনত কেউ ছিলনা। কিন্তু সত্যেশের দৃষ্টি যে কত তীক্ষ্ণ, তা লিলি কি করে জানবে—সত্যেশ ওর খাতায় শূন্য দেখেছে, তারপর ত্রিশও দেখেছে বাকিটুকু ওর গোয়েন্দাদৃষ্টিতে ধরা পড়ে গিয়েছে।

সত্যি ভয়ের কথা। চাকর বেটা বাজার থেকে পয়সা সরায়, বছরের কোন মাসে ঠাকুরের বন্ধু কিংবা ভাই বা যেই হোক মরবেই মরবে সব খবর সত্যেশ জানে। তবে এ সব ছোট খাট খবর রেখে কি হবে, এত শুধু হাত পাকানো, চুরি ছ্যাচরামি বন্ধ করতে কে কবে গোয়েন্দা হয়েছে। সে জন্যে পুলিশ ত রয়েইছে। খৈনি-খানেওয়ালারা আর তাদের বাবুরা যেখানে ঘায়েল হয়, যেখানে তাদের বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়, সেখানে ডাক পড়ে প্রভাস বাড়ুয্যের, ডাক পড়বে সত্যেশ বোসের। তবুও চোখ খোলা রাখতে হয়। বাড়ীতে নতুন লোক আসছে, ক্ষতি কি তার নাম ঠিকানা জেনে রাখতে, হোকনা লোকটা বড়দার বন্ধু। একটা নতুন ভিখিরি আসছে দুদিন ধরে লোকটার একটা পা কাঠের, একমুখ দাড়ি, সত্যেশ দুদিন ওর পিছু নিয়েছিল। না লোকটা সত্যিই ভিখিরি, প্রত্যেক বাড়ীতেই যায়, সঙ্গী সাথী কেউ নেই।

ছোট্ট পার্কটায় একটা মেড়ো সন্ন্যাসী এসেছে দিন কয়েক। বেটার সর্ব্বাঙ্গে ছাই মাখা। হাতে পেতলের তাগা, মাথায় জট, ন্যেংটির মত করে একটা দড়ি পড়ে আছে, মুখে বিশেষ কিছু বলে না। স্কুল থেকে ফেরার পথে সত্যেশ দেখে ভিড় জমে উঠেছে সন্ন্যাসীটিকে ঘিরে। ভিড়ের মধ্যে ঠেলে ঠুলে সত্যেশও এসে দাঁড়ায়। লোকটা হাত গুণতে পারে, অনেকেই হাত দেখাচ্ছে। সিকি দুয়ানি পড়েছে অনেকগুলি। সাধুজী বিশেষ কিছু বলে না। দু-একটা কথা—ভাল হবে, মন্দ হবে, চাকরী মিলবে, দুঃখ কেটে যাবে, এই সব। সত্যেশ ফিরে আসে। সন্ধ্যার পর সাধুজি তার লোটা আর ত্রিশূল নিয়ে পার্ক ছেড়ে চলে যায়, আবার ভোরের দিকে এসে বসে ঠিক ঐ জায়গাটিতে। সত্যেশ বুঝতে পারে লোকটা বড় জোর একটা ছিচ্‌কে চোর। তবুও অভ্যাস দোষ,

যারা আসছে, যাচ্ছে তাদের একবার করে ও দেখে নেয়। প্রভাস বাড়ুয্যে বলেছে—রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবে সোজা, যেন কিছু দেখছো না, শুনছো না, কিন্তু চোখে দেখবে সব কিছু, প্রত্যেকটি চেহারার মনের প্লেটে ছবি নেবে। নিলকমল কতটুকু বুঝতে পারে প্রভাস বাড়ুয্যের, সত্যেশ কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে কথাটাকে। অবিশ্যি এখনও ঠিক ঠিক পারে না। কতবার হোঁচট খেতে হয়, কতবার লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ধমক খেতে হয়, কিন্তু তাতে কি, একদিন পারবে, একদিন নিশ্চয়ই পারবে।

সেদিনটা ছুটির দিন, ছাদের ঘরে বসে বসে সত্যেশ পুরোনো বইগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে দেখছিল, এ বই সে বই থেকে একটু আধটু পড়ছিল। ইদানিং সাধুজির উপর সন্দেহ একটু বাড়ছিল সত্যেশের। লোকজন তেমন আসে না, যারা আসে পয়সা দেবার মত অবস্থা তাদের নয়—অথচ সাধুজি কামাই দেয় না—এ যেন একেবারে লোকটির নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি। ঠিক সকাল বেলায় আসবে। আর সন্ধ্যাবেলায় উঠবে। খুনে টুনে নয়ত—সত্যেশ ভাবে—পালিয়ে এসে সাধু সেজে বসে আছে। কিন্তু তাই বা কি করে হয়। পালিয়ে চলার, লুকিয়ে থাকার ধরণ ঠিক এ নয়ত, রোজ এক জায়গায় থাকার কথা নয়,—ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—অথচ আর কী হতে পারে। ডাকাত দলের স্পাই? তা হতে পারে। ওখানে বসে বসে আশে পাশের বাড়ীগুলির উপর নজর রাখে খোঁজ নেয়। সত্যেশ উঠে বসে আর একবার সাধুজিকে দেখে নেয়। ডাকাত দলের স্পাই! সাধুজি বসে আছে নির্ব্বিকার। দুপুরের রোদ ঝড়ে পড়ছে চারদিকে, গাছ তলায়, গাছের কাণ্ডে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে বোধ হয় লোকটা ঘুমিয়েই পড়েছে। লুঙ্গি পড়া একটা লোক কোত্থেকে এসে জুটল। তারপর এল আর একটা সাধু। ঐ একই ধরণের দেখতে, তবে হয়ত একটু ছোকরা বয়সের। সত্যেশের মনে পড়ল বিখ্যাত ডাকাত সোহন শিংএর দলের লোকেরা সাধু সেজে ঘুরে বেড়ায় সারা ভারতবর্ষ। কতবার প্রভাস বাড়ুয্যে নাকাল হয়েছে ওর হাতে—আজও লোকটা ধরা পড়েনি। ওদিকে পার্কে তখন লোক তিনটা বসে কি জটলা করছে, কৈ হাত দেখাচ্ছেনা ত—তারপর তিন জনেই উঠে দাঁড়াল।

সত্যেশের সময় নেই এক মুহূর্ত্ত। এক দৌড়ে নেমে এল নিচে। চট্‌পট্‌ হাফ্‌ সার্ট গায় দিয়ে এক সেকেণ্ড একটু ভেবে নিল, তারপর সুটকেস খুলে কিছু পয়সা, একটা নকল গোঁফ, ছোট্ট টর্চ্চটা আর একটা কালো চশমা নিয়ে জুতাটা পায় গলিয়ে বেড়িয়ে পড়ল। লোক তিনটা তখন পার্ক থেকে বেড়িয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে সুরু করেছে। চশমাটা চোখে দিয়ে সত্যেশ চল্‌ল ওদের পিছু পিছু। বাস্তবিক একটু সন্দেহের ব্যাপার। সাধু বেটা রোজ সন্ধ্যার আগে জায়গা ছেড়ে ওঠেনা, আর আজ কোত্থেকে এল একটা লুঙ্গি পরা লোক, একটা ছোকরা মত সাধু তারপর ফুসফাস কী কথা, তিনজনে বলতে সুরু করল। সত্যেশ মনে মনে একটু হাসল, বেচারারা জানলেও না

ওদের পেছু নিয়েছে কে ? একটু ভয়ও পেল, প্রভাস বাড়ুয্যের রিভলভার আছে, দরকার হলে থানা পুলিশ তাঁকে সাহায্য করে, আর সত্যেশের, গুপ্তিটা অবধি হারিয়ে গিয়েছে দিন কয়েক আগে। কে জানে শেষ পর্য্যন্ত কী হবে ? তবে এটা ঠিক খবর যদি কিছু সংগ্রহ হয়, থানা পুলিশের লোক শেষ পর্য্যন্ত ওকে সাহায্য করবেই। আর যদি সোহন শিংএর দলের মত জাঁদরেল কোন দল হয়, তা হলে ত কথাই নেই। লোক তিনটা হেঁটে যাচ্ছে হন্ হন্ ক'রে। সত্যেশকে রীতিমত বেগ পেতে হয় ওদের চোখে চোখে রাখতে। বড় রাস্তায় এসে লোক তিনটা শ্যামবাজারের বাসে চেপে বসে, সত্যেশও উঠে বসে সেই বাসটায়। দু-একবার কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে ওরা কি কথা বলছে, কিন্তু কণ্ডাকটারের চীৎকারে, আর লোকের গোলমালে, কানে কিছু আসেনা। যতদূর সম্ভব লোক তিনটা বসে আছে চুপ চাপ। শ্যামবাজার থেকে ওরা উঠল দক্ষিণেশ্বরের বাসে, একেবারে দক্ষিণেশ্বরের টিকিট কিনল। সত্যেশ বসেচে ঠিক ওদের সঙ্গে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় কিছু বোঝা গেল না। যা একটু আধটু কথা ওরা বলল তা এমন জড়ান, আর এমন জমকালো হিন্দী যে সত্যেশ ঠিক বুঝতে পারেনা। অবিশ্যি প্রভাস বাড়ুয্যের কথা আলাদা। ভারতবর্ষের এমন ভাষা নেই যা প্রভাস বাড়ুয্যে জানেনা, এমন জাতি নেই যাদের চালচলন, ধরনধারণ তার জানা নেই। সত্যেশ প্রভাস বাড়ুয্যে নয়, তার শিষ্য মাত্র। জানে শুধু বাংলা ভাষা, ইংরেজী হয়ত বুঝতে পারে। আর ভাঙ্গা হিন্দী কোন রকমে বলতে পারে। সত্যেশ মনে মনে ঠিক করে, এবার নিশ্চয় আর কিছু না হোক হিন্দী শিখে ফেলবে, এ যাত্রায় না হয় দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত দৌড়, কিন্তু বলা যায় না, অপরাধীকে অনুসরণ করতে কোথায় না কোথায় যেতে হয় তার ঠিক কি ?

আলমবাজারে বাস্টা প্রায় খালি হয়ে যায়। সত্যেশের একবার বাড়ীর কথা মনে হয়। বাড়ীতে সব ঘুমিয়ে, ঘুম থেকে উঠে একবার আধবার সত্যেশের খোঁজ হয়ত পড়বে, কেউ ভাবতেও পারবেনা, সত্যেশ কোথায় কি করছে। লোকগুলি এবার নিচু গলায় কথা বলতে সুরু করেছে, লুঙ্গি পরা লোকটি চুপ করে একটা বিড়ি খাচ্ছে। সত্যেশের এত পাশাপাশি বসা ঠিক হয়নি। ওরা অবিশ্যি কিছু সন্দেহ করেনি, তবুও এতক্ষণ বসে থাকলে চেহারার একটা ছাপ ওদের চোখে থেকে যাবেই। পকেটে গোঁফটা আছে এই যা রক্ষা। আর চোখে রয়েছে চশমা, কালো চশমা, চেহারাটা যাহোক্ কিছু ঢাকা পড়েছে। বাসটা ফাঁকা রাস্তায় ছুটে চলেছে হুহু করে।

দক্ষিণেশ্বরে বাস্টা এসে দাড়ায়। রেলের ব্রীজের তলা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সাধু দুটো সোজা যায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে, আর লুঙ্গি পরা লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। সত্যেশের মনটা একটু দমে যায়। তার অভিযান কি ঐ মন্দির পর্য্যন্ত। সাধু দুটো হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তীর্থ দর্শন করতেই এসেছে। অবিশ্যি হাল সে ছাড়েনা ! গঙ্গার ঘাটে ওরা বসে, বসে সামান্য কিছু খাবার খায়, একবার মন্দিরের দিকে চেয়ে দক্ষিণেশ্বরীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম

করে আসে। সত্যেশ আছে ওদের কাছাকাছি। তারপর মন্দির থেকে বেড়িয়ে আবার হন্ হন্ করে হাঁটতে সুরু করে। গেটের ধারে সঙ্গ নেয় সেই লুঙ্গি পরা লোকটা। মন্দিরের রাস্তা ছাড়িয়ে ওরা বাঁদিকের বড় রাস্তাটায় পড়তেই সত্যেশ বুঝতে পারে এখন থেকে তাকে সাবধানে চলতে হবে, রাস্তাটা বড় ফাঁকা, কচিৎ দু একটি পথ যাত্রী, মাঝে মাঝে দু একটা ঘোড়ার গাড়ী, আর ঝড়ের মত হঠাৎ ছুটে যায় একটি দুটি লরী,—তাছাড়া রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা। চশমাটা খুলে সত্যেশ পকেটে রেখে দেয়। গোঁফ জোড়ায় একবার হাত দিয়ে দেখে, তারপর আবার রেখে দেয়, পরে দেখা যাবে।

রাস্তার ধারে একটা পোড়ো বাগান বাড়ী। তারই ভেতর লোক তিনটে ঢুকে পড়ে। কত কালের পুরানো বাড়ী, বাইরের দেয়াল ধসে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। গেট ভেঙ্গে গিয়েছে, বাগানের পাথর মূর্ত্তি গুলিও ভেঙ্গে গিয়েছে। এবার সত্যেশ সত্যি সত্যি একটু সমস্যায় পড়ে। বাইরে বসে থাকবে না সাহস করে ভেতরে গিয়ে ঢুকবে। একেবারে চট্ করে ভেতরে ঢুকতেও সাহস হয় না। প্রভাস বাড়ুয্যে কি করত এরকম অবস্থায়।—ঠিক কি করত? সত্যেশ বুঝতে পারে না। নিজেই বুদ্ধি করে রাস্তাটায় আস্তে আস্তে চলতে সুরু করে। রাস্তার ধারে একটা গাছের গায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। পকেট থেকে গোঁফ জোড়াটা একটু নাড়া চাড়া করে, তারপর গোঁফটা পরে ফেলে।

ধুত্তোর, কতক্ষণ দাড়িয়ে থাকবে! বিকেল হয়ে আসছে। খিদেও পেয়েছে। লোকগুলির কোন পাত্তা নেই। সাহস করে ঢুকে পড়ল বাগান বাড়ীটায়। বাড়ী খানা দোতালা। একতলার ঘরগুলো খোলা পড়ে আছে। বাড়ীর পাশ দিয়ে একটা বাঁধানো, এককালে বাঁধানো গলি সোজা গিয়ে গঙ্গায় পড়েছে। সত্যেশ একবার গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত ঘুরে এল। তারপর চল্ল দোতালার দিকে পা টিপে টিপে। ওপরের একটা ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে কথাবার্ত্তার আওয়াজ। ঠিক বারান্দার উপরেই ঘরখানি, পাশেই একটি ছোট কোঠা। দরজাও খোলা, সাহসে ভর করে সত্যেশ ঢুকে পড়ল ঘরটায়। পাশের ঘরটিতে যাবার একটা দরজা আছে। দরজাটা ভেজান। চুপ করে কান পেতে সত্যেশ নিঃশ্বাস সম্বন্ধেও সাবধান হয়ে যায়। সত্যেশ আন্দাজ করে অন্ততঃ পাঁচ সাতজন লোক ত নিশ্চয়ই বেশী হতেও পারে। কিন্তু যা ওরা বলছে তা বেশীর ভাগই অবোধ্য, দু-একটা কথা বুঝতে পারে—

—"নেহি হোলো।"

—"যানে দাও ভাই যানে দাও।"...হঠাৎ সত্যেশ কান খাড়া করে, শোনে ভাঙ্গা গলায় কে যেন বলছে "কই আদমি ত নেহি আয়া।"

—"নেহি।"

—"দেখা তুম্।"

—"জরুর।"

—"লেকিন এক লেড়কা আয়া থা।"

—"উসকো বাত ছোড় দো ভাই, যানে দো উসকো"

—"কাহে? লেড়কা আদমি নেহি হ্যায়"

—"জরুর উয়ে ভি আদমি হ্যায়—লেকিন বাত হ্যায় কেয়া। উ লেড়কা মন্দিরসে বাহার নেহি আয়া।"

—তোম হ্যায় এক ব্যকুফ্। সত্যেশ মনে মনে শিহরিয়া ওঠে। তারপর পা টিপে টিপে বাহিরের দিকে যেতে থাকে। সেই ভাঙ্গা গলার লোকটা তখনও বলছে,

—যাও অভি দেখো, সব কোই কামরা ঢুড়কে দেখো।

বারান্দাটা পার হতে পারলেই সত্যেশ লম্বা ছুট দেবে। কিন্তু বারান্দায় পা দিতেই, লুঙ্গি পরা লোকটার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। সত্যেশের মত লোকটাও থমকে যায় যায় একমুহূর্ত্ত। তারপর বিশ্রী একটা গালাগাল দিয়ে একেবারে ঝাপিয়ে পড়ে ওর উপর। শব্দ শুনে ঘর থেকে আরও লোক বেরিয়ে আসে, কেউ কিল, কেউ চর, কেউ দেয় চুল ধরে টান, আর গালাগালটা দেয় সবাই, তারপর টানতে টানতে ওকে ঘরের ভিতর নিয়ে আসে। গোঁফটা একদিকে ঝুলে পড়েছে, জামাটা ছিঁড়ে গিয়েছে, একটা চোখ গিয়েছে বুজে। কান দুটো ফুলে ঢোল, আর গলাটার উপর ফুটে উঠেছে হাতের আঙ্গুলের ছাপ। এতক্ষণ ওর গোঁফটার দিকে নজর দেয়নি কেউ। এবার ঝুলে পড়া গোঁফটা চোখে পড়ে সবার। অতগুলো লোক একসঙ্গে হেসে ওঠে। কে একজন মাথায় একটা চাটি দিয়ে ওকে বসিয়ে দেয়। আর একজন গোঁফটা প্রায় নাক সুদ্ধ টেনে ফেলে দেয়। ঘরের ভেতর প্রায় দশ পনর জন লোক, বেশীর ভাগই সাধুবেশ। পার্কের সাধুটিও আছে ওদের সঙ্গে। ভাঙ্গাগলা লোকটার বেশ পালোয়ান চেহারা। বোধ হয় এদের সর্দ্দার হবে, সেই প্রথম প্রশ্ন করে—তোর নাম কি আছে রে? সত্যেশের গলায় ওর নিজের নামটাও আটকে যায়। দু একবার ঢোক গিলে বলে—বীরেশ।

—এখানে তোকে আসতে বোলেছে কোন্।

—কেউ না। আমি নিজেই এসেছি। ভাঙ্গাগলার লোকটা আর সবার দিকে তাকায়। —মন্তব্য করে বহুৎ বদমাস হো এ লেড়কা। তারপর চুল টেনে একটা ঝাকুনি দেয় আবার বলে,—তব্ তুম নাম নেহি বাতাওগে, ভোর ভাল হবে। ভদ্দর লোকের ছেলে হবে তুম্, নাম বোল দাও, আভি ছোড় দেগা।—কিন্তু সত্যেশ নাম বলে কার, দু একবার মনে

হয় প্রভাস বাড়ুয্যের নাম, কিন্তু সাহস করে বলতে পারে না। ভাঙ্গা গলার লোকটা একটা হাঁক দেয়—আবদুল ইয়ে আবদুল, উস্ কামরে পর বদমাস কো, সারারাত ওখানে আটক থাকতে হোবে তোকে, কাল দেখে লিব।

একতলার একটা ছোট্ট কোঠায় আবদুল সত্যেশকে রেখে বাইরে থেকে শিকলি দিয়ে চলে যায়। সত্যেশের মনে হয় ও গলা ছেড়ে কাঁদবে। ওর পা টল্‌ছে, মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। কনুইয়ের খানিকটা ছিঁড়ে গিয়েছিল জ্বলুনি থামতে চায় না। একটা চোখ বন্ধ। আর একটা চোখে জল—ভাল দেখতে পায় না। মেঝেটায় বসবার উপায় নেই, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, দাঁড়িয়ে থাকার মত অবস্থা তখন নয়—সারা দুপুর গিয়েছে ছুটোছুটিতে, বিকেলে খাওয়া হয় নি কিছু। তেষ্টাও পেয়েছে—আর এখান থেকে যে কি করে বেরোবে? হঠাৎ যেন চম্‌কে ওঠে সত্যেশ, ওকে যদি ওরা মেরেই ফেলে, কি করতে পারে সত্যেশ,—বলবে প্রভাস বাড়ুয্যে ওকে পাঠিয়ে ছিল—ধুত্তোর প্রভাস বাড়ুয্যে, নিকুচি করেছে প্রভাস বাড়ুয্যে আর নিলকমলের। বাড়ীর কথা মনে হয় আবার, বাড়ীর কথা মনে হতেই সত্যেশ কেঁদে ফেলে। সিঁড়িতে গোলমালে বুঝতে পারে লোকগুলি বেরিয়ে যায়। একবার ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে বলে—ওগো আমি গোয়েন্দা নয়। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। আর তাছাড়া কেই বা শুনবে ওর কথা।

ছোট্ট কোঠাটিতে একটি মাত্র জানালা, তাও গরাদ দেওয়া, জানালা দিয়ে দেখা যায় পাশের একটা ঘর। বেশ বড় ঘর আর তার দরজাটা খোলা—ঐ দরজার পরেই বাগান। কোনরকমে যদি যাওয়া যেত ঐ ঘরটাতে।—এখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গলা চিরে গেলেও কে শুনতে পাবে ওর কথা? বাইরে সন্ধ্যার আঁধার ঘন হয়, নির্জ্জনতা আর নীরবতা আরও যেন বেড়ে যায়। সত্যেশ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। চামচিকের নাদিতে মেঝেটা বোঝাই, তার উঁপর ধূলো জমেছে এক হাঁটু। তারই পরে বসে পড়ে। মেঝেটায় উঠছে দুর্গন্ধ। মাথার উপর হঠাৎ কি যেন ঝাপ্টা দিয়ে উড়ে যায়। সত্যেশ চমকে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, কি যেন একটা উড়ছে কালো মত, একটা নয় দুটো—অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ও দুটো কি উড়ছে। প্রভাস বাড়ুয্যের বইয়েতে কোথাও এমন কথা ত লেখা নেই। নিলকমল কোনদিন ঠিক এই অবস্থায় পড়েনি। দূর থেকে একটা শেয়াল ডেকে ওঠে, একটার পর একটা, মনে হয় দেশশুদ্ধ সবলোক একসঙ্গে ডাক্‌ছে। বাড়ীতে মা, লিলি, বাবা, বড়দা কি ভাবছে এতক্ষণ সবাই! দুর্গন্ধপূর্ণ মেঝেয় বসে দেওয়ালে মাথাটা ঠেস দিয়ে সত্যেশ ভাবতে থাকে বাড়ীর কথা। কখন ফিরবে, মোটেই ফিরতে পারবে না। মা কাঁদবে। লিলি রাক্ষুসিটাও কাঁদবে, স্কুলের সঙ্গীরা বলবে, সত্যেশের কি হলরে? ওরা কেউ জানবেওনা,

সত্যেশের কি হল, কি হতে পারে। কোন দিন কেউ জানবেনা। সত্যেশ মোটেই সত্যেশ নয়। সত্যেশ ছিল একজন গোয়েন্দা। প্রভাস বাড়ুয্যের শিষ্য। ভাবতে ভাবতে সত্যেশের ঘুম পায়। দু-একবার ঘুমের ঝোক্‌টা সামলে নেয়। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

চীৎকার। একটা অদ্ভুত চীৎকারে সত্যেশের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চম্‌কে ওঠে। কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে বুঝে উঠতে পারে না, চীৎকারটা কোত্থেকে এল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল, বিদ্‌ঘুটে একটা স্বপ্ন। সোহন শিং এর দল পালিয়ে যাচ্ছে। আর সত্যেশ ছুটছে পেছনে পেছনে। হঠাৎ কোত্থেকে কে যেন বিদ্‌ঘুটে হাঁক দিয়ে উঠ্‌ল। তারপর ওর ঘুম গেল ভেঙ্গে। চীৎকারটা স্বপ্নের না বাইরের কেউ চীৎকার দিয়েছে সত্যেশ ঠাহর করে উঠতে পারে না। কিন্তু একটা অদ্ভুত ভয় যেন ছেয়ে আসে। ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর এক ছুটে দরজাটার গায় গিয়ে ধাক্কা দেয়। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দরজাটার গায় ঠেসান দিয়ে। হঠাৎ কি হয়। দরজাটাতে পাগলের মত টান দেয়। প্রাণপণ শক্তিতে ও টানতে থাকে···দমকা হাওয়ার মত এক ঝটকায় দরজাটা খুলে আসে শিকলি শুদ্ধ।

বাড়ীতে পৌঁছতে রাত হয়ে যায় বারোটারও বেশী। সমস্ত বাড়ীটা একেবারে নিঝুম। যেন কেউ নেই ও বাড়ীতে। দরজা খুলে দেয় পুরোনো চাকর মথুয়া—তারপর সুরু হয় এক হৈ হৈ ব্যাপার। ঝি, চাকর থেকে সুরু করে মায় মেনি বেড়ালটা অবধি সব এসে জড়ো হয়। বড়দার রাগটাই সব থেকে বেশী। পাঁচ সাতবার থানায় যেতে হয়েছে তাকে। মা কেঁদে ফেলেন ওর চেহারা দেখে। লিলিটা হেসে ফেলে। বাবা গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করেন, কোথায় গিয়েছিলে? মা ওকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্নটা চাপা দিয়ে দেন— থাক্‌ থাক্‌ ওসব কথা এখন থাক। লিলি কানে কানে বলে—চিলকোঠায় তোমার বই আমি সব বড়দাকে দিয়ে দিয়েছি। সত্যেশ চম্‌কে ওঠে। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, কি করে জানলে তুমি?

—আজ দুপুরে তোমাকে পড়তে দেখেছি।

বড়দা একটা হুংকার দেন—যত ছাই ভস্ম এখন থেকেই পড়া হচ্ছে। কার কথায় ডিটেকটিভ নভেল পড় তুমি।

মা বলেন—থাক্‌ থাক্‌ ওসব কথা এখন থাক। কিন্তু বড়দার রাগ পড়েনা। পরদিন বইগুলি তিনি পুড়িয়ে দেন।

শান্তি রায়



রাজা

খরস্রোতা নদী যেখানে জঙ্গল কেটে ভৈরব বাঁক নিয়েছে সেইখানে সবুজে হলদেয় মেলানো লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর থাকে রাজা। জায়গাটা ঠাণ্ডা সবুজ, সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে সুঁদূরীর জঙ্গল আকাশে মাথা তুলে এগিয়ে গেছে। সেই বনে চরে বেড়ায় হরিণের পাল। কত রকমের পাখী সকালে আর সন্ধ্যেয় কলরব তোলে জঙ্গলের মাথায়। কেয়ার উন্মত্ত গন্ধে মাতিয়ে তোলে বন।

রাজা শিকারী বাঘ—জঙ্গলের সম্রাট। সোনালী হলদে তার গায়ের রঙের ওপর কালো কালো লম্বা ডোরা। নিজের শক্তিতে তার যেমন অগাধ বিশ্বাস কৌশলী বুদ্ধিতেও তেমনি। ওদিকের গরাণের জঙ্গলের পাঁকে থাকে গণ্ডার, তাদের সে ঘাটায় না। জলের রাজা কুমীরকেও সে এড়িয়ে চলে। আর সব জানোয়ার ত তার হাঁকে ওঠে বসে।

নদীময় এই বিস্তৃত বনভূমির ওপর সৃষ্টির প্রথম দিনের ঐশ্বর্য্য নিয়ে সূর্য্য ওঠে। পাখীর কাকলীতে তখন কান পাতা যায় না। আর বনের পাতায় পাতায় হাওয়ায় আলোয় ফিস ফিস করে কথাবার্ত্তা চলতে থাকে। রাজা তখন নিঃশব্দে এগোয় দীর্ঘ ঘাসের আড়ালে আড়ালে—মখমল জোড়া পায়ে তার একটুও আওয়াজ হয় না, ঘাসের ডগায় সামান্য একটু সুইস সুইস শব্দ ছাড়া। কিছুই বোঝা যায় না যে বাঘ বেরিয়েছে তার প্রাতরাশের সন্ধানে।

একটা বুনো শুয়োরের দল তখন ছানা পোনা নিয়ে নদীতে জল খেতে নেমেছে। দাঁতাল ধাড়ী শুয়োরটা পাড়ে পাহারায় আছে। শুয়োরের দল গোঁয়ার— ধরাকে সরা জ্ঞান করে। বিশেষতঃ দাঁতাল ধাড়ীগুলোর ত কথাই নেই। দূরে ঘাসের ভেতর থেকে রাজা অদৃশ্য অনুভূতির সাহায্যে তাদের অস্তিত্ব অনুভব করে, পায়ের গতি বাড়িয়ে দেয়। আর ঘাসের ঝোপ যেখানে অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেছে, জমি গড়িয়ে গিয়ে নেমেছে নদীতে সেইখানটায় এসে রাজা থমকে দাঁড়ায়। অদ্ভুত একটা পরিবর্ত্তন হয়ে যায় তার। তখন তার ঠোঁট গেছে গুটিয়ে, তীক্ষ্ণ বড় বড় দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে, কান তুটো পেছন দিকে চ্যাপ্টা হয়ে মাথার সঙ্গে লেপ্টে গেছে আর লেজটা চাবুকের মত এপাশ ওপাশ করে তুলছে। শরীর ধনুকের মত বেঁকে সটান। শান্ত বন কাঁপিয়ে অকস্মাৎ একটা তুর্দ্দান্ত হুঙ্কার! রাজা লাফিয়ে পড়েছে বুনো শুয়োরটার পিঠের ওপর। কয়েক মুহূর্ত্ত একটা সম্মিলিত ক্রুদ্ধ গর্জ্জন, তারপর সব চুপচাপ। শুধু ঘাসের ভেতর থেকে ভেসে আসে মড়মড় মড়মড় হাড় চিবোনোর শব্দ। বাঘ মশাই প্রাতরাশ করছেন। ব্যস তারপর সারাদিন আর তার শিকারের প্রয়োজন নেই। প্রবল বাঘ অকারণ হত্যা করে না।

*   *   *   *

কোনও কোনও দিন এপারের বনের একঘেয়েমী কাটাবার জন্যে নদী সাঁতরে ওপারে চলে যায় রাজা। তার বন ছেড়ে দূর কত দূর। সে যেন তখন এক আবিষ্কারক, অজানা পৃথিবীকে জানতে বেরিয়েছে। নদীর ওপারে জঙ্গল ক্রমশঃ ফাঁকা হয়ে আসতে থাকে। নালার ঘাসের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে চুপি চুপি এগোয় সে। হঠাৎ জঙ্গল শেষ হয়ে যায়। তারপর ফাঁকা মাঠের পর মাঠ। মাঝে মাঝে ধান ক্ষেতের আড়ালে গা ঢাকা দেওয়া যায় কিন্তু এটা কেমন জগৎ? আর ওই মাঠে ওগুলো গরুর পাল না? রাজা লোভী চোখে গরুর পালের দিকে তাকিয়ে থাকে। সূর্য্য তখন নদীর রক্ত জলে অস্ত যায়। আর সেই উদাস সন্ধ্যার উদাত্ত স্তব্ধতায় ঘরমুখো গরুর পালের গলার ঘণ্টাগুলো বাজতে থাকে ঢং! ঢং! ঢং! ঢং।

একবার হোল কি! এক সন্ধ্যায় পড়বি ত পড় এক তুপেয়ে জানোয়ারের মুখোমুখি। যথারীতি রাজা তার পরিচিত নালাটা বেয়ে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে। এখন সেদিন এক চাষা সেই নালায় প্রকৃতিদত্ত একটা কাজ সারতে বসেছিল। হঠাৎ মুখোমুখি তুজনে তুজনার। বদনা হাতে চাষার সে কি লাফ। আর রাজা ভাবল তুপেয়ে একি জানোয়ার রে বাবা। আর নিমিষে চাষা দৌড়ল একদিকে আর লেজ তুলে উল্টো দিকে রাজা। সে তখনও মানুষকে চেনেনি, মানুষের স্বাদ এবং স্বভাব তখনও তার অজানা।

*　　　*　　　*　　　*

নদীর পাড়ে কাদার ভেতর থাকে কুমীর নিথর নিস্পন্দ। কিন্তু নদীর জলে জীবন্ত বা মৃত কোন জানোয়ারই তার দৃষ্টি এড়ায় না। একদিন সন্ধ্যায় সূর্য্য তখন আবীর মাখা জলের উপর ঢলে পড়েছে। অনেক দূরে কুমীর দেখতে পেল কালো একটা কুটোর মত কি যেন ভেসে চলেছে। একটা মরা মহিষ না? সড়াক করে পিছলে জলে নেমে পড়ে সে। আর মহিষটার মৃত দেহ যখন ভাসতে ভাসতে স্রোত কাটতে ওপার থেকে এই পাড়ে এসে লেগেছে একটা চকিত বিদ্যুতের গতিতে এসে কুমীর মহিষটার একটা পা কামড়ে ধরে টান লাগায়! সঙ্গে সঙ্গে বন কাঁপিয়ে একটা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ওঠে। ওপারের লোকালয় থেকে ছিটকে আসা একটা মহিষকে শিকার করে পিঠে ফেলে রাজা সাঁতরে এপারে আসছিল। হঠাৎ শিকার বুঝি হাত ছাড়া হয়। কিন্তু সে তখন ডাঙ্গায় পৌঁছে গেছে। নিমেষে মহিষের কাঁধটা কামড়ে ধরে প্রচণ্ড টানে হিড় হিড় করে শিকার সে টেনে তোলে ডাঙ্গায়। ওদিকে মুখের শিকার ছাড়বার পাত্র কুমীরও নয়। বাঘের প্রচণ্ড টানে শিকার কামড়ে থাকা অবস্থায় কুমীরও উঠে আসে ডাঙ্গায় এবং প্রচণ্ড একটা কাঁটাওলা লেজের ঝাপটা সজোরে এসে বাঘের মাথায় পড়ে। সে ঝাপটায় কাবু হয়ে যেতো অন্য জানোয়ার। কিন্তু রাজা কেঁদো বাঘের বাচ্ছা। যেমন করে পাগলা মোষ মাথা নীচু করে এসে শত্রুকে ঢুঁ মেরে পেড়ে ফেলে তেমনি এক প্রচণ্ড ঢুঁ'এ কুমীরকে চিৎ করে ফেলে রাজা। আর তীক্ষ্ণ দাঁতে কুমীরের পেটের নরম মাংস ফালা ফালা হয়ে যায়। প্রচণ্ড এক শক্তিতে বাঘের মাথায় লেজের বাড়ি মেরে উল্টে যায় কুমীর। এক প্রচণ্ড হাঁ করে হড়কে জলে নেমে তীব্র গতিতে সে পালাতে থাকে। বাঘের শক্তির পরিচয় সে পেয়েছে। কুমীরের রক্তে নদীর জলে লাল একটা রেখা বয়ে চলে। ওদিকে রাজার জয়ের গর্জ্জনে বন গম গম করতে থাকে।

*　　　*　　　*　　　*

এ সব যৌবনের কাহিনী। এরপর বহুযুগ কেটে গেছে। পুরানো গাছের দলের বাকল গেছে শুকিয়ে, নতুন গাছের সরল রেখা মাথা তুলে উঠেছে আকাশে। সুঁদুরীর বনে শরীরে পেশীর ঢেউ খেলিয়ে ঘুরে বেড়ায় নতুন বাঘেরা। হয়ত বা তারা রাজারই বাচ্ছা। রাজা বুড়ো হয়ে গেছে। এখন আর তার শিকার জোটা ভার। দাঁতাল বুনো শুয়োরগুলোকে এখন সে ভয় করে, হরিণের দ্রুত গতির সঙ্গে আর পেরে ওঠে না। তাই তাকে তার প্রিয় পরিচিত বন ছাড়তে হোল। পেটের

দায়ে নদীর ওপারে চুপেয়ে জানোয়ারদের আড্ডার কাছে ধানক্ষেতের পাশে একটা নালায় আশ্রয় নিল রাজা। শক্তি চলে গেছে, ধূর্ত্ততাই তখন সম্বল। প্রথমে দু' একটা গরু তারপর একদিন একটা দুপেয়ে মানুষকেই শিকার করে বসল রাজা। দুপেয়ে জানোয়ারগুলো শিকার করা কি সহজ আর তাদের নোনা রক্তের কি অদ্ভুত স্বাদ।

লোকালয়ে তখন হৈ চৈ পড়ে গেল! বাঘ! বাঘ! বদমাইস বাঘ, ধূর্ত্ত পাজী, সব মেরে ছারখার করে দিল। তারাও জানে না যে প্রবল পরাক্রান্ত বাঘকে আজ বার্দ্ধক্যে পড়েই হানা দিতে হয়েছে গাঁয়ে।

সেদিন নিশুতি রাত। গাঁয়ের পাশে ধানক্ষেতের ধারে একটা ছাগলছানা অনবরত চীৎকার করে চলেছে। সেই ডাক অনুসরণ করে নালার ভিতর নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে চলেছে রাজা। ওইত, ওইত দেখা যায়। সহজ শিকার। আকাশের খণ্ড মেঘ ঢেকে ফেলে এক মুহূর্ত্তে তারার দল। ছাগলছানাটার ডাক তীব্রতর হয়ে ওঠে। তারপরে মেঘ উড়ে যায়, নিঃসঙ্গ পৃথিবীর ওপর জ্বল জ্বল করে তারার দল। এক লাফে ছাগলছানাটার ওপর লাফিয়ে পড়ে রাজা আর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের ভয়ঙ্কর একটা শব্দ আকাশ কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। প্রথমটা কি যে হোল বুঝতে পারেনা রাজা! তারপরে তার শরীর বেয়ে অদ্ভুত একটা শিহরণ বয়ে যায়। ক্রুদ্ধ লাফাবার ভঙ্গীতে বসে পড়ে মৃত্যুকাতর চীৎকার করে ওঠে সে, পরমুহূর্ত্তে তার নিজের শিকারের ওপরেই লুটিয়ে পড়ে। জীবনের শেষ স্পন্দন লেজটা তার চাবুকের মত একবার এপাশে আর একবার ওপাশে পড়তে থাকে তারপরে কাঁপতে কাঁপতে থেমে যায়।

সুকুমার দে সরকার

অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর সৌজন্যে]



অনুবাদ সাহিত্য



আলসেমিতে বিকুর জুড়ি মেলা ভার। কিছুতেই তার মন বসে না। লেখাপড়া বল, গান-বাজনা কি খেলাধুলো বল বিকুর কাছে সবই সমান। দাও একটা অঙ্ক—বিকু ভাববে—এখন ত সকাল। ভাল লাগছে না অঙ্ক করতে। বিকেলে ঠিক তৈরী করব। বিকেল আসে যেই, তখন ভাবতে বসে—কাল করব। হ্যাঁ, দেখে নিও। কাল অঙ্ক তৈরী করবোই। এমনি করে কত কালই যে আসে। বিকুর অঙ্ক আর তৈরী হয়না। এই হচ্ছে বিকুর স্বভাব। সময় ত আর পালিয়ে যাচ্ছেনা। এক সময় করলেই হল কাজ। তাড়াহুড়ো করে লাভ কি? বিকুর মনের ভাবখানা এই রকমের অনেকটা। এই স্বভাব নিয়েই কোন রকমে উঠল থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত।

সেদিন ইস্কুলের বেলা হয়েছে। যাই যাচ্ছি করে দশ মিনিট দেরী হয়ে গেল বিকুর। ছুট—ছুট। হাঁপাতে হাঁপাতে বিকু এসে দাঁড়াল ইস্কুলের গেটের সামনে। কপাল বেয়ে টসটস করে ঘাম ঝরছে তার। কয়েক সেকেণ্ড গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে দম জিরিয়ে নিল বিকু। তারপর পা বাড়াল গেটের ভিতরে।

—কিস্‌কো মাংতা আপ?

কিস্‌কো মাংতা? বিকু থমকে দাঁড়াল।

ইস্কুলের দারোয়ান পথ আটকেছে তার! আর হঠাৎ এই অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসেছে।

—কাউকে না। – ক্লাসে যাব।

—আভি হুকুম নেহি হ্যায়।—দারোয়ান জবাব দিল।

এবার বিকু চটে উঠল—ক্লাসে যাব তার আবার হুকুম কি? হঠাৎ নিয়ম বদলাল নাকি?

– হাঁ, বাবুজি—আপনি ভিজিটিং রুমে বসিয়েন, হামি শ্লিপ আনতেছি। – দারোয়ান চলে গেল।

ভিজিটিং রুমে বসে বিকু ভাবতে লাগলো-এ আবার কি? এতদিন ধরে পড়ছে, কোনদিনত তার শ্লিপের দরকার হয় না। আর তাকে ত দারোয়ান ভালো করেই চেনে। ইস্কুলের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী বকসিস দারোয়ানকে বিকুই দেয়। আজ এই অদ্ভুত আচরণ। —বিকু কিছু বুঝে উঠতে পারল না। নতুন কোন আইন হল নাকি? দারোয়ান ফিরে এল।

—এই শ্লিপমে লিখিয়ে দিন, বাবুজি, আপনা নাতিকো নাম।

– নাতিকো নাম? বিকু লাফিয়ে উঠল। পাগল হয়ে গেছে তাদের ইস্কুলের দারোয়ানটা? বিকু চেঁচিয়ে উঠল—ইয়ার্কির জায়গা পাওনি আর। তোমার নামে নালিশ করব আমি। মজা বার করে দেব তোমার।

দারোয়ান একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল—হামি কি অন্যায় কথা বলিয়েছি বাবুজি। আপনি চটতেছেন ক্যান?

—চটবনা? – বিকু ঝাঁঝিয়ে উঠল – আমার নাতি আসবে কোত্থেকে? আমার নাতি আছে নাকি?

—তবে কার জন্যে আসিয়েছেন? নামটা আউর ক্লাসটা লিখিয়ে দিন হোয়ে যাবে। হামি ডাকিয়ে আনছে।

—কার জন্যে আবার? আমিইত এই ইস্কুলে পড়ি। থার্ড ক্লাসে। – বিকুর কথা শেষ হবার সংগে সংগেই হোহো করে হেসে উঠল দারোয়ান। হাসতে হাসতে প্রায় লুটিয়ে পড়ে আর কি। তারপর হাসির বেগ একটু কমিয়ে দারোয়ান বললো—আপনি পড়েন থার্ডক্লাসে? এতনা বুড্‌ঢা বয়সে? মাথার আপনার ঠিক আছে তো বাবুজি?

—বুড্‌ঢা বয়স? চমকে উঠল বিকু। বলছে কি লোকটা। অজানতে হাতটা তার মুখে এসে লাগল। আবার চমকে উঠল বিকু। নিজের চোখকে যেন সে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেনা। আতঙ্কিত চোখে দেখল—তার মুখে ইয়া বড় বড় দাড়ি। রবীন্দ্রনাথের দাড়ির চেয়েও সাদা। চোখে তার চশমা। গায়ে কোট হাতে লাঠি। ঠিক বুড়ো ঠাকুর্দার মত।

হঠাৎ আশীবছরের বুড়ো হয়ে গেছে বিকু। নিজেকে চিনে উঠতে পারছেনা কিছুতেই। সেই ইস্কুল, তার চেয়ে চল্লিশ বছরের বড়ো দায়োয়ান, বাড়ীঘর সব যেমন তেমনিই আছে।

মাঝ থেকে তারই—একমাত্র বিকুরই এই অবস্থা। ব্যাপার কি? স্বপ্ন দেখছে নাত সে? বিকু কেঁদে ফেলল। একছুটে বেরিয়ে এল ইস্কুলের কম্পাউণ্ড থেকে।

রাস্তায় চলতে চলতে একবার মনে হল বিকুর—আচ্ছা যদি মাও না চিনতে পারেন তাকে। তাহলে? তাহলে কি হবে? কান্নার তোড়ে গলা তার বুজে এল।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলেন মা নিজেই। সামনে দাঁড়িয়ে বিকু—বাতাসে তার দাড়িগুলো একটু নড়ছে, চোখে তার জল···ফেটে পড়ে আর কি।

সামনে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখতে পেয়ে মা একগলা ঘোমটা টেনে দিয়ে দরজার একপাশে সরে দাঁড়ালেন; নীচু গলায় বললেন···কাকে চান আপনি?

—কাকে···মানে....আমাকে চিনতে পারছ না? স্থিরদৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় প্রশ্ন করল বিকু।

—নাত। চিনতে পারছিনা।

বেচারী বিকু। কথা না বলে নেমে পড়ল রাস্তায়। হাঁটতে লাগল আপন খেয়ালে।

বিকু হাঁটছে ত হাঁটছেই। আর ভাবছে নিজের মনে—তার চুল পেকেছে, দাড়ি পেকেছে একটু কুঁজো হয়েও হাঁটতে হচ্ছে তাকে। চোখেও তেমন জোর পাচ্ছে না সে। যেমন করেই হোকনা কেন সে যে বুড়ো হয়ে গেছে সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহই নেই আর। সে বুড়ো হয়ে গেছে কিন্তু দিন কাটবে কেমন করে তার? তার মা নেই, ভাই নেই—কেউ নেই তার সংসারে। বুড়োদের নাতি নাতনি থাকে, ছেলে মেয়ে থাকে, তার ত কিছুই নেই—কেউ নেই। সাধারণত বুড়োরা হয় ইস্কুলের মাষ্টার, নয় ডাক্তার, নতুবা বাড়ীর কর্ত্তা। সেত কিছুই নয়। কি বিদ্যে আছে তার? মাত্র থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত। সব চেয়ে খারাপ পরীক্ষার রেজাল্ট তার। এই নিয়ে দিন কাটবে কেমন করে? পাশের বাড়ীর—বুড়ো ঠাকুর্দ্দাকে রোজ দেখেছে সে। নাতি-নাতনিরা তাঁর কেমন বাধ্য। সারা জীবন পরিশ্রম ক'রে বাড়ীঘর, সংসারটাকে দাঁড় করিয়েছেন তিনি। সবাই তাঁকে ভক্তি করে, ভালবাসে, তাঁকে সুখী করতে সবাই ব্যস্ত। কিন্তু তার বেলায় এসব কিছুই জুটবে না। হায়রে ভাগ্য!

বিকুর তখন খেয়াল হল, দেখল সহর ছাড়িয়ে সে এসে পড়েছে এক বনের মধ্যে। চারদিকে শুধুই বন; সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসছে। আর একটু পরে পথও দেখা যাবেনা। তার উপর বুড়ো মানুষের চোখ। যা হবার তা হোকগে—এখন একটা আস্তানা খুঁজে বার করতে ত হবে—বিকু ভাবল।

বিকুর ভাগ্য ভাল। একটু দূর এগুতেই তার চোখে পড়ল সামনে একটা ঘর। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল মাঝখানে একটা টেবিল। তার চার পাশে

চারটে চেয়ার। টেবিলের উপরে একটা মোমবাতি জ্বলছে। আর দেওয়ালে একটা বড় ঘড়ি যেন কথা বলে চলছে আপন মনে—টিক টিক টিকা টিক, সময়ের রেখো ঠিক। ঘরের এক কোনে একগাদা খড় জড়ো করা। বিকু খড়ের গাদায় ঢুকে খড় চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল; আপন মনে খুব খানিকটা কেঁদে নিল। তারপর ভেজা দাড়িটা মুছে নিয়ে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকুর ঘুম ভাঙ্গল মানুষের গলার শব্দে। ভয়ে ভয়ে খড় একটু উচুঁ করে সে দেখল চারটে চেয়ারে চারজন মানুষ বসে। বয়স তাদের সাত আট বছরের বেশী নয়। একেবারে বাচ্চা বললেই চলে, দুজন মেয়ে, দুজন ছেলে। তারা আপন মনে কথা বলে চলেছে। তাদের প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট কানে আসছে বিকুর। ভয়ে তার গলা কাঠ হয়ে এল। বিকু শুনছে তারা যেন কিসের হিসেব করছে।

—এইত এখানে পাচ্ছি কুড়ি বছর আর পঞ্চাশ, ওদিকে একশ বাদেও আরও তিরিশ বছর হাতে···ঘটোৎকচ এই বয়সটা তুমি নাও। নিকষাকে আমার মতে এই বয়সই দেওয়া চলতে পারে। হিড়িম্বার পক্ষে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হচ্ছে শেষের বয়সটা, আশা করি তোমাদের সকলের মত আছে এতে।

ওদের দলের একজন চুপ করতেই আর একজন তখন বলতে সুরু করল।

কারা এই ঘটোৎকচ, হিড়িম্বার দল? নাম ত এই অদ্ভুত বানানের। উচ্চারণ করতে গেলে দাঁত ভাঙ্গে। কথাবার্তায় ত পাকা বুড়ো। অথচ চেহারায় একেবারে বাচ্চাদের মতো। কারা এরা। বিকু ভাবতে লাগলো। ওরা শুধু বয়স নিয়েই হিসেব করছে।

আসলে ওরা সব ডাইনি আর যাদুকরের দল। বিকু যেন সাধারণ নিয়মের মতই ওদের চিনে ফেলল। বিকু বুঝে নিল—পৃথিবীতে যারা সময়ের মূল্য না বুঝে কেবল আলসেমিতে দিন নষ্ট করে, সময়ের পরোয়া করেনা—এরা তাদের বয়স চুরি করে নেয় এমনি করেই ওরা বিকুর বয়স চুরি করেছে। আর বিকুর মতই আরো একটি ছেলে আর দুটি মেয়ের বয়স চুরি করে ওরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। বিকুদের বয়স নিজেরা পেয়েছে বলেই ওদের বয়স হয়েছে আট দশ বছর, কিন্তু তাহলে উপায়? বিকু কি আর তার বয়স ফিরে পাবেনা?

ডাইনি গুলোর হিসেব যখন শেষ হয়ে গেল তখন হঠাৎ দলপতি কুম্ভকর্ণ বলে উঠল —বন্ধুগণ একটা কথা। মনে রাখবে যে বাচ্চাদের বয়স আমরা চুরি করেছি তারা কিন্তু আবার বাচ্চা হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সাবধান।

—কেমন করে? একজন প্রশ্ন করল তাদের থেকে।

…বলছি সব খুলে।—কুম্ভকর্ণ বলল…তারপর ঘরের চারপাশ ভাল করে দেখে নিল। জানলাটা খুলে একবার বাইরে তাকাল, তারপর জানলাটা বন্ধ করে দরজার খিলটা তুলে দিল। একটা লাঠি দিয়ে খড়ের গাদায় একটা খোঁচা মেরে আবার চেয়ারে এসে বসল। খড়ের গাদায় তখন বিকু ভয়ে পাথর হয়ে উঠেছে।

…দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই—দলপতি বলে চলল…দুনিয়ার সমস্ত সমস্যারই সমাধান আছে। আজ আমরা যে বাচ্চাদের বুড়ো করে দিয়েছি, তাদের কেউ যদি কাল ঠিক মাঝরাত্রে এইখানে এসে ওই ঘড়ির কাঁটা পঁচাত্তর বার পেছনে ঘুরিয়ে দিতে পারে তবে তারা আবার বাচ্চা হয়ে যাবে আর আমরা যাব হাওয়ায় মিলিয়ে।—দলপতি চুপ করল। একটুক্ষণ পরে শ্রীমতী হিড়িম্বা বলল…এখানটা কেমন করে তারা খুঁজে বার করবে?

…মাঝ রাত্রে তারা এখানে আসতেই পারবে না!—একটু হেসে ঘটোৎকচ বলল… তারা হচ্ছে আলসের সেরা। এখানে আসতে দেরী তারা করে ফেলবেই। আর এক মিনিট দেরী হয়ে গেলে তাদের বুড়োই থেকে যেতে হবে সারা জীবন।

…আর তারা যদি আসেও—শ্রীমতী নিকষা সবাইকে সাহস দিয়ে বলল…যদি এসে তারা কাঁটা ঘুরিয়েও দেয়…তবু দেখে নিও পঁচাত্তর বার তারা ঘোরাতেই পারবেনা। পঞ্চাশের বেশী তারা গুণতেই পারবেনা। যে কুড়ের বাদশা ওরা।

…তবু আমরা খুব সাবধানে থাক্‌বো। যদি বাচ্চা-বুড়োদের কেউ এসে একবার ঘড়িটায় হাত দিতে পারে তাহলে আমরা নড়তেও পারবো না। আমাদের সমস্ত শক্তি চলে যাবে, মনে রেখো কিন্তু। আজ আর গল্প করে লাভ নেই। চলো সহরের দিকে যাই। দেখি আরো গোটাদুই বাচ্চা-টাচ্চা যদি পাই।—ওরা সব ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল।

ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে আসতেই বিকু খড় ঠেলে বেরিয়ে এল। তারপর প্রাণপণে ছুটে চললো সহরের দিকে। তাকে খুঁজে বার করতেই হবে অন্যান্য বন্ধুদের।

বিকু যখন সহরে পৌঁছুল তখনো রাত আছে। সহরের লোকজন তখনো ঘুমিয়ে। পথে ঘুরতে ঘুরতে সকাল হয়ে এল। ট্রাম, বাস চলতে সুরু করল। বিকু দেখল তার সামনে এক বুড়ি তরকারীর ঝুড়ি মাথায় ক'রে বাজারের দিকে চলেছে; হাতে তার একটা ছোট লাঠি। তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে বিকু প্রশ্ন ক'রে বসল—ওগো শুনছ; ও বুড়ি।

বুড়ি ঘাড় ফেরাল।

—তুমি কি ইস্কুলে পড়?

—কি? কি বললে?—বুড়ি ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করল

—তুমি কি থার্ডক্লাসে পড়?



হঠাৎ বুড়ি তার লাঠিটা শূন্যে তুলে এমনভাবে ঘুরিয়ে নিল যে বিকু ভড়কে গিয়ে প্রাণপণে ছুট দিল। অনেক দূর ছুটে এসে একজায়গাতে দাঁড়িয়ে দম জিরিয়ে নিতে লাগল। সারা সহর তখন জেগে উঠেছে। ট্রাম, বাস, রিক্সা, ঠেলাগাড়ী, গরু-মোষের গাড়ী, সাইকেল সব ছুটছে। বাস কণ্ডাকটার চেঁচাচ্ছে শ্যামবাজার, শ্যামবাজার, কালীঘাট, লেক। হকার চীৎকার করছে আনন্দবাজার, যুগান্তর, স্বাধীনতা, ষ্টেটসম্যান। কভেণ্ট্রির দুধের গাড়ী চলেছে, বেকারীর সাইকেল গাড়ী ছুটছে। লরি বোঝাই মাল চলেছে স্টেশনের দিকে। বিকুর মনে হল সবাই ছুটছে; সারা সহর ছুটছে। আজ এই প্রথম তার মনে হল যে সারা সহর ছুটছে পাছে সময় চলে যায়, পাছে তাদের দেরী হয়ে যায়।

বিকু হাঁটছে আর সমস্ত বুড়োবুড়িদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। কিন্তু কাউকে তার মনে হচ্ছে না থার্ডক্লাসের ছাত্র বা ছাত্রী বলে। কত বুড়োর দল চলে গেল। বিকু মহা সমস্যায় পড়ল। কে তাকে বলে দেবে ওদের কোন তিনজন তারই মত ইস্কুলের ছাত্র।

ওই একটা বুড়ো রিক্সওয়ালা গাড়ী টেনে চলেছে। আর একজন সাদাপ্যান্ট পরনে, বোধ হয় ডাক্তার। সামনে দিয়ে একজন চলেছে লাঠি ঠুক ঠুক করে। খুব সম্ভব কোন ইস্কুলের হেডমাষ্টার। হঠাৎ ঘণ্টা বাজিয়ে চলে গেল দ্রুত গতিতে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী। কর্ত্তাগোছের একজন বুড়ো দাঁড়িয়ে গাড়ীতে, মাথায় লোহার হেলমেট, ওই বুড়োটা নিশ্চয়ই জীবনে এক মুহূর্ত্তও আলসেমিতে কাটায়নি।

কতক্ষণ ধরে হাঁটল বিকু। একটাও বাচ্চা-বুড়ো চোখে পড়ল না তার। রাস্তায় অগণিত মানুষের স্রোত। সবাই ব্যস্ত—সময় নাই, সময় নাই। আর বিকু? সঙ্গীহীন বুড়োমানুষ। কোন কাজের উপযুক্ত নয়-থার্ডক্লাস পর্য্যন্ত বিদ্যে তার!

দুপুরের দিকে বিকু ঢুকল এক পার্কে। ক্লান্ত হয়ে বেঞ্চির গায়ে হেলান দিয়ে ব'সে রইল।

হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল। কিছুদূরে একটা বেঞ্চির উপর এক বুড়ি ব'সে ব'সে কাঁদছে। বিকুর মনে হল একবার ছুটে যায় তার কাছে। অতিকষ্টে সে নিজেকে সংযত করল। ভাবল—দেখাই যাকনা কেন বুড়িটা কি করে।

বিকু দেখল, অনেকক্ষণ পরে বুড়ি কান্না থামিয়ে চোখ মুছে পা দোলাতে স্থুরু করল। তারপর বার করল একখানা মাসিক পত্রিকা; একটা ঠোঙ্গা থেকে তুলে নিল একমুঠো লজেঞ্চুস। মাসিকপত্রিকাটা খুলে ধরতেই বিকুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল বিস্ময়ে। বুড়ির হাতে ছেলেমেয়েদের সব চেয়ে প্রিয় মাসিক 'মৌচাক'। মৌচাক পড়তে পড়তে বুড়িটা লজেঞ্চুস বার ক'রে ক'রে খেতে লাগল।

লজেঞ্চুস শেষ করে একসময় বুড়িটি 'মৌচাক' মুড়ে রাখল। বেঞ্চির কিছুদূরে একটা গাছের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কি যেন চেয়ে চেয়ে দেখল। তারপরেই একছুটে গিয়ে তুলে নিল একটা টেনিশ বল। কেউ হয়ত এখানে বলটা হারিয়ে গেছে। বলটা কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে নিয়ে বুড়ি আপন মনে লোফালুফি করতে লাগল। বিকু আর থাকতে পারল না। এক ছুটে বুড়ির কাছে এসে দাঁড়াল!

—আচ্ছা সত্যি করে বলুন ত, আপনি ইস্কুলে পড়েন?

বুড়িটাও আনন্দে লাফিয়ে উঠল; বিকুর হাত চেপে ধরে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার নাম মিনু। থার্ডক্লাসে পড়ি। তুমি কে?

মিনুকে সব খুলে বলল বিকু। তারপর দুজনেই ছুটল তাদের আর দুজন কোথায় আছে খুঁজতে। ঘণ্টাখানেক খুঁজতে খুঁজতে তারা দেখল এক পার্কে এক বুড়ি একটা ছোট্ট ছেলের সংগে কানামাছি খেলছে।

বিকু আর মিনু ছুটে গেল তার কাছে—সত্যি বলুন ত আপনি ইস্কুলে পড়েন কি না!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—খেলা থামিয়ে বুড়ি উত্তর দিল—আমার নাম ঝুনু, পড়ি থার্ড ক্লাসে। তোমরা কে?

তখন বিকু, মিনু সব খুলে বলল তাকে। তারপর হাত ধরাধরি করে তারা বেরুল আর একজন বন্ধুকে খুঁজে বার করতে।

প্রথমে মনে হল তারা বুঝি শেষটাকে খুঁজেই পাবে না। কত জায়গায় খুঁজল, পার্ক, সিনেমা, ইস্কুলের বারান্দায়। কোথাও পেলনা তাদের দুর্ভাগা বন্ধুর খোঁজ।

পথে চলতে চলতে তারা আর একটা পার্কে দেখতে পেল এক বুড়ো আপন মনে দৌড়চ্ছে পার্কের চারধারে। হঠাৎ কি খেয়াল হল। বিকু গিয়ে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা আপনি কি ইস্কুলে পড়েন?

—ইস্কুলে?—বুড়ো ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে।—আমিত এম, এ, পাশই করেছি ১৮৯৫ সালে। ক্যালকাটা কলেজের প্রিন্সিপাল আমি। আমার নাতিরা সব ইস্কুলে পড়ে। তবে বুড়ো হয়ে পড়েছি কি না, তাই মাঝে মাঝে দৌড়ে শরীরটা চাঙ্গা করতে ইচ্ছে হয়।—ভদ্রলোক আবার দৌড়তে শুরু করলেন।

বিকুরা ভয়ে ভয়ে সরে এল সেখান থেকে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তখনো আর এক জনের দেখা মিলল না। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল। কি করা যায় এখন? ওকে আর পাওয়া যাবেনা? হঠাৎ মিনু চেঁচিয়ে উঠল—দেখ দেখ। ওই যে—ওই…

ওরা দেখল একটা ডু'এর এ বাস ফুলস্পীডে ছুটছে। আর একটা বুড়ো বাসের পেছনে দাঁড়িয়ে অবলীলাক্রমে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। দেখে মনে হয় বেশ ফূর্ত্তিতেই সে চলেছে যেন খুব মজা পাচ্ছে ওতে। তার দাড়ি উড়ছে বাতাসে। কোট উড়ছে। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে বুড়োটা—হেঁইয়ো, জোরসে চালাও, জোরসে। চলো শ্যামবাজার কালীঘাট, লেক, লেক।

তিনজনেই বুঝে নিল বুড়োটা ওদের দলের না হয়েই পারে না। ওকেই ওরা খুঁজছে আর উনি দিব্যি খোস মেজাজে বাসের পেছনে চলেছেন। ওরা তিনজনেই তখন ছুটতে লাগল বাসের পেছনে। এই, এই বাস, বাঁধকে বাঁধকে। খানিকদূরে যখন বাস থামল হাঁপাতে হাঁপাতে তিনজনে টেনে নামাল বুড়োকে।

—তুমি নিশ্চয়ই ইস্কুলে পড়?—তারা প্রশ্ন করল।

—কেন? পড়িইত ইস্কুলে। আমার নাম রুনু। পড়ি থার্ড ক্লাসে। কি দরকার বলত? বুড়ো উত্তর দিল।

ওকেও সব বলা হয়ে গেল। তখন আর সময় হাতে বেশী নেই। চার জনেই লাফিয়ে উঠল বাসে। তিল ধারণের জায়গা নেই, বাস ভর্ত্তি ইস্কুলের ছেলে মেয়ে। কোন সিনেমা থেকে ফিরছে ওরা। চারজন বুড়োবুড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একদল ছেলেমেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—বসুন বসুন আপনারা। আমরা দাঁড়িয়ে যাব।

—না, না থাক। তোমরা বসো।—বিকুরা প্রতিবাদ জানাল।—আমরা দাঁড়িয়েই যেতে পারব।

—তা কি হয়। আপনারা আমাদের ঠাকুরদা ঠাকুরমার বয়সী। আমরা বসে থাকব আর বুড়ো মানুষেরা দঁড়িয়ে যাবে তা হ'তেই পারে না।—তারা জোর করে "ঠাকুরমা" "ঠাকুরদা"দের বসিয়ে দিল সিটে। ওদিকে তখন তারা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

তারপর এক সময় বাস এসে থামল লেকের কাছে। বিকু নিয়ে চলল ওদের বনের দিকে। সেখানেও এক ফ্যাসাদ। রাস্তা ভুল করে ফেলল বিকু। ওদিকে সময় নেই, সময় নেই। বিকু অস্থির হয়ে পড়ল। এখান থেকে পালাবার সময় তাড়াহুড়োয় বিকু রাস্তা ভালো ক'রে চিনে যেতে পারেনি। তাই খুঁজে বার করতে সময় লাগছে তার। উঃ সময় কি মূল্যবান!

একটা গাছে উঠল বিকু। তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। গাছের ফাঁকে কিছুদূরে দেখা গেল সেই ঘর খানা। দল বল নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে জানালা দিয়ে উঁকী মারল।

—চুপ একটা কথাও না।

ঘরের দেয়ালের সেই ঘড়িটায় মাঝ রাত্রের ঘণ্টা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকী। খড়ের গাদার উপর বসে ডাইনীরা হারানো সময় পাহারা দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

—ওরা ঘুমুচ্ছে। মিন্নু বলল।

—হিস্—স্—স্। বিকু সঙ্কেত করল চুপ করতে।

চুপিসারে দরজা ঠেলে তারা ঘরে ঢুকলো। ঘড়িতে আর মাত্র এক মিনিট বাকী। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় মাঝরাত্রির সময় বিকু হাত বাড়াল কাঁটার দিকে···এক, তুই, তিন। বিকু বাঁদিকে কাঁটা ঘুরিয়ে দিতে লাগল।

ভয়ের আর্ত্তনাদ তুলে ডাইনীরা লাফিয়ে উঠল। কিন্তু ঠিক যেখানে তারা দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। একচুল নড়বার ক্ষমতা নেই তাদের। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর্ত্তনাদ করতে লাগল, আর তাদের দেহ ক্রমশঃই বড় হয়ে উঠতে লাগল টাক দেখা দিল তাদের মাথায়, কুঁচকে গেল গালের, গায়ের চামড়া।

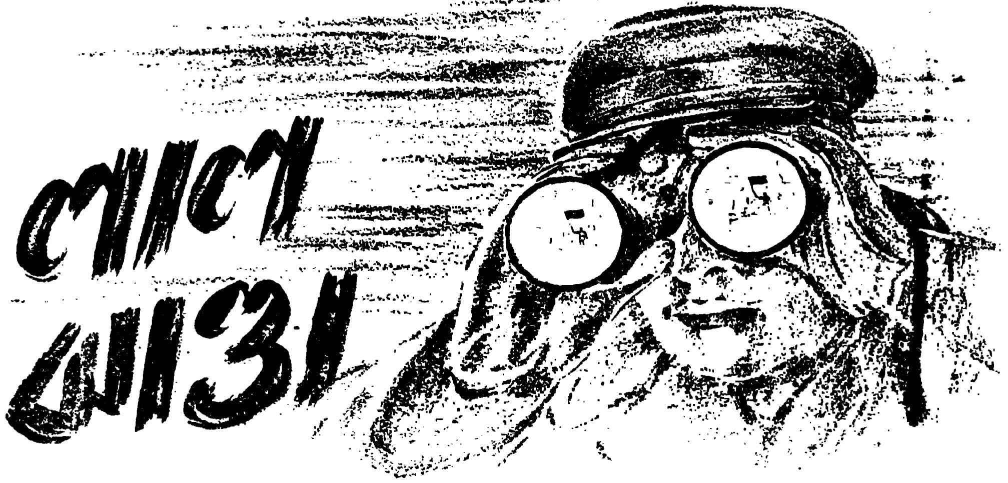
—এই তাড়াতাড়ি আমায় উঁচু করে ধরো। বিকু চেঁচিয়ে উঠল···আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি যে। কাঁটায় হাত পাচ্ছি না আর।···একত্রিশ বত্রিশ···তেত্রিশ···মিন্নুরা ঠেলে তুলে তাকে উঁচু করে তুলে ধরল। ঘড়ির কাঁটা ততক্ষণে চল্লিশবার ফেরানো হয়ে গেছে। ডাইনিগুলোকে দেখাচ্ছে কিম্ভুতকিমাকার। মাটিতে নুয়ে পড়া মাংস পিণ্ডের মত। তারপর যখন পঁচাত্তর বার কাঁটা ঘোরান হল, ডাইনির দল হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তাদের কোন চিহ্নই নেই।

বিকুরা এ ওর দিকে তাকাতে লাগলো—সেই বিকু, মিন্নু, ঝন্নু, রুণু। আবার তারা বাচ্চা হয়ে গেছে। আর হয়েছে তাদের নিজেদেরই চেষ্টায়। হারানো সময় তারা আবার ফিরে পেয়েছে।

বিকুরা বেঁচে গেছে, কিন্তু মনে রেখো যে ছেলেমেয়ে সময় নষ্ট করে আলসেমিতে, তারা এমনিই হঠাৎ বুড়ো হয়ে যায়। কেমন করে যে তারা বুড়ো হয়ে যায় তা জানতেই পারা যায় না। *

অবন্তী সান্ন্যাল

* বিদেশী গল্প অবলম্বনে



রাশিয়ার দুর্জ্জয় শীত। চারদিক বরফে ঢেকে গিয়েছে। গাছগুলির দুর্দ্দশার চরম। নদী, নালা, ডোবা, সব জমে গিয়ে হয়ে উঠেছে কঠিন। তার উপর দিয়ে সৈন্যদের ভারি ভারি গাড়ীগুলি চলে, চাকার তলায় বরফ গুড়ো হয়ে যায়, অদ্ভুত শব্দ ওঠে। মাথা থেকে পা অবধি ঢেকে সৈন্যরা চলে,—হাতে রাইফেল, পায়ে ভারি বুট, গায়ে পুরু ওভারকোট। কিন্তু শীতের কন্‌কনে বাতাস বাধা মানেনা। শরীরের হাড়ে কাঁপুনি জাগিয়ে দেয়। গরম জামা কাপড়ে সে শীত জয় করতে পারেনা। কেবল মাত্র অমানুষিক মনের জোরে শীতের কথা ভুলিয়ে দেয়।

এখানে ওখানে ছাউনি পড়েছে সৈন্যদের। দূর থেকে দেখে ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। টুকরা, টুকরা, ছিন্নবিচ্ছিন্ন। তুলার মত তুষার পাতে ছাউনি ঢেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। জীবনের চিহ্ন দেখা যায় না কোন দিকে। সব নিশ্চল, নিস্তব্ধ। কিন্তু ওরই মধ্যে কাজ চলে। সৈন্যের দল আসে যায়। টেলিফোনে নানা খবর আদান প্রদান হয়। "তিন নম্বর গ্রুপ, রাত দশটায়···" "আজ রাত্রেই গ্রামটি দখল করা চাই···" সৈন্যরা আহত হয়, রেডক্রশ-বাহিনী তাদের সরিয়ে নিয়ে যায়। আহত সৈন্যের আর্ত্তনাদ ওঠে। হঠাৎ এক ঝাঁক আর্ত্তনাদ নিস্তব্ধতাকে চৌচির করে দিয়ে যায়। তার পর সব চুপচাপ। নিঃশব্দে প্রাণ দেয় কত! সঙ্গীরা অভিবাদন জানায়, সাদা বরফের তলায় চাপা দিয়ে দেয়, আবার তাদের কাজ চলে। মাঝে

মাঝে মেশিনগান আর রাইফেলের গুলি চলে অতর্কিতে। হাতবোমা ফাটে, শেল ফাটে। ...নৈশ অন্ধকারে শুধু আগুনের ঝলক্ দেখা যায়, হঠাৎ কোথায় আগুন লেগে যায়, ছায়ার মত ছুটোছুটি করে লোকগুলো...তারপর আবার সব চুপচাপ। চারদিক থেকে নিস্তব্ধতার প্রাচীর গড়ে ওঠে।

ভোর হয়, বরফে ঢাকা সাদা ভোর। চারদিক কুয়াশায় ঢাকা, ভাল দেখা যায় না। বরফের উপর দিয়ে চলেছে একটি বছর বারোর ছেলে। পায়ে ওর জুতো নেই বল্লেই চলে। গায়ের জামা কাপড় এই শীতের তুলনায় নিতান্তই নগন্য। চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ছেলেটি হালকা পায়ে এগিয়ে যায়, মাঝে মাঝে হাত দুটোকে গরম রাখতে জোরে জোরে ঘষে নেয়। মাটিতে পা ঠুকতে থাকে, কিন্তু পা আর চলে না।—ছেলেটি রোগা, পথের পরিশ্রমে ওর শ্বাস পড়ছে জোরে জোরে, ...গভীর রাত্রে গ্রাম থেকে চুপি চুপি পালিয়ে এসেছে, কেউ জানেনা, কেবল জানত ওর মা। গ্রামটি জার্ম্মানদের দখলে, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারা,—তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছে। কতদিন ভাল ক'রে খাওয়া হয়নি, গরম জামা কাপড়, ভাল জুতো সব নিয়ে গিয়েছে দস্যুর দল।

ছেলেটি চলে, দাঁড়ায়, চারদিকে একবার দেখে, আবার চলতে সুরু করে। রাত্রের অন্ধকারে আন্দাজ করে ও যাত্রা সুরু করেছিল, ভোরের আলোয় ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারেনা কোন জায়গায় এসে পৌঁছল।—কড়া সুরে একটা হুকুম আসে,—"হল্ট্"। চম্‌কে উঠে ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ে। ভারি বুটের চাপে বরফ গুড়ো হ'য়ে যায়। রাইফেল হাতে একটি সৈন্য। রেড্ আর্ম্মির সৈন্য। ঐটুকু একটা ছেলেকে দেখে সৈন্যটি অবাক হ'য়ে যায়—"কি চাও তুমি খোকা।" ছেলেটির গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না, দু একবার চেষ্টা ক'রে চুপ করে যায়। সৈন্যটি ওর অবস্থা বুঝতে পারে। পাশেই একট্টা ছাউনিতে থাকে গ্রুপ কমাণ্ডার। সেখানে ওকে নিয়ে যায়। ছোট্ট ছাউনি, টেবিলের উপর একটা আলো জ্বলছে, গ্রুপ কমাণ্ডার ঝুঁকে পড়ে কি একটা লিখছিলেন। ওদের পায়ের শব্দে মুখ তুলে তিনিও অবাক হ'য়ে যান।

...এই সকালে খোকাটি কোত্থেকে এসে হাজির!

...তা জানা যায় নি,—সৈন্যটি উত্তর দেয়,—ওকে একটু গরম চা আর খাবার দেওয়া দরকার।

...নিশ্চয়ই।—গ্রুপ কমাণ্ডার ওর গায়ে একটা ওভারকোট পরিয়ে দেন। তারপর ফ্লাস্ক থেকে এক বাটি চা নিয়ে ওকে খাইয়ে দেন একটু একটু করে। ছেলেটির হাত দিয়ে চায়ের বাটি তুলে ধরার ক্ষমতাও নেই। সৈনিকের ছাউনি, খাবার আর বিশেষ কি থাকতে পারে। দু এক টুকরা রুটি, একটু সসেজ, তারপর আবার একবাটি চা। তারপর প্রশ্ন হয় এই শীতের ভোরে কোত্থেকে ছেলেটি এসে হাজির...

…এখান থেকে কত দূর তোমাদের গ্রাম ?

…ঠিক কত দূর বলতে পারি না।

…তুমি কখন বেরিয়েছো ?

…রাত বারোটার পর।

প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক হেঁটেছে ছেলেটি। দূরত্ব দশ, বারো কিলোমিটারের কম নয়…মনে মনে হিসেব করে গ্রুপ কমাণ্ডার।

…কতদিন জার্ম্মানরা তোমাদের গ্রাম দখল করেছে ?

…মাস দুয়েকের ওপর। ওরা আমাদের কিছু রাখেনি সব নিয়েছে। খাবার, দাবার, জামা, কাপড় আসবাব পত্র…আর কত লোক যে মেরেছে তার ঠিক নেই।

…ওখানে, গ্রামে তোমার আর কে আছে ?

…এখন শুধু মা আর আমি। কদিন থেকে দেখছিলাম, ওরা স্কুলের দিকে কড়া পাহারা দিচ্ছে। গ্রামের লোকেরা গীর্জ্জা অবধিও যেতে পারে না। গীর্জ্জার পরের বাড়ীগুলিতে ওদের আড্ডা। তারপর স্কুলবাড়ী। আমি চুপি চুপি কদিন ওদিকে দিয়ে যেতে গুঁতো খেয়ে ফিরে এসেছি। কিন্তু কিছু একটা চলছে ওখানে। দিনরাত গাড়ীর পর গাড়ী আসছে যাচ্ছে, মাল বোঝাই গাড়ী—কি যেন একটা হচ্ছে। আমাদের গ্রামের এক বুড়ো থাকে আমাদের ঘরের পাশেই। ঐ বুড়ো খবর দেয় প্রথমটায়—গোলা বারুদ জমা হচ্ছে ওখানটায় আর পেট্রলের ট্যাংক। কত যে জমা হয়েছে তা কেউ জানে না। কি করে জানল বুড়ো জানিনা। তারপর কাল সকালে, সৈন্যদের বুট পালিশ ক'রতে গিয়ে আমার এক বন্ধু মিস্কা দেখে এসেছে। কাল সকালেই এসে মাকে বলে। আমি তখনই ঠিক ক'রেছি যে ক'রে হোক খবরটা আমি পৌঁছে দেব।

গ্রুপ কমাণ্ডারএর মুখটা হ'য়ে ওঠে গম্ভীর। দশ বারো কিলোমিটার হেঁটে এসেছে শীতের রাত্রে ঐ একটু ছেলে…একটা খবর জানাতে। খুব ভাল খবর, খুব জরুরী খবর সন্দেহ নেই, কিন্তু অত দূরের গ্রাম—চারিদিকে সাদা বরফ—কিছুই বোঝা যাবেনা কোথায়, ঠিক কোথায় শত্রুরা মাল বোঝাই গাড়ী থেকে জমা ক'রে চলেছে মারণাস্ত্র আর অতি প্রয়োজনীয় পেট্রল। চড়াও হ'য়ে গ্রাম দখল করবার উপায়ও নেই। শত্রুরা ওখানে বেশ ভারি পাহারা রেখেছে। অথচ ছেলেটিকে কী বলবে সে। বলবে খোকা তুমি গ্রামে ফিরে যাও, কিছুই করা সম্ভব নয়। গ্রুপ কমাণ্ডার তা বললেনা, ছেলেটিকে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের কাছে।

ক্যাপ্টেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করেন নানা কথা, যদি গ্রামটার নিশানা মেলে। একটা নিশানা অবিশ্যি তিনি ঠিক ক'রেছিলেন—গীর্জ্জার চূড়োটা দূর থেকেও

দেখা যেতে পারে। কিন্তু শীতের কুয়াসায় ঢাকা দূর গ্রামের গীর্জ্জার চূড়োকে নিশানা ক'রে গোলা বারুদের আর পেট্রলের ডাম্পে গোলা ছুড়্তে যাওয়া বিপদজনক। গীর্জ্জার চূড়ো ঠিক বোঝা নাও যেতে পারে, একাধিক গীর্জ্জা ঠিক ঐ গ্রামটিতে না হ'লেও ওদিকের অন্য কোন গ্রামে থাকাও সম্ভব আর তাছাড়া গ্রামবাসীরা নিজেদের লোক, অনর্থক তাদের বিপদ বাড়িয়ে তোলাও ঠিক নয়। চিন্তিত মুখে তিনি পায়চারী করে বেড়াতে লাগলেন। মুখের পাইপটা নিভে গিয়েছিল সেটা জ্বালিয়ে নিলেন, তারপর মৃদু ভাবে টান দিতে দিতে আবার সুরু ক'রলেন পায়চারী।

ছেলেটি উসখুস ক'রছিল এতক্ষণ। সাহসে ভর ক'রে বলে উঠল—"কমরেড্ ক্যাপ্টেন, আমি সত্যি খবর দিয়েছি।"

—"সে আমি জানি," হেসে উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন।

—"কিন্তু আপনি দেরী ক'রছেন কেন? যত দেরী হবে ততই, সত্যি বলছি, বিপদ ততই বাড়বে। ওরা যদি বুঝতে পারে, গ্রাম থেকে কেউ পালিয়ে গিয়েছে, সে বড় হোক্, ছোট হোক্ তাহলে সবাইকে ওরা মারবে। আর আমার মা র'য়েছে একা, ওরা হয়ত মাকে ধরে নিয়ে যাবে। আমি ওখানে নেই, আপনি শিগ্গির করুন,—"

ক্যাপ্টেন চুপ ক'রে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, শেষের দিকের কথাটায় তাঁর চোখ একবার জ্বলে উঠল। তারপর তিনি ছেলেটির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে গভীর স্নেহের সঙ্গে বললেন "কিন্তু ছোট্ট কমরেড্ ভাইটি, ভেবে দেখ, শুধুই আন্দাজ ক'রে গোলা ছুড়্লে, তোমাদের গ্রামে নাও পড়তে পারে। যদি ঠিক জায়গাটিতে না পড়ে তাহ'লে কতলোক, আমাদের লোক, শুধু শুধু মারা পড়বে। আর তাছাড়া, তুমিও ছোট্ট বীর, বীর পুরুষকে অধীর হ'তে হয়না, কখনো কোনো ব্যাপারে।" ছেলেটি জবাব দিতে এক মুহূর্ত্তও দেরী করলেনা, যেন এসব ও ভেবে রেখেছে,—"কিন্তু কমরেড্ আমাদের গীর্জ্জাটী খুব উঁচু, ওদিকে অত উঁচু গীর্জ্জা আর নেই। আর গীর্জ্জার পর একটা, দুটো,—এই গোটা আট দশ বাড়ীর পর স্কুল বাড়ী।"

—"গোটা আট দশ বাড়ী, তুমি গুণে দেখেছ কখনও?"

—"গুণে দেখিনি, কিন্তু আমি সব গুলো বাড়ীর পর, পর, নাম বলে দিতে পারি। গীর্জ্জার গা ঘেঁসে, এক ঢ্যাংওয়ালা বুড়ো সিখেনস্কার বাড়ী, এখন অবিশ্যি বুড়ো ওখানে থাকেনা। তারপর থাকে—"

ক্যাপ্টেন বাঁধা দিয়ে বল্লেন "কিন্তু দশটা বাড়ী তুমি চিনলেও, ছোট্ট বীরপুরুষ, গোলন্দাজরা কি ক'রে জানবে দশটা বাড়ী কতটা জায়গা জুড়ে আছে? গীর্জ্জা, তারপর আট দশটা বাড়ী তারপর

স্কুলবাড়ী, বেশ, কিন্তু গীর্জ্জা থেকে কত দূরে, আর কেবল দূরত্ব জেনেই বা কি হবে, ঠিক বরাবর নাও হ'তে পারে।"

—"কাগজ পেন্সিল দিন, একে দিচ্ছি। কত ডিগ্রি বাঁকা তাও দেখাতে পারি।"

ক্যাপ্টেন অবাক হ'য়ে গেলেন, কত ডিগ্রির কথা ঐটুকু ছেলে কি ক'রে জানতে পারলো? ছেলেটি বুঝতে পারে ক্যাপ্টেনের বিস্ময়। একটু মৃদু হাসি হেসে বল্ল, "আমার বাবা ড্রাফ্‌টসম্যান ছিলেন। আমি কত সময় ব'সে ব'সে দেখেছি, তাছাড়া বাবা কত কি বুঝিয়ে দিতেন!" বলতে বলতে ছেলেটির গলাটা ধরে আসে, কতদিন বাবাকে দেখতে পায়নি, কোথায় কোনদিকে কোন সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বেঁচে আছেন কিনা তাই বা কে জানে। ওর কথা, ওর মায়ের কথা নিশ্চয় ভাবেন তিনি। ক্যাপ্টেন্ কি যেন কতক্ষণ ভাবেন, তারপর টেবিলের উপর একটা ম্যাপ ছড়িয়ে দেন—বোঝাতে স্বরু করেন, একটা পেন্সিল দিয়ে দেখিয়ে দেন কোন জায়গায় তারা দাঁড়িয়ে। ছেলেটি মনোযোগ দিয়ে ম্যাপটি দেখে, ক্যাপ্টেন বুঝিয়ে বলেন,—"এই পশ্চিম দিকে তোমাদের গ্রাম। মনে কর যদি দশ কিলোমিটার হয় এখান থেকে তাহলে", পেন্সিলটা আড়াআড়ি ভাবে ম্যাপের উপর রেখে আবার স্বরু করেন—"এই লাইনের কোথাও হওয়া সম্ভব।"

—"আচ্ছা নদী, নালা, ছোট খাট পাহাড়, জঙ্গল—এগুলি কি ম্যাপে দেয়া নেই?" জিজ্ঞেস করে ছেলেটি।

"নিশ্চয়ই আছে"—উত্তর দেন ক্যাপ্টেন, তারপর দেখিয়ে দেন কোন্ চিহ্নের কি মানে। ছেলেটি ঘাড় নাড়ে, কি যে বোঝে, কতটা বোঝেনা—মুখ দেখে বোঝা যায় না, মুখটা একটু গম্ভীর, একটু নিশ্চিন্ত, চোখ দুটো ম্যাপের উপর। পেন্সিলটা নিয়ে কি যেন মাপে, তারপর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—"খুব সম্ভব এখানটায় আমাদের গ্রাম।"

—"কি ক'রে বুঝলে?"

"এই যে পাহাড়টা, এটা আমাদের গ্রামের বরাবর উত্তরে, আর ঠিক দেড় কিলোমিটার দূরে।"

ক্যাপ্টেন চুপ ক'রে আবার একটু ভেবে নেন, নোট বুকে কিছু নোট নেন—তারপর এক টুকরা কাগজ আর পেন্সিল ছেলেটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন—"এবার গীর্জ্জা থেকে স্কুল বাড়ীর দূরত্বটা যদি মোটামুটি বলতে পার?"

ছেলেটি পেন্সিল নিয়ে চুপ ক'রে খানিকটা ভেবে নেয়। তারপর কাগজের উপর দাগ কাটতে স্বরু ক'রে। এলোমেলো দাগ নয়, ছেলে মানুষি হিজিবিজি নয়। পরিষ্কার হাতে একটির পর একটি দাগ পড়ে, তারপর হিসাব ক'রে বুঝিয়ে দেয় গীর্জ্জা থেকে রাস্তা প্রথমটা সোজা গিয়েছে প্রায় ত্রিশ

মিটার তারপর বাঁদিকে একটু বেঁকেছে, তার পর বরাবর চলে গিয়েছে গ্রামের বাইরে বড় রাস্তার দিকে—স্কুল বাড়ীটা প্রায় দুশ থেকে দুশ পঞ্চাশ মিটার দূরে হবে।

ক্যাপ্টেন ছেলেটিকে অবিশ্বাস করতে পারেন না। বাইরে এসে দূরবীণ নিয়ে পশ্চিম দিকটা খুঁজতে থাকেন। গীর্জ্জার চূড়োর মত একটা দুরবীণের চোখে ভেসে ওঠে, ছেলেটির চোখে দুরবীণটা তিনি ধরেন, ছেলেটি মাথা নাড়ে, তারপর বলে, "হুঁ ওটাই হবে। ওটাই বটে।"

এবার সুরু হয় নূতন আর এক সমস্যার। ছেলেটি বলে—গোলা ছুড়তে সুরু হ'লেই, সে গ্রামে ফিরে যাবে। ঐ গ্রামে থাকে তার মা। কিন্তু,—ক্যাপ্টেনের গলায় কথাটা আটকে যায়—কতবড় গোলা বারুদের ডাম্প—বোধ হয় বড়ই হবে—একবার গোলা যদি ওখানে পড়ে গ্রামের চিহ্নও থাকবে কিনা সন্দেহ! ছেলেটির ফিরে যাওয়ার কোন মানেই হয়ত হবেনা, আর তাছাড়া ফিরে গেলে ছেলেটি কোথায় যেয়ে উঠবে, কার কাছে আশ্রয় নেবে—শত্রুসৈন্যের হাতে ধরা পড়লে নির্য্যাতন নিশ্চয়ই। অথচ কি ক'রেই বা ছেলেটিকে তিনি বললেন—খোকা তোমার আর যেয়ে কাজ নেই। কর্ত্তব্য সবচেয়ে বড়, মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে তিনি চলতে থাকেন ছেলেটির হাত ধরে গোলন্দাজদের ছাউনির দিকে।

সুন্দর ভাবে ঢাকা রয়েছে বড় বড় কামান দুটি। গাছপালায় সাজান, তার উপর বরফ পড়েছে, দূর থেকে, কামান বলে নয়, সন্দেহের কিছু হ'তে পারে এমন কথাও শত্রুপক্ষের মনে হওয়া সম্ভব নয়। জন দুই গোলন্দাজ সৈন্যকে ডেকে ক্যাপ্টেন বুঝিয়ে দেন ব্যাপারটা। ওরাও দূরবীণ নিয়ে একবার ভাল ক'রে দেখে নেয়, তারপর কামানের পাল্লা ঠিক ক'রে নেয়। ক্যাপ্টেন ছেলেটির হাত ধরে দাড়িয়ে থাকেন নীরবে।

—মিনিট পাঁচ ছয় সময় যায়, তারপর হঠাৎ দমকার মত আদেশ হয় "ফায়ার।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আগুন চমকে বেরিয়ে আসে কামানের মুখ থেকে, আর হাউইএর মত ছুটে যায় একটা শেল। ক্যাপ্টন চোখে দূরবীণ দিয়ে দেখতে থাকেন। ছেলেটির বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রতে থাকে। আবার একটা গোলা ছুটে যায় তীব্রবেগে। অনেক দূরে একটা সামান্য আবছায়ার মত ধোঁয়ার রেখা ভেসে ওঠে। তারপর ধীরে সেটা হ'য়ে ওঠে ঘন আর কালো। তারপর ক্রমে দিগন্ত ছেয়ে যায় কালো কালো ধোঁয়ার রাশিতে। দৈত্যের মত ফুলে ফুলে ওঠে ধোঁয়া, মাঝে মাঝে ঝলকে ওঠে অগ্নিময় শিখা।

যতদূর সম্ভব কাজটায় ভুল হয়নি কিছু, কিন্তু গ্রামবাসীদের কি হ'য়েছে বলা শক্ত। ক্যাপ্টেনের মুখটা গম্ভীর হ'য়ে ওঠে। ছেলেটি চলে যায়। যাবার আগে বলে যায়, গ্রামে যেয়ে গীর্জ্জাটার চূড়োতে উঠে, লাল নিশান উড়িয়ে দেবে ছেলেটি, যদি শত্রু সৈন্যেরা পালিয়ে গিয়ে থাকে।

*   *   *   *

বিকেলের দিকে ক্যাপ্টেন বার বার ক'রে তাঁর দূরবীণ নিয়ে দেখেন পশ্চিমের ঐ গীর্জ্জাটিকে। গীর্জ্জাটি দাড়িয়ে আছে ঠিক, ধোঁয়ার রাশি আকাশে মিলিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। পরিস্কার শীতের নিস্পন্দ আলোয় গীর্জ্জাটি বেশ দেখা যায়। ক্রমে সূর্য্যের আলো হ'য়ে ওঠে লাল, আর লাল আলোয় হঠাৎ ক্যাপ্টেন দেখতে পান, একটা কি যেন নড়ছে গীর্জ্জার চূড়োয়, চোখ রগড়ে তিনি আবার দেখেন, না এতক্ষণ ওটা ছিলনা ওখানে।

—বাতাসে উড়তে থাকে একটা লাল ঝাণ্ডা। *

শান্তি রায়

* একটি রুশ গল্পের ছায়াবলম্বনে।



মাষ্টার মশাই

জমিদার বাবু সকাল বেলায় বৈঠকখানায় বসেছিলেন, এমন সময় চাকরের সঙ্গে একটা লোক এসে উপস্থিত। লোকটীর গায়ে একটা ময়লা সার্ট, পরণে সাতহাত ধুতি, আর পায়ে তালিমারা চটি একজোড়া।

জমিদারবাবু তাকে রাশভারী চালে জিজ্ঞেসা করলেন—কি চাই?

—হুজুর, আমি একজন গরীব স্কুল মাষ্টার। আপনার কাছে যে কোনও রকমের একটি কাজ চাই।—লোকটী জবাব দিল।

জমিদারবাবু বললেন—স্কুলমাষ্টার নিয়ে আমি কি করবো?

—আমি যে কোনও কাজ করতে রাজী, হুজুর। শুনেছি আপনার একজন গোমস্তার দরকার।

—স্কুলের চাকরী ছাড়লে কেন?

—যে স্কুলে আমি চাকরী করতুম সেটা আগুন লেগে পুড়ে গেছে—মাষ্টার মশাই জবাব দিলেন।

—কতদিন আগে?

—আজ্ঞে, এই বছর শীতকালে। আমাদের গ্রামটাই সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। আজকাল চারিদিকেই আগুন লেগেছে। এইতো সেদিন খুব কাছাকাছি একটা বড় অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেল।

—কিছু যদি মনে না কর তবে জিজ্ঞাসা করি তুমি স্কুলমাষ্টারীর ব্যবসা ধরলে কি করে?

মাষ্টার মশাই জবাব দিলেন—আমি লেখাপড়া শেষ করে গ্রামেই ছিলুম দাদার বাড়ীতে। কাজকর্ম্ম কিছু পাইনি তাই দাদার ঘাড়েই বসে থাকতুম, তারপর গ্রামেরই জমিদারবাবুর ছেলেকে পড়াতে আরম্ভ করলুম মাসে তিন টাকা মাইনেয়। তবে ছেলে পড়ানর চেয়ে অন্য কাজই করতে হতো বেশী— চাকরের মতনই খাটতে হতো।

—চাকরের মত কেন?

—সত্যিকথা বলতে কি আমি বাড়ীর ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানী করতুম কেননা আমার ছাত্র পড়াশোনা একেবারেই করতে চাইতো না।

—বলো কি, গাড়োয়ানী করতে!

—তা কি করবো বলুন নেহাৎ দায়ে পড়ে— তবে কাজ ভালোই করতুম তাই তিন টাকা মাইনে ছাড়া খাওয়া থাকাও মঞ্জুর হয়ে গেল। জমিদারবাবু আমাকে একটা চোগাচাপকান দিয়েছিলেন। পোষাকটা পুরানো হলেও, বেশ জমকালো। আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে সেই চোগাচাপকান পরেই দাদার বাড়ীতে ফিরে এলুম। দাদা ত' আমাকে দেখেই অগ্নিশর্ম্মা, বললেন, কিছু হাতের কাজও ত' শিখতে পারো বসে বসে অন্ন ধ্বংস না ক'রে।

—তখন তুমি কি করলে?—জমিদার বাবু প্রশ্ন করলেন।

—দাদার কথা মত আমি বাড়ীতে বসে সারেগামা সাধা সুরু করলুম। কদিন বাদেই বাড়ীর সবাই আমার সুর ভাঁজায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। একদিন দাদা চটে মটে আমাকে বাবার কাছে চলে যেতে বললেন। তাই গেলুম। বাড়ীতেও আমার মিলল শুধু লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা। সবাই বলতে লাগলো বুড়ো ধাড়ী ছেলে শুধু বসে বসে বাড়ীর ভাত ধ্বংস করে। তা কি করবো বলুন, আমার করবার ছিল না কিছুই, মুখ বুঝে সব সহ্য করতুম। মাঝে মাঝে ভাবতুম—দুত্তোর বনে সাধু সন্নেসী হয়ে যাই আর ত সহ্য হয় না। এমন সময় দাদার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলুম—দাদার ওখানে গিয়ে এবার জমিদারবাবুর যাত্রা পার্টিতে গানের মাষ্টার হয়ে গেলুম। গানের কিছুই জানিনা বলে প্রথমটা একটু ভয় হয়েছিল, দাদা ভরসা দিলেন ও দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

জমিদারবাবু মাঝখানে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা তখনও সেই চোগাচাপকান পরেই ঘুরে বেড়াতে?

—না সেটা ততদিনে ছিঁড়ে গিয়েছিল। তখন হাতে শেলাই করে দেওয়া জামা কাপড় পরতুম।

—তারপর? তারপর কি হলো?

মাষ্টার মশাই বলে যেতে লাগলেন—তারপর দিনকতক আমরা খুব গান বাজনা অভ্যেস করতে লাগলুম। জমিদারবাবু থাকতেন সহরে, তাঁর গোমস্তা ছিলেন বেশ সমঝদার লোক—তিনি আমাদের দলের কাজ দেখে রীতিমতো আমাদের ভক্ত হয়ে উঠলেন। এমনকি আমার একটা মাস-মাইনের সুপারিশ করে বাবুকে সহরে চিঠি পর্য্যন্ত লিখলেন। এমন সময় একদিন সহর থেকে বাবু হুকুম পাঠালেন যে যাত্রার দল তুলে দেওয়া হোক—তাঁর সখ মিটে গেছে। কাজেই দায়ে পড়ে গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী নিতে হলো। একেই ত গ্রামের লোকেরা সবাই খুব গরিব তাছাড়া ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ইচ্ছেরও ছিল অভাব। কাজেই আমার ছাত্ররা অনেক সময় দল বেঁধে ভিক্ষেয় বেরোতো স্কুলের জন্যে—তাইতেই কোনও রকমে চলে যেতো। এমন সময় একদিন সহরের এক মস্ত বড় লোক, গ্রাম পরিদর্শনে এসে মন্তব্য করে গেলেন যে স্থানীয় অধিবাসীরা খুবই বিদ্যোৎসাহী। আর লোকমুখে শুনেছিলুম যে ইনি নিজেও খুব বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতব্বর একজন।

জমিদারবাবু বেশ মন দিয়েই গল্প শুনছিলেন, তিনি উৎসাহ দিয়ে বললেন,—তারপর, তারপর কি হলো?

—তারপর? তারপর এই ভদ্রলোক স্কুলের খাতায় লিখে দিয়ে গেছেন যে, স্কুলের মাষ্টারদের সকলেরই এক রকম পোষাক পরা উচিত। তাতে নাকি ছাত্রদের মনের ওপর তাঁরা বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। আর তা ছাড়া ছাত্রদের পোষাকও সকলের একরকম হওয়া উচিত।

জমিদারবাবু খুব উল্লসিত হয়ে উঠলেন—ঠিকই ত আমারও সেই মত। স্কুলের মাষ্টার আর ছাত্রদের জন্যে এই রকম একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যাক্‌গে—স্কুলে কোন কোন বিষয় পড়াতে তুমি? উত্তর হোল, সব কিছুই—যেমন ধরুন, পুরাণের গল্প, কোরাণের গল্প, মথিলিখিত সুসমাচার, দয়া-দাক্ষিণ্যের সোপান, পুষ্পসার, কথামালা—

—ব্যস্, আর কিছু না? জমিদার বাবু প্রশ্ন করলেন।

—না, এছাড়া আমাদের একটা বড় লাইব্রেরীও ছিল—তাতে বই ছিল বিস্তর, যেমন ধরুন—

পৃথিবীর ইতিহাস

মেয়েদের ব্রতকথা

বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন পাক

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

চারুপাঠ ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ

রাসলীলামৃত

সরল গৃহ চিকিৎসা

পারস্য উপন্যাস ও আরব্য উপন্যাস

ধর্ম্মের পরিণাম

মদ্যপানের পরিণতি

শিশুশিক্ষা ১ম ভাগ

জমিদারবাবু গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন—এ সবই ত বেশ ভাল বই – এর মধ্যে রাসলীলামৃত আর আরব্য উপন্যাস এই দুখানা বই আমি কিনতে দেবো নিজের জন্যে। বেশ তারপর কি হলো ?

—আমি আট বছর সেখানে চাকরী করলুম মাসে পাঁচ টাকা মাইনেতে। একদিন স্কুল-ইনস্‌পেক্টর এসে স্কুল দেখে খুব খুসী হয়ে আমার মাইনে বাড়াবার সুপারিশ করে গেলেন আর এও বলে গেলেন যে স্কুলের আঙ্গিনায় যে বাগান আছে তার উন্নতি করা একান্ত দরকার।

জমিদারবাবু বললেন—তাত বটেই—স্কুলের কাছে ভাল বাগান থাকলে ছাত্রদের মন প্রফুল্ল থাকবে। তারা পাড়শুনা করবার উৎসাহ পাবে।

—আমিও তাই করলুম—সঙ্গে সঙ্গেই বাগানের কাজে লেগে গেলুম. দুদিনেই বাগানের চেহারা ফিরে গেল···

জমিদারবাবু মাঝখান থেকেই বলে উঠলেন ভালো কথা, তুমি কি বিয়ে করেছ ?

মাষ্টার মশাই লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন. আস্তে আস্তে জবাব দিলেন আজ্ঞে না। সে ইতিহাস জিজ্ঞেস করে কেন লজ্জা দিচ্ছেন। একসময়ে মনে হ'ত যে আমার যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ। আমার জীবন সামান্য কটি মুহূর্ত্তের জন্যে রঙে রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি যে সামান্য মাইনের স্কুলমাষ্টার একথাটা আমার পাগলামির দিনেও ভুলে যেতে পারিনি। প্রেম যে খালি পেটে করা যায় না এ জ্ঞানটা আমার সুরু থেকেই ছিল।

জমিদারবাবু সান্ত্বনার সুরে বললেন—তাই নাকি – বড় দুঃখের কথা।

মাষ্টার মশাই বলে চললেন অভিভূতের মত—এই সময়ে একদিন গ্রামে আগুন লাগলো, সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল আমার স্কুল, আমার স্বপ্ন।

—স্কুলের লাইব্রেরীটাও বাঁচে নি ?

—বই গুলো বেঁচেছিল ; গ্রামের লোকেরা বইগুলোকে বাইরে নিয়ে এসেছিল।

—যাক্ তাহ'লে আবার যখন স্কুলের বাড়ীটা তৈরী হবে তখন তুমি তোমার চাকরীটা পাবে ?

—কিন্তু আমি আর মাষ্টারী করতে চাই না।

—সে কি, মাষ্টারী করার মত গৌরবের আর কিছু আছে নাকি? মাষ্টারীর বদলে তুমি চাও আমার সেরেস্তায় কেরাণীগিরি করতে—ছি ছি তাই কি কখনও হয়? আর তাছাড়া আমার এখানে চাকরীও খালি হয়নি। তোমার আবার সেই গ্রামে ফিরে যাওয়াই উচিত। আজ আমাদের দেশের এই দুর্দ্দিনে তোমরাই ত' জ্ঞানের মশাল জ্বেলে রাখবে, দেশের ভবিষ্যতদের সত্যিকারের পথ দেখাবে। না না মাষ্টারমশাই, তোমাদের মত লোকেদের এছাড়া আর কোনও কাজ নেই। তুমি ফিরে যাও গ্রামে···চাঁদা তুলে আবার পত্তন করো স্কুলের। কেমন?

মাষ্টারমশাই নিরুপায় হয়ে বললেন···বেশ তাই করবো আপনি যখন বলছেন।

আর দেখ,—জমিদারবাবু বললেন: আমার কতকগুলো বই আছে সেগুলো তোমার স্কুলে আমি দান করছি। সেগুলোকে যত্ন করে স্কুলে রেখো।

এই বলে জমিদারবাবু চাকরকে হুকুম করলেন বইএর বাণ্ডিল নিয়ে আসতে। নোংরা কাপড়ের একটী প্রকাণ্ড বাণ্ডিল এল। জমিদারবাবু মাষ্টার মশায়ের হাতে সেটি সমর্পণ করলেন। মাষ্টারমশাই প্রণামান্তে বিদায় নিলেন।

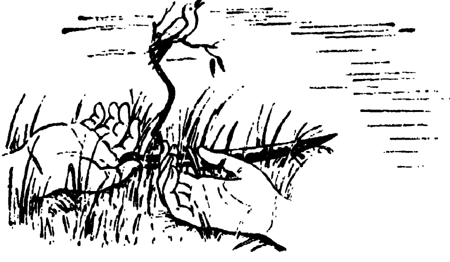
তারপর প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। সেই গ্রামবাসীদের চেষ্টায় স্কুলের বাড়ী নতুন করে তৈরী হয়েছে। স্কুলের লাইব্রেরীতে জমিদারবাবুর শিলমোহর আঁকা নতুন এই কখানি বই সংযুক্ত হয়েছে:

নিত্য ক্রিয়া পদ্ধতি।	অনুপান দর্পণ।
হিন্দু সর্ব্বস্ব।	পশু চিকিৎসা।
রেকর্ড কাকলী।	গার্হস্থ ভাণ্ডার।
মডার্ণ টিচার।	বশীকরণ ও কামরূপী তন্ত্র।
সিদ্ধ মুষ্টিযোগ	হরিদাসের গুপ্ত কথা।
ভৈষজ্য রত্নাবলী।	লক্ষ্মণের শক্তিশেল।
কলিকাতা গেজেট।	সহজ টেলারিং শিক্ষা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্কুলের সব কিছুই আবার সেই পূর্ব্বের মতন। অভাব কেবল একটি জিনিষের—মাষ্টারমশাই। গ্রামের লোকেদের মুখে শোনা গেল যে আগেকার মাষ্টারমশাই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। *

শিশির চট্টোপাধ্যায়

* রাশিয়ান গল্প অবলম্বনে



মুক্তি

প্রায় দেড়শ বছর আগের কথা। দেশটা রাশিয়া—'জার' জমীদার আর গোলামের (ভূমিদাস) দেশ। কাহিনী সুরু হ'ল রাশিয়ার এক প্রভুর বাড়ীতে। শীতকাল, তুপুর রাত! মোমের আবছা আলোয় প্রায় অন্ধকার মস্ত বড় একটা হলঘর। তুটো ছোট্ট ছেলে—বয়স হবে এক জনের আট—আরেকটির এগারো। তাদের দেখা গেল একটা লম্বা টেবিলে ঠেস দিয়ে মেঝেয় বসতে। মৃত্যুর মত গভীর নিস্তব্ধতা—কেউ কোথাও জেগে নেই। শুধু জেগে আছে ছোট্ট তুটি কেনা গোলামের বাচ্চা। তাদের মনিব-গিন্নী বাইরে বেড়াতে গেছেন, এখনও ফেরেননি। একা একা ভয়ে তাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে—ঘুমোতেও তারা সাহস পাচ্ছে না।

তুপুর রাত: ঠিক তুপুর রাত। এই সময়েই তো ভূতেরা সব বেরোয়। উঃ, ঘরটা কি বড়—কি অন্ধকার ঘরের কোণগুলো! ছেলে তুটো এ ওর দিকে তাকিয়ে যেন সাহস খুঁজতে লাগল। বড়টি যেন মোটেই ভয় পায়নি এই ভাবটা বজায় রাখতে চেষ্টা করছে, আর আট বছরের বাচ্চাটী ছেঁড়া জামার কোণ দিয়ে বরাবর তার জলভরা চোখ তুটো মুছছে। বরফে ঢাকা জানলার কাঁচের উপর থেকে আবছা ছায়া ভেসে আসছে—খড়খড়িগুলো হাওয়া লেগে করুণ শব্দ ক'রে উঠছে। বাইরের ঝোড়ো হাওয়ায় বরফের বড় বড় টুকরো-গুলো এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে পড়ছে।

শিশু তুটো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। বরফের শাদা ভুতুড়ে আলোয় ঝড়ের শব্দ যেন কোন ঘরছাড়াদের করুণ কান্না। ছায়ার জগত থেকে ভুতের দল বুঝি আজ ছাড়া পেয়েছে।

বড় ছেলেটির নাম ভ্যানিয়া—ছোটটির নাম মিশকা। মিশকা একটু রোগা, মাথায় সুন্দর ঘন চুল, বড়বড় নীল তুটো চোখ। সেই চোখ তুটো ভয়ে ভয়ে ঘরের এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। আর ঘন অন্ধকার কোণের দিকে চোখ পড়তেই ভয়ে শিউরে উঠছিল। ভ্যানিয়া স্বাস্থ্যবান—চোখের তারা কালো। সে ছোট্ট মিশকাকে সান্ত্বনা দেয়—নিজে কিছুই ভয় পায়নি এইভাব দেখায়। সে ভয় পায়না—মোটেই না। সে কেন ভয় পাবে? "এইত সেদিন আমি

নিজের চোখে একটা ভুত দেখলাম—সত্যিকারের ভুত। কই আমি তো ভয় পেলাম না—। চেঁচিয়েও উঠলাম না। সত্যি মিশকা আমি একটুও ভয় পাইনি"—বারে বারে ভ্যানিয়া এই কথা বলে মিশকাকে সাহস দিতে লাগল—আর একটুখানি শব্দেও চমকে উঠতে লাগল।

ছোট্ট মিশকা অস্ফুট গলায় বলল—"যদি আমরা পুড়ে মরি।"

"পুড়ে মরব! অসম্ভব!" এই এক কথায় মিশকাকে যেন সম্পূর্ণ শান্ত করে দিল ভ্যানিয়া।

খানিকটা চুপ করে থেকে মিশকা আবার বলল—আচ্ছা ভ্যানিয়া, খুব ধারালো ঠাণ্ডা ছুরি দিয়ে কাটলে কি খুব লাগে?

—প্রথমে একটু লাগে বইকি—কিন্তু আর পরে লাগেনা।—আদর করে মিশকার সুন্দর কোঁকড়া চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বিজ্ঞের মত ভ্যানিয়া উত্তর দিল।

—কিন্তু আমাদের রাঁধুনী মিহি যখন তার নিজের গলায় ছুরি বসিয়েছিল সেকথা তোমার মনে আছে কি? সে চেঁচিয়ে বলছিল 'আমি আমার গলা কেটে ফেলছি.' আর যখন সে ছুরিটা টেনে বার করল—উঃ সে কি রক্ত!

—ও মিহির কথা! মিহির কথা তুমি ভেবোনা—সে একটা ভীতু—মরতেও পারল না। ডাক্তাররা আবার তাকে বাঁচিয়ে তুলল। আবার তাকে মার খেয়ে মরতে হবে। আমরা যদি কখনো আমাদের গলায় ছুরি দিই আমরা কখনো আর বেঁচে উঠতে চাইব না। আমরা এত ভালো ভাবে গলা কেটে ফেলবো যে কোন ডাক্তার আর আমাদের বাঁচিয়ে তুলতে পারবে না।

—আর ছুরি—সেগুলো কি ঠিক আছে ভ্যানিয়া?

—শুধু ঠিক? আমি তিনদিন ধরে সেগুলোকে ধার দিয়ে রেখেছি। কিন্তু মিশকা তুমি কি শেষ পর্য্যন্ত পিছিয়ে যাবে? তুমি যা ভীতু।

মিশকা উত্তর দিলনা। শুধু একবার ফুঁপিয়ে উঠে তার বড় বড় নীল চোখ দুটো নিবন্ত মোমবাতির উপর রাখল। কাঁদা গলায় বলল—এটা কি একেবারে নিবিয়ে দেব?

—কি দরকার? ওটা নিজেই পুড়ুক। আমি যা বলছি শোন এখন। আমরা যা করবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছি তাই যদি ঠিকমত করি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই স্বর্গে যাব। আমরা ছোট ছেলে—অন্যায় কাজ এখনো আমরা বেশী কিছু করিনি। কিন্তু আমি বলে রাখছি মনিব-গিন্নী ক্যাটারিনা আফামাসিয়েভনা আমাদের অন্যায় কাজ করতে বাধ্য করানোর জন্য নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে! সে নরকে পচে মরবে—মরবে।

—আর ইভান্ ভ্যাসিলিচ্—সেও কি নরকে যাবে?

—ভগবান খুব দয়ালু, তিনি তাকে ক্ষমা করলেও করতে পারেন—কারণ সে একা হলে অতটা খারাপ লোক হত না।

—তাহলে ক্যাটারিনা তার অন্যায়ের জন্য শাস্তি পাবে?

—ওঃ নিশ্চয়ই—খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল ভ্যানিয়া। সেখানে তারা তাকে মস্ত বড় একটা লোহার পেরেকের সঙ্গে টাঙিয়ে বেদম মার লাগাব। মারতে মারতে গা দিয়ে রক্ত ফুটে বেরোবে। তারপর খালি পায়ে গরম ইটের উপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে—হয়ত সেই গরম ইটটা জিভ্ দিয়ে চাটতে বলবে, যেমন নাকি মনিব-গিন্নী সিয়েস্কা বেচারাকে কয়েকদিন আগে করতে বাধ্য করেছিল। হ্যাঁ ঠিক, এই রকম শাস্তিই সে পাবে। তাকে এমন ভাবে শাস্তি দেবে আর মারবে যে তা ভাবতেও লোকের গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়।

—কিন্তু কেমন করে সে তা সহ্য করবে?—ছোট্ট মিশকা ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল।

—তারাই তাকে তা সহ্য করাবে। সেই নরক পুরীতে কেউ কারো কান্নায় কান দেয় না। কেউ সহ্য করতে পারুক আর না পারুক তার যা শাস্তি পাবার সে পাবেই।

বাইরের উঠোনে কুকুরটা একটানা সুরে খানিকক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

—ট্রেজর নিশ্চয়ই কোন ভূতকে দেখতে পেয়েছে,—ভয়ে বিবর্ণ হয়ে মিশকা বলল।

—যত সব বাজে ভয়! ধর যদি দেখতেই পায়—ভয় পেতে তোমার লজ্জা করছে না।

—না ভ্যানিয়া, ভয় আমি পাইনি। কিন্তু কুকুরটা সব সময়ে কি করে টের পায় যে ভূত এসেছে?

—কারণ কুকুররা যে মানুষের বন্ধু—তারা মানুষকে ভালোবাসে। একটা ঘোড়া কখনও টের পাবে না, কিন্তু কুকুর বুঝতে পারে, তাই ভূতরা কাছে এলেই ওরা ঘেউ ঘেউ করে।

ভ্যানিয়া—মিশকা বাধা দিল—তার চেয়ে চল আমরা ডুবে মরি।

—কি বোকা তুই! এটা কি গরম কাল?

—তা নয় অবিশ্যি—খুবই ঠাণ্ডা জল, এত ঠাণ্ডা—আমরা হয়ত সইতেই পারবো না।

—ডুবে মরবো! প্রথমে আমাদের বরফের চাপকে ভেঙে নিতে হবে, তার পরেই তুই চেষ্টা করবি বেরিয়ে আসতে। দেখ্‌তো তখন কি কষ্ট! ছুরি দিয়ে মরা একেবারে অন্য ব্যাপার। জোরে গলায় চেপে দাও—আপনিই কাজ শেষ হয়ে যাবে। কেবল দেখবি হাত যেন না কাঁপে।

—তখন আর কেউ আমাদের মারবে না?—ছোট্ট মিশকা প্রশ্ন করল।

—না, না, আর কেউ আমাদের মারতে পারবে না। দেবদূতরা আমাদের আত্মাকে নিয়ে সোজা স্বর্গে ভগবানের পায়ের কাছে রেখে দেবে।

—ভগবান কি বলবেন ?

—তিনি বলবেন—আমার ছোট্ট সন্তানরা তোমরা শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলে না কেন ? তোমরা আত্মহত্যা করলে কেন ? আমরা তখন জবাব দেব প্রভু, বেঁচে থাকা বড় কঠিন। আমরা তাঁকে সব খুলে বলবো···ক্যাটারিনা কেমন করে আমাদের সব সময় মারতো, মারতে মারতে রক্ত বের করে দিত। কেমন করে আমাদের শাস্তি দিত।

মিশকা আগ্রহ ভরে শুনতে লাগলো। তার ছোট্ট মনে যে কষ্ট সে চেপে রেখেছিল তার চোখের জলের ভেতর দিয়ে তা ফেটে বেরিয়ে এল। ভ্যানিয়া তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করতে লাগল।

—শেষ বারের মত আমরা তাকে আমাদের চালাকি দেখিয়ে দেব। ক্যাটারিনা অনেক লোককে কাল নেমন্তন্ন করেছে—আমি তার সব ছুরি লুকিয়ে রেখেছি। কাল সে একটা ছুরিও কাউকে দেবার সময় খুঁজে পাবে না।

মিশকা কিন্তু কাঁদতেই থাকলো। ভ্যানিয়া মোমবাতিটা নিবিয়ে দিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।

—কি হাওয়া বাপ্‌রে।—তার পরেই গুন গুন করে একটা গান ধরল। মিশকা গান শুনে আরো জোরে কাঁদতে লাগলো।

—কি ছেলেমানুষের মত কাঁদছিস্‌ ?—অধীর ভাবে ভ্যানিয়া বলল।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে ঘড়ি ঢং ঢং করে বেজে উঠলো। মিশকা চোখের জল মুছে ভয়ে ভয়ে বলল—আমাদের মনিব-গিন্নী এখনই এসে যেতে পারেন।

—হ্যাঁ তাতো পারেনই। কিন্তু এখন যদি আমরা ঘুমোতে পারতাম কি মজার হত বল দেখি।

—না, না, ভগবানের দোহাই ভ্যানিয়া, ঘুমিয়ো না।

—ভয় পাচ্ছিস্‌ ?

—হ্যাঁ, আমার বড্ড ভয় করছে—মিশকা বলল।

—বোকা কোথাকার! কতবার তোমাকে বলব যে এ ঘরে ভয়ের কিছু নেই। তুমি যদি বল আমি উঠে গিয়ে দেখে আসতে পারি।—

নড়বার কোন লক্ষণ কিন্তু ভ্যানিয়ার দেখা গেল না। চারদিক নীরব নিঝুম। নিবন্ত মোমবাতির শিখার দিকে তাকিয়ে শিশু দুটি বহুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

আবার কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল

হতচ্ছাড়া কুকুর! মিশকা বলল।

ওলিয়া এখন কোথায় ?—হঠাৎ ভ্যানিয়া প্রশ্ন করল।

ওলিয়া মিশকার বোন। আঠারো বছর বয়স। হঠাৎ ছমাস আগে নিখোঁজ হয়ে যায়। কেউ বলতে পারেনা তার কি হোলো। কেউ বলে তিল তিল করে মরার চাইতে সে পালিয়ে বেঁচেছে। যা জানা যায় তা হচ্ছে এই যে একদিন সে কতগুলো কাপড় চোপড় ধুতে নদীতে যায়, তার পর আর তাকে দেখা যায়নি। কাপড়গুলো নদীর ধারে পাওয়া যায়। তার চলে যাওয়ার দুদিন আগে এরা তার চুলগুলো সব কেটে ছোট করে দিয়েছিল। যখন চুল কাটা হচ্ছিল ওলিয়া প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করছিল।

বাড়ীর দুএকজন সাহস করে বলেছিল যে ওলিয়ার দিন বড় কষ্টে কাটতো। কিন্তু বিচারক তাদের কথা এক বর্ণও বিশ্বাস করেন নি। তিনি তাদের বলেছিলেন—তোমাদের সত্যি কথা বলবার জন্য ডাকা হয়েছে মিথ্যা বলবার জন্যে নয়। শেষ পর্য্যন্ত তিনি মনিব-গিন্নী ক্যাটারিনাকেও ডেকেছিলেন। ক্যাটারিনা এসে বলেছিল গোলামেরা যে কেবল তার কাছে ভালো ব্যবহারই পায় তা নয় তাদের মাংসও খেতে দেওয়া হয়। তার কথা প্রমাণ করবার জন্য সে কয়েকজন সাক্ষীও হাজির করেছিল। বিচারক খানিকক্ষণ ইতঃস্তত করে রায় দিয়েছিলেন—

আর-জেলার জমিদারেরা যে কেবল গোলামদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করে তা নয়, তাদের মাংস পর্য্যন্ত খেতে দেয়।

এই ভাবে আইনতঃ ঐ ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয়েছিল। কিছু কাল জমিদার-গিন্নী ক্যাটারিনা একটু সামলে চলেছিল কিন্তু আবার তার স্বভাব পুরোমাত্রায় প্রকাশ পেতে লাগল। তাই বলে কি সবাই তাকে দুষ্টু আর নিষ্ঠুর স্ত্রীলোক বলে মনে করত? মোটেই তা নয়। তার বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা বড় কম ছিল না—তার বাড়ীতে লোকের ভীড় সব সময়েই থাকত। লোকেরা একথা জানত যে গোলামদের খেয়াল খুশী মত শাস্তি দেওয়া ক্যাটারিনার একটা খেলা, তারা এর ভেতর অন্যায় কিছু দেখতে পেত না।

একদিন খাবার সময় ঝোলের ভেতর একটা আরশোলা পড়েছিল। ক্যাটারিনা রাঁধুনীকে ডেকে পাঠালো তারপর তাকে হুকুম করল ওটা খেয়ে ফেলতে। জমিদার-গিন্নীর বন্ধুরা কেউ কোন রকম আপত্তি জানালো না।

আরেকদিন সে সিয়েঙ্কাকে বলল—সিয়েঙ্কা গরম ষ্টোভটা জিভ দিয়ে চাট্‌। সিয়েঙ্কা অবাধ্য হতে সাহস করেনি। ফলে তার জিভ একদম ঝলসে গেল, যন্ত্রণায় মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল—চুল পর্য্যন্ত ঝলসে গেল, চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বোকা কোথাকার। সামান্য বিষয় নিয়ে কি রকম করছে!—একজন বলে উঠল।

একদম বুদ্ধি নেই।—আরেকজন বলল। তারপর জমিদার-গিন্নীর বন্ধুরা সকলে মিলে হো হো করে হেসে উঠল।

মিশকার শিশু হৃদয় তার বোন ওলিয়ার চিন্তায় ভারী হয়ে উঠল। মাথা নীচু করে সে চোখের জল মুছতে লাগল।

ভ্যানিয়া বলতে লাগল— ওলিয়া ফিরে এসেছে। সেদিন নাকি সে মনিব-গিন্নীর কাছে এসেছিল।

—একদম বাজে কথা— মিশকা চেঁচিয়ে উঠল।

—না কথাটা সত্যিই। ওলিয়া ফিরেছে। ম্যাট্রেনা বলছিল মনিব-গিন্নী নাকি ঘর থেকে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ছুটে বেরিয়ে এলেন।

—না, না, মিথ্যে কথা। ওলিয়া বেঁচে আছে—সে ডুবে মরেনি।—ফোঁপাতে ফোঁপাতে মিশকা বলল।

—ও, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই মিশকা। ওলিয়া ডুবেই মরেছে।

—মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা।—কান্না ভরা গলায় মিশকা বলতে লাগল।

—একেবারে ছেলে মানুষ! এ নিয়ে এত ভাববার কি আছে? কয়েক ঘণ্টা পর আমরাই যখন মরে যাচ্ছি!

মিশকা চুপ করল। পর পর কত ঘটনাই তার মনে ভেসে আসতে লাগল। তার মনে হল ওলিয়া তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—আদর করে তার গালে হাত দিয়ে তেমনি মিষ্টি করে বলছে—দুষ্টু ছেলে। নতুন কোন জামা তার জন্য তৈরী করলে কত খুশী হয়ে ওলিয়া এসে হাসি মুখে বলত, ভাইটি তোমার জন্য তৈরী করলাম—তুমি পর। তার পর মিশকার মনে পড়ল সেই ছবি। ওলিয়া কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। সুন্দর মুখ যন্ত্রনায় কালো হ'য়ে উঠেছে, রেশমের মত নরম চুল একদম ছোট করে কাটা—সে কেবলি কাঁদছে আর মনিব-গিন্নীর দয়া ভিক্ষা করছে। তার সেই ক্ষমা প্রার্থনা আজও মিশকার মনে পড়ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওলিয়া বলছে—ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও। আমি আর এরকম করবো না। আমার চুলগুলো সব কেটোনা—দোহাই তোমাদের। তারপর চুলগুলো খোঁপা শুদ্ধ যখন মাটিতে পড়ছে তখনকার সেই বুকফাটা চীৎকার।

স্পষ্ট ভাবে এসব ছবি মিশকার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। যেন মিশকার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ওলিয়া—মিশকা যেন তার গলা শুনতে পাচ্ছে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার।

—ভ্যানিয়া, ভ্যানিয়া, তুমি কি দেখতে পাচ্ছনা—ঐ যে ওলিয়া দাঁড়িয়ে—শুনতে পাচ্ছ তার কথা?—ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল মিশকা।

চট্ করে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে ভ্যানিয়া বলল—এই মিশকা। এই বার তুই যে মিথ্যে কথা বলছিস।

—আমি শপথ করে বলতে পারি। —জোর গলায় মিশকা বলল।

—আমি বলছি সে আসেনি। কেনই বা আসবে? সেকি আমাদের কষ্ট বাড়াতে চায়? ভুতরা ত লোকদের কষ্ট দিতেই আসে। ওলিয়া কেন আমাদের কষ্ট দেবে? সে কত ভালো— কত ভালোবাসে আমাদের।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি, আমি জানি ওলিয়া কত ভালো। —যন্ত্রের মত মিশকা উচ্চারণ করল।

—আচ্ছা দাঁড়াও, আমি চারদিক ভালো করে দেখে আসি—যেন মিশকাকে নিশ্চিন্ত করতেই বলল ভ্যানিয়া। সে টেবিলের নীচে, ঘরের কোনে আধখোলা দরজার ভেতর দিয়ে বাইরে বার বার তাকাতে লাগল। কিছুই দেখা গেলনা।

—দেখেছ, মিশকা কিছুই দেখতে পেলাম না।

করুণ প্রতিধ্বনির মত মিশকার গলা দিয়ে বেরোলো—ওলিয়া যে ভালো।

হ্যাঁ—ভ্যানিয়া বলল—তাই তো আমরাও তাকে ভালোবাসি। তুমি জান ষ্টেপকা তাকে কত ভালোবাসতো। সে ওলিয়াকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সেজন্য তাকে ওরা জেলে পুরে রেখেছিল। ওলিয়া যখন ডুবে মরল তখন ষ্টেপকা মনিব-গিন্নীর কাছে গিয়ে বলল আমি যুদ্ধে যাব। আপনার কাছে কাজ করার চাইতে ফৌজের কাজ ঢের ভালো। তার জবাবে সে শুনতে পেল—না ষ্টেপকা, তুমি যুদ্ধে যেতে পাবে না—তার চাইতে রাখালের কাজ কর গে। তোকে তাই করতে হচ্ছে।

—আচ্ছা ভ্যানিয়া, যারা যুদ্ধে যায় তাদের কি খুব কষ্ট?

—বলতে পারি নে। তবে আমাদের চাইতে বেশি কষ্ট নয়। ওঃ মিশকা, কি কষ্টের জীবন আমাদের। —ভ্যানিয়ার সারা শরীর শিউরে উঠল।

—মিশকা, চল আবার আমরা ঘরগুলো ঘুরে আসি।

—হ্যাঁ, চল, শেষ বারের মত। —চুপি চুপি মিশকা বলল।

ভ্যানিয়া এগিয়ে চলল—এইটে হল ঘর—বলতে বলতে চলল ভ্যানিয়া।

এইটে হলঘর—সঙ্গে সঙ্গে মিশকা বলে উঠল।

—ঘরের চার কোনায় প্রণাম কর মিশকা।

মিশকা চার বার প্রণাম করল।

প্রত্যেক ঘরেই তারা চারবার করে প্রণাম করতে করতে চলল। শেষ পর্য্যন্ত তারা তাদের শোবার ঘরে এল

—আয় মিশকা আমরা আলোগুলো জ্বেলে দিই।

মিশকার নীল চোখ দুটো মুহূর্ত্তের জন্য খুশীতে জ্বলে উঠল,—ছোট্ট মিশকার বিষণ্ণ মুখে

এইবারে একটু হাসির আভাস দেখা গেল। তারপর তারা দুজনে খেলা করতে বসল— মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে। খাবার টেবিলে ডিশগুলো সাজিয়ে মিশকা খেতে দিল ভ্যানিয়াকে — ভ্যানিয়া যেন তার নিমন্ত্রিত অতিথি।

হঠাৎ সদর দরজার ঘণ্টা সজোরে বেজে উঠল।

মিশকা আর ভ্যানিয়া ভয়ে কেঁপে এক লাফ দিয়ে উঠে আলোগুলো নিভিয়ে দিতে লাগল। দ্বিতীয় বার আরো জোরে ঘণ্টা বাজল। এতক্ষণে আলোগুলো ওরা নিভিয়ে দিতে পারল। পাশের দরজা দিয়ে দৌড়ে পালাবার সময় তাদের কানে পৌঁছল মনিব-গিন্নীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

—হতভাগা ছোঁড়ারা কি করছিস্ তোরা? এতক্ষণ ধরে ঘণ্টা বাজাচ্ছি খোলবার নামই নেই।

মনিবের গলা শোনা গেল ব্যস্ত হয়ো না, বোধহয় আমাদের ভাই নিকানর এসেছে, তাই ওরা দেরী করছে।

দরজা খুলে ভ্যানিয়া এই সময়ে বেরিয়ে এল।

—বাড়ীতে কেউ এসেছে কি? খুব রাগের সঙ্গে প্রশ্ন করল মনিব-গিন্নী।

ভ্যানিয়া জবাব দিল — না কেউ তো আসেনি।

—তবে কার এত বড় সাহস যে আলোগুলো জ্বেলেছে?

—কেউ না।

মিশকার ঘাড় ধরে মনিব-গিন্নী আবার জিজ্ঞেস করলেন — বল কে আলো জ্বেলেছে।

কেউ না। — মিশকা বলল।

হঠাৎ ভ্যানিয়া ঝাপিয়ে পড়ল তার সবটুকু শক্তি নিয়ে মনিব-গিন্নীর উপর। যেন সে নখ দিয়ে তার চোখ মুখ সব ছিঁড়ে ফেলতে চায়। কোন মন্ত্রবলে যেন তার সব ভয় ডর চলে গিয়েছে। সে পাগলের মত চীৎকার করতে করতে বলল — আর বেশিক্ষণ আমাদের এ ভাবে শাস্তি দিতে তুমি পারবে না।

মনিব-গিন্নী ভ্যানিয়ার প্রচণ্ড আক্রমণে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। এত জোরে ভ্যানিয়া তাকে ধরেছিল যে ছাড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তাকে জোর করে ছাড়িয়ে রান্নাঘরে বন্ধ করে রাখা হল। সেখানে সে আহত পশুর মত গর্জ্জাতে লাগল।

আশ্চর্য্যের কথা ওরা দুজনে সে রাত্রিতে আর কোন শাস্তি পেলনা। ভ্যানিয়া ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ছোট্ট মিশকা তার কোলের কাছ ঘেঁসে শুয়ে রইল — কিন্তু তার চোখে আজ আর ঘুম এলনা। সে শুধ্ ভাবতে লাগল কাল তাদের কপালে কি নিগ্রহই না লেখা আছে—আর ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠল ওলিয়ার মুখ—কানে বাজল তার কণ্ঠস্বর। কিন্তু ওলিয়া তো যে পোষাক পরতো তা পরেনি

আজ –। তার পরণে আগাগোড়া স্বচ্ছ পোষাক আর কোঁকড়ানো চুলের ওপর ঝকঝকে, উজ্জ্বল মুকুট। প্রায় তিনটের সময় মিশকা ঘুমিয়ে পড়ল। চারটে বাজতে না বাজতেই ভ্যানিয়া তাকে জাগালো – এই ওঠ্ সময় হয়েছে।

মিশকা কলের পুতুলের মত উঠে দাঁড়ালো। সে কি করছে আর কোথায় যাচ্ছে কিছুই না বুঝে পোষাক পরতে লাগলো। তার পর তারা বাইরে ঠাণ্ডা খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালো। ভ্যানিয়ার হাতে একটা কাঁচি। সে তার জামা সেই কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে লাগলো – তার পর জুতোটাও সেই ভাবে কেটে ফেলে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মিশকা এক ভাবে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। তার শিশু মনে কেবলি এই চিন্তা হতে লাগল তারা আর বেঁচে থাকবেনা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মিশকা কাঁদতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে ভ্যানিয়া বলল – ছেলে মানুষের মত কাঁদবি তো গিয়ে ঘুমোগে যা।

– না, না, ভ্যানিয়া, তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না।

– তবে কাঁদছিস কেন ? এটাই যে আমাদের শেষ রাত্রি সে কথা কি ভুলে যাচ্ছিস্ ?

তারা উঠোন পার হয়ে এল। কুকুরটা আনন্দ ধ্বনি করতে করতে তাদের দিকে ছুটে এল। ভ্যানিয়া তার দিকে চাবুক তুলে ধরতেই সে আবার ফিরে গেল। শীতের সকাল, ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় ভ্যানিয়ার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনী ধরে গেল। তারা চলে এলো। খোলা মাঠ তখন জনশূন্য। চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। একটা গভীর খাত দেখা গেল তাদের সামনে।

ভ্যানিয়া আগে লাফিয়ে পড়ল। মিশকা তারপর। বাঁচবার প্রচণ্ড ইচ্ছা যেন প্রতি মুহূর্ত্তে তার পায়ে পায়ে বাধা দিচ্ছে। ভ্যানিয়াও যেন এই সময়টুকুর জন্য বাঁচতে চায়। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার সারা শরীর কাঁপতে থাকলেও মনে তার আগুন জ্বলছে।

সোজা এগিয়ে চলল ভ্যানিয়া ছুরিতে ধার দিতে দিতে। সেই শব্দে মিশকার ছোট্ট বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। কিন্তু তবুও অন্ধের মত সে পিছু পিছু যেতে লাগল।

পরদিন সকাল বেলা। দুজন চাষীর হল্লায় বাড়ীর রাখালের গভীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারা নাকি খাতের ভিতর থেকে করুণ কান্না শুনতে পেয়েছে। সাহায্যের জন্য অসহায় চীৎকার জনহীন প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্ছে। তারা তখন ছুটে গেল খাতের ধারে। দেখতে পেল দুটি শিশুকে – প্রায় অর্দ্ধনগ্ন আর রক্তাক্ত শরীর।

ভ্যানিয়া শুয়ে আছে শান্ত ভাবে – হিমশীতল প্রাণহীন দেহ। তার হাত কাঁপেনি একটুও। মিশকার নিঃশ্বাস তখনও একটু একটু পড়ছে। তার ছোট্ট হাত আঘাত করেছিল ঠিকই কিন্তু দুর্ব্বলভাবে বাঁচবার স্বাভাবিক ইচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত তার ছোট্ট বুকের মধ্যে লড়াই চালিয়েছে।*

মঞ্জু আচার্য্য

* একটি রাশিয়ান গল্পের অনুবাদ।


নাটক

আমেরন

—ক্লিফোর্ড ওডেটস্

প্রথম দৃশ্য

১৯৩৫ সাল। বার্লিনে গোপন আন্দোলনকারীদের আস্তানা।

বেঁটেখাটো একটি লোক হেক্টোগ্রাফ মেসিনে কি ছাপাচ্ছে। তার নাম বাউম। তার পাশে দু'ভাই আর্ণষ্ট আর কার্ল টাউসিগ। ঘরের একধারে একটা টেবিল কাগজপত্র এলোমেলো ভাবে সেখানে ছড়িয়ে আছে। একটি মেয়ে ঘাড় গুঁজে বসে লিখছে। তার নাম টিল্লি হেবস্টারমান। দু'ভাই এতক্ষণ ছাপা দেখছিল, এবার কার্ল মেসিন থেকে সম্ভ-ছাপা একখানা ইস্তাহার তুলে নিলো।

কার্ল। একখানা স্টেনসিলে আর কতগুলি ছাপা চলবে?

বাউম। আর শ' খানেক।

আর্ণষ্ট। যথেষ্ট। ওতেই চলবে। এই ইস্তাহার খানা মজুরদের হাতে পড়লে আমাদের নাৎসি বন্ধুদের অবস্থা কি হয় দেখো। দর দর করে ঘাম ছুটবে, অস্থির হয়ে উঠবে। আমেরিকা তো এই দু' মাসে জার্মানীর মাল কেনা কমিয়ে দিয়েছে, আর তারই ফলে মজুরীও তো তিন ভাগের এক ভাগে এসে ঠেকেছে। অথচ খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে হু হু করে।

টিল্লি। (মুখ না তুলে) গোলমাল কোরো না কমরেড।

আর্ণষ্ট। কাকে বলছে দেখ না! তিরিশ ঘণ্টায় এক মিনিটের জন্যে চোখ বুজিনি সে কথা ও জানে!

কার্ল। ডোডো, শরীরের দিকে একটু নজর দাও। এই তো সেদিন অসুখ থেকে উঠলে, এখনি—

আর্ণষ্ট। এখনি এমন চাঙা হয়ে উঠেছি—এই কথাই বলবে তো? তোমাকে আমি এমনি করে আঙুলে করে তুলতে পারি জানো।

কার্ল। (হেসে) চেষ্টা করে দেখনা। (দুজনে খানিকক্ষণ হাতাহাতি হোলো)

টিল্লি। কমরেড, গোলমাল কোরো না!

কার্ল। বেশ, এই চুপ করলাম! (ইস্তাহার তুলে নিয়ে) আমি কতগুলো নেব?

আর্ণষ্ট। দুশো। জেলৎনারকে দেবে। সে বিলি করবার ব্যবস্থা করবে।

কার্ল। আর্ণষ্ট! কথাটা বলে ফেলাই ভালো। জেলৎনারকে আমি বিশ্বাস করি না।

আর্ণষ্ট। কেন?

কার্ল। সে সাহসী, উদ্দেশ্যের জন্য সে মরতেও প্রস্তুত, গলাবাজি করে সে কথা সে জাহির করতেও ছাড়ে না। কিন্তু অদম্য তার কৌতূহল।

আর্ণষ্ট। ওঃ এই ব্যাপার! খতিয়ে দেখা যাবে ভাবপ্রবণতাই এর কারণ।

কার্ল। সে আমার কাছে এই আস্তানার ঠিকানা জানতে চেয়েছে। একেও কি ভাবপ্রবণতা বলবে?

আর্ণষ্ট। ঠিকানা জানতে চেয়েছে?

কার্ল। হাঁ, আজ ভোরেই। আমি তাকে বলে দিয়েছি, বার্লিন প্রকাণ্ড শহর, এখানে কে কার খোঁজ খবর রাখে!

আর্ণষ্ট। তারপর?

কার্ল। না, আর কোনো কথা হয়নি।

আর্ণষ্ট। আমরা যে কোনো মুহূর্তে সরে পড়বার জন্যে তৈরী। ছাপা শেষ হলেই বাউম মেসিনটা সরিয়ে ফেলবেথন। তুমি যাও গিয়ে ইস্তাহারের বাণ্ডিলটা জেলৎনারকে দিয়ে এস।

কার্ল। কিন্তু---

আর্ণষ্ট। এর ভিতর কিন্তু নেই কার্ল। ইস্তাহার দিয়ে ওকে আমরা পরখ করে দেখব, ও কেমন লোক।

কার্ল। ঠিক বলেছ তুমি, আমরা পরখ করে দেখব।

বাউম। (আপন মনে) কি শান্তিতেই ছিলাম, টুলিপ লাগিয়েছিলাম লাল লাল ফুল যখন ফুটতো .....(দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো)

আর্ণষ্ট। কার্ল, গলি দিয়ে যেও।

টিল্লি। (মাথা না তুলে) কমরেডদের নাম ধরেই এখন থেকে ডাকা হবে, পদবী ধরে নয়, সবাইকে একথা বলে দিতে ভুলো না।

বাউম। (গুণ গুণ করে গান ধরলো)

কার্ল। ফ্রেডার ওখানে কি আজ রাতে তোমরা আসতে পারবে? বাখ্ শোনা যেতথন।

আর্ণষ্ট। কাজের বহর দেখেছ তো? এখন কি আর বাজনা বাজাবার ফুরসৎ আছে?

কার্ল। পাঁচ মাসের ভিতরে তো দেখা হয়নি তাই বলছিলাম।

বাউম। আমার বাবা গান-বাজনা মোটেই পছন্দ করতেন না।

আর্ণষ্ট। আর হাতের আঙুলও কোমল হয়ে গেছে! মনে হয় ছড় টানতে গেলে তাল কেটে যাবে। সত্যি ছ' মাস হয়ে গেল, বেহালা ছুঁইনি।

কার্ল। আচ্ছা, কাল দেখা হবে।

আর্ণষ্ট। (তাকে থামিয়ে) কার্ল, এক মিনিট দাঁড়াও। তোমার মনের কথা আমি টের পেয়েছি। যখনই আমরা পরস্পরের বিদায় নিই, দুজনেই কি ভাবি জানো? কখন আবার আমরা দুজনে দুজনের দেখা পাব......কাল কি হবে? আজই কি আমাদের শেষ দেখা?

কার্ল (ঠাট্টার স্বরে) দেখ, দেখ, মনের গহনের ডুবুরীকে দেখ!

আর্ণষ্ট। না, না ঠাট্টা নয়। খুব সাবধান। তোমার মাথা গরম, বিপদে পড়লে উত্তেজিত হোয়োনা।

কার্ল। (হেসে) তোমার ছোট ভাইয়ের জন্য ভেবোনা। সে সাপের থেকেও পিছল। মুঠোয় চেপে ধরতে গেলে ফসকে যাবে।

আর্ণষ্ট। জানি, জানি। তুমি সাবধান।

কার্ল। নিশ্চয়ই। (দুজনের দুজনে হাত মুঠোয় চেপে) আমি রাস্তায় বেরুলেই কি করি জানো, গলা ছেড়ে গান গাই। ওরা ভাবে—অমন করে যে গান গাইতে পরে, সে নিশ্চয়ই গোপন আন্দোলনকারীদের কেউ নয়।

টিল্লি। গলা ছেড়ে গান গাইবার এটা জায়গা নয় কমরেড। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে যতো খুসি গান গাও।

কার্ল। (হেসে) তাইত! বড় ভুল হয়ে গেছে। বিদায়!

আর্ণষ্ট। বিদায়!

টিল্লি। দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে যাও।

বাউম। দেখো, ওদের কাছে ধুম খেও না! (কার্ল চলে গেল)

আর্ণষ্ট। ওকে আমি জেলখানায় পচতে দিতে রাজি নই। এমিলকে কাল ওরা গেপ্তার করেছে। (বাউমের কাছে গিয়ে) কমরেড, আর কত দেরি?

বাউম। না, আর দেরি নেই, হয়ে গেছে।

আর্ণষ্ট। বেশ!

বাউম। খুব চটপটে আছি।

টিল্লি। বাবার কাছ থেকে শিখেছ বুঝি?

বাউম। (মেসিন সাফ করতে করতে) আমার বাবার কথা বলছ? তাকে দেখলে বুঝতে পারতে কেমন লোক। ফন্ হিণ্ডেনবার্গের মস্ত চেলা। ১৮৭০ সালে কর্পোরাল হয়েছিল, আজ বেঁচে থাকলে কি হোত জানো, গত যুদ্ধের বীর। নাৎসী-তকমা এঁটে মজুর খুন করে বেড়াত।

আর্ণষ্ট। কটা বাজে?

বাউম। (ঘড়ি দেখে) সাতটা।

আর্ণষ্ট। জেলদা কোথায়?

টিল্লি। ছটায় ফিরবে বলেছিল।

আর্ণষ্ট। রোজই তো ঠিক সময়ে ফেরে। আজ এতো দেরি হচ্ছে কেন?

টিল্লি। জেলদা ভেঙে পড়বার মেয়ে নয়। তিন মাস হুগোর কোনো খবর নেই, কিন্তু ও ঠিক কাজ করে যাচ্ছে।

বাউম। হুঁ, হুগো কি আর বেঁচে আছে! এতদিনে সাবাড় হয়ে গেছে। (ছেঁড়া কোটটা হুক থেকে নিয়ে গায়ে পরলো)

আর্ণষ্ট। কিছু পয়সা নিয়ে যাও। রাতে খেতে হবে তো ?

বাউম। (লজ্জিত হয়ে) না, না, পয়সার দরকার নেই।

আর্ণষ্ট। বেশ ! দরকার না থাকে, নিও না।

বাউম। চলি কমরেড ! দেখো, ঘুষ খেওনা যেন। (প্রস্থান

টিল্লি। বেশ লাগে ওকে।

আর্ণষ্ট। সত্যিকারের কাজের লোক। (আর্ণষ্টের মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে)

টিল্লি। আর্ণষ্ট ! কি হোলো তোমার ?

আর্ণষ্ট। কিছুনা। শরীর থেকে এখনো রোগের বীজাণু যায়নি দেখছি। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি টিল্লি।

টিল্লি। আমি বলি, একমাস বিশ্রাম নাও। তুমি নিশ্চয়ই বলবে, কাজ করবে কে ?

আর্ণষ্ট। সত্যই তো, কাজ কে করবে ?

টিল্লি। আমি করবো।

আর্ণষ্ট। একা ?

টিল্লি। হাঁ, একা।

আর্ণষ্ট। অসম্ভব। (বাইরে দরজায় কে ঘা দিচ্ছে) কে এলো ? জেলদা ?

টিল্লি। (মৃদুস্বরে) দেখছি। (টিল্লি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বাইরে চলে গেল। আর্ণষ্ট এলিয়ে পড়ে, টিল্লি জেলদাকে নিয়ে ফিরে আসতেই সে আবার সোজা হয়ে বসলো)।

আর্ণষ্ট। এত দেরী হোলো কেন জেলদা ?

জেলদা। আমি...আমি...(জেলদা টেবিলে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো)

আর্ণষ্ট। কি হয়েছে ?

টিল্লি। (আস্তে আস্তে) হুগো।—(আর্ণষ্ট জেলদার কাছে গেল, সান্ত্বনার ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছে না। জেলদা ইতিমধ্যে মুখ তুলে চোখের জল মুছে ফেলতে শুরু করেছে)

জেলদা। আজ ভোরেই খবর পেলাম। জানলা দিয়ে সে লাফিয়ে পড়েছিল। ওর মার কাছে দেহ পাঠিয়ে দিয়েছে। আজকের রাতটা ওখানেই থাকব—কি বল ?

আর্ণষ্ট। নিশ্চয়ই।

জেলদা। কিন্তু আগে ইস্তাহার বিলি করতে হবে। এই বাণ্ডিলটা তো ? (আর্ণষ্ট মাথা নাড়লে) কবরখানায় কাউকে যেতে বারণ করে দিও। ওরা ফাঁদ পাতবে।

আর্ণষ্ট। (উত্তেজিত হয়ে) টিল্লি, টিল্লি ! চলো পার্কে গিয়ে বসি। মাথাটা কেমন গরম হয়ে উঠেছে।

টিল্লি। এখনো অনেক কাজ বাকি। এই কটা নাম তোমাকে মুখস্থ করতে হবে।

আর্ণষ্ট। দেখি তালিকাটা দাও তো ? শ্পিৎসার কে ?

টিল্লি। রোসেনফেল্ড বোধ হয় ?

আর্ণষ্ট। স্ট্রাসার ?

টিল্লি। আমার ভাই হান্‌স্।

আর্ণষ্ট। কতদিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি ?

টিল্লি। তা মাস কয়েক হোলো ?

আর্ণষ্ট। (দরজায় করাঘাতের শব্দ হোলো, মৃদু শব্দ। ওরা চুপ করে গেছে) কে যেন দরজায় ঘা দিচ্ছে।

টিল্লি। (কান পেতে) দাঁড়াও, দেখছি (জোরে শব্দ হোলো)

আর্ণষ্ট। সাড়া দিও না। (তালিকাখানা টুক্‌রো টুকরো করে) নাম'কটা মুখস্থ করে ফেল।

স্বর (বাইরে) দরজা খোল !

(আর্ণষ্ট মনে মনে নামগুলো আওড়াতে লাগলো)

স্বর। (শব্দ বেড়ে চলেছে) খোলো, দরজা খোলো।

টিল্লি। গেস্টাপো !

আর্ণষ্ট। জেলৎনার, বিশ্বাসঘাতক জেলৎনার !

[অন্ধকার হয়ে গেল রঙ্গমঞ্চ, দরজায় ধাক্কা প্রচণ্ড ধাক্কা পড়ছে। কানে আসছে তীব্র হুইসল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

নাৎসি কোতোয়ালির অফিসার। একজন মোটাসোটা ডিটেক্‌টিভ ফোন করছে। কয়েকজন নাৎসি-উর্দি-পরা আর্দালী বেঞ্চের উপর বসে আছে। আর্ণষ্ট টাউসিগ টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

পপার। (উত্তেজিত হয়ে ফোনে কথা বলছে) হাঁ, হাঁ, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। সারাদিন বসে থাকব নাকি ? কি বলছ ? হাঁ, কাল ধরা পড়েছে। (ফোন রেখে দিয়ে আর্ণষ্টের দিকে তাকিয়ে) কোথায় এসেছ জানো ?

আর্ণষ্ট। হাঁ।

পপার। কলম্বিয়া ব্রাউন হাউসে এলে কমিউনিস্টদের কি দশা হয় জানো ?

আর্ণষ্ট। হাঁ, তাও জানি।

পপার। লিণ্ডেন ষ্ট্রীটে কোনোদিন ছিলে না—একথা তুমি বলেছ ?

আর্ণষ্ট। হাঁ।

পপার (আর্দালির দিকে তাকিয়ে) শুনছ, লিণ্ডেন ষ্ট্রীটে কখনো ছিল না। গোপন আন্দোলনের কোনো বে-আইনি কাগজপত্র তোমার কাছে ছিল না ?

আর্ণষ্ট। না।

পপার। (উত্তেজিত হয়ে) মিথ্যাবাদী ! আচ্ছা, তোমার জবানবন্দি আমি লিখে রাখছি। (লিখতে লিখতে) এবার হার্ড কোম্পানীতেই তোমার শেষ চাকরী তো ?

আর্ণষ্ট। হাঁ।

পপার। লিখে রাখো—এবার হার্ড কোম্পানীতে সে শেষ চাকরী করে। (নিজেই লিখে রাখলো। ঝঞ্ঝা বাহিনীর একজন সৈনিক ঘরের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছিল, আর্ণষ্টের কানে কানে কি বলে গেল—শেষ কথাটা শোনা গেল—'সাহস'।) জানো, আমরা যা খবর পেয়েছি, তাতে তোমাকে এখনি জাহান্নামে পাঠাতে পারি। তিন সপ্তা ধরে কড়া নজর রেখেছিলাম, তবেই না লাল খেঁকশিয়াল ফাঁদে ধরা পড়েছে। (ক্যাপটেন শ্লেগেল ঘরে ঢুকলেন) সুপ্রভাত, ক্যাপটেন শ্লেগেল।

শ্লেগেল। এই সেই লোক ?

পপার। হাঁ।

শ্লেগেল। বে-আইনি কাগজপত্র কিছু পাওয়া গেছে ?

পপার। না, গ্রেপ্তারের আগেই সরিয়ে ফেলেছিল।

শ্লেগেল। লাল যোদ্ধা নাকি ?

পপার। হাঁ, খাঁটি লাল।

শ্লেগেল। লেখক ?

পপার। ওদের দলের কাগজের সম্পাদক ছিল।

শ্লেগেল। (রিপোর্ট পড়তে পড়তে আর্ণষ্টের দিকে তাকিয়ে) তুমি কি বল ?

আর্ণষ্ট। হাঁ, একসময় পার্টির কাগজ চালাতাম।

পপার। ওঃ এখনতো ভিজে বেড়াল ! অথচ ছাড়া পেলে দুবার করে রাইখস্টাগ পোড়াবে।

শ্লেগেল। কিহে রিপোর্টের আর আধখানা কোথায় ?

পপার। ওরা খুঁজে পেল না।

শ্লেগেল। সাবধান পপার ! এই অক্ষমতা আমরা সহ্য করবো না।

পপার। (ভয়ে ভয়ে) যথাসাধ্য করেছি, কিন্তু উপায় নেই।

শ্লেগেল। যাক্‌গে। ভালো কথা, কমিউনিস্ট পার্টিতে কতদিন থেকে আছ ?

আর্ণষ্ট। ১৯১৩ সাল থেকে।

শ্লেগেল। বে-আইনি দলের সঙ্গে এখন আর তোমার সম্বন্ধ নেই ?

আর্ণষ্ট। না।

শ্লেগেল। বিদেশীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে ?

আর্ণষ্ট। না।

শ্লেগেল। শুনেছি, একজন বুলগেরিয়ানের সঙ্গে তোমার খুব ভাব ?

আর্ণষ্ট। ভুল শুনেছেন।

শ্লেগেল। বিয়ে করেছ ?

আর্ণষ্ট। না।

শ্লেগেল। ছেলেপুলে আছে ?

আর্ণষ্ট। (হেসে) না।

শ্লেগেল। হাসছ কেন ?

আর্ণষ্ট। এমনি।

শ্লেগেল। (আর্ণষ্টের কোট চেপে ধরে) হাসি থাম! শয়তান! (কোট ছেড়ে দিয়ে হাত ঝেড়ে ফেললেন।) কোন ইউনিটে কাজ করতে ?

আর্ণষ্ট। বিশ-পনেরো নং ইউনিট।

শ্লেগেল। দলের পাণ্ডা কে ?

আর্ণষ্ট। হেস।

শ্লেগেল। সে এখন কোথায় ?

আর্ণষ্ট। গত বছর একবারমাত্র দেখা হয়েছিল, আর তাকে দেখিনি।

পপার। এখন সে কোথায় আছে ? (ক্যাপটেন তাকাতেই সে চুপ করে গেল)

শ্লেগেল। হার্টসেইম স্ট্রীটের একটা গুপ্ত ছাপাখানার ভার তোমার উপর ছিল ?

আর্ণষ্ট। না।

শ্লেগেল। এখনো তুমি অস্বীকার করছ, গোপন আন্দোলনকারীদের তুমি কেউ নও ?

আর্ণষ্ট। গোপন আন্দোলনের কোন খবরই আমি রাখি না।

শ্লেগেল। একখানা গোপন ইস্তাহারও তুমি দেখনি ?

আর্ণষ্ট। না।

শ্লেগেল। (আর্দালীর কাছ থেকে রাইফেলের কুঁদোটা টেবিলের উপর ঠুকলো তারপর আবার ফিরিয়ে দিল। এবার ডেস্কের কাছে এসে) তুমি বলতে চাও তোমার সম্বন্ধে এই রিপোর্ট মিথ্যে ?

আর্ণষ্ট। রিপোর্টে কি আছে, আমি জানি না। (একজন লোক ঘরে ঢুকলো—মুখ তার মুখোসে ঢাকা)

শ্লেগেল। (তার দিকে ফিরে) একে চেন ?

লোক। হাঁ, এই আর্ণষ্ট টাউসিগ।

শ্লেগেল। পেশা ?

লোক। গুপ্ত ছাপাখানা চালায়।

শ্লেগেল। আচ্ছা, তুমি যেতে পার। (লোকটি চলে গেল)

আর্ণষ্ট। চিনতে পেরেছি, ওকে চিনতে পেরেছি। বিশ্বাসঘাতক জেলৎনার!

(ক্যাপটেন আর্ণষ্টের গালে থাপ্পড় মারলো)

শ্লেগেল। এই চুপ! তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি। তুমি কি কর ?

আর্ণষ্ট। বাজিয়ে।

শ্লেগেল। কোন বাজনা বাজাও ?

আর্ণষ্ট। আগে বেহালা বাজাতাম।

শ্লেগেন। দেখি, হাত দেখি। (আর্ণষ্ট হাত টেবিলের উপর রাখলো) এমন নোংরা হাত—এ হাত শিল্পীর বলে বিশ্বাস হয় না। শোনো, (তার চোয়াল ধরে) কমিউনিস্টদের এই শুকনো চোয়ালের জন্যেই তাদের দেখতে পারিনা। একেবারে শুকনো, নাকের ফুটো দুটো উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিচ্ছে, কথা বলবার ধরন ধারণও আলাদা। না, আর্য্য রক্ত তোমাদের শরীরে এক ফোঁটাও নেই ! (আর্ণষ্টকে ছেড়ে দিয়ে রুমালে হাত মুছে ফেললো) কি বাজাও তুমি ? বেহালা ? বেটোফেনের সেই সুরটা জানো ? একষট্টি ওপাস ?

আর্ণষ্ট। জানি।

শ্লেগেল। ডির পর্দায় না বাজাতে হয় ? (আর্দালির কাছ থেকে রাইফেল নিয়ে আর্ণষ্টের হাতের আঙুলগুলোর উপর আঘাত করলো, আর্ণষ্ট যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো ; প্রায় মূর্চ্ছা যাবার যোগাড় হোলো।) সেকি বন্ধু, এরই মধ্যে কাতর হয়ে পড়লে চলবে কেন ? কাল হয়তো মাথাই উড়ে যাবে। দাঁড়াও, সোজা হয়ে দাঁড়াও। শুনছ ? (আর্ণষ্ট সোজা হয়ে দাঁড়ালো।) হাত টেবিলের উপর রাখ। (আর্ণষ্ট হুকুম তামিল করলে) মেরে হাত গুঁড়ো করে দেব। তোমার মাও তোমাকে চিনতে পারবে না। (হঠাৎ মৃদুস্বরে বলে) ঠিক ঠিক জবাব দেবে ?

আর্ণষ্ট। (ঠোঁট কামড়ে) আমার আর কিছু বলবার নেই।

শ্লেগেল। যাও, একে ব্যারাকে নিয়ে যাও, আমার চোখের সুমুখ থেকে একে নিয়ে যাও।

আর্দালি। যো হুকুম (আর্ণষ্টকে নিয়ে চলে গেল।)

পপার। ক্যাপটেন, মেজর ডুরিঙ্-এর হুকুম, বন্দীর প্রতি ভালো ব্যবহার করতে হবে। তিনি আসছে সপ্তাহে, নিজে তার জবানবন্দী নেবেন।

শ্লেগেল। কে, ডুরিঙ্ ?

পপার। হাঁ তিনি সেই হুকুমই দিয়েছেন।

শ্লেগেল। ডুরিঙই বন্দীর মুখ খুলতে পারেন, আমি পারি না ?

পপার। তাঁর হুকুম—

শ্লেগেন। যাও, দূর হয়ে যাও ! (পপার সামরিক কেতায় অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। শ্লেগেল টেবিল থেকে কাগজপত্র নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললো) ডুরিঙ্—ডুরিঙ্ !

(মঞ্চ আঁধার হয়ে এলো। অন্ধকারে হুইশলের তীব্র শব্দ)

৩য় দৃশ্য

ঝঞ্ঝাবাহিনীর ব্যারাক। নাৎসি স্বস্তিকা পতাকা দেখা যাচ্ছে। দুজন আর্দালী এডসেল আর মার্টিন কথা বলছে।

এডসেল। কি দিনকালই পড়েছে ভাই : আমার খুড়ো তো তিন বছর ধরে একটা চাকরী যোগাড় করতে পারলো না।

মার্টিন। আমাদের নেতা বলেছেন, যে দেশে আর বেকার থাকবে না। সবাই কাজ পাবে।

এডসেল। আমিও তো ভাই, সে কথা তাকে বলেছিলাম। তা হেসেই উড়িয়ে দিলে! বললে, মিউনিকে গিয়ে শুনি, বার্লিনে মেলা কাজ, আবার বার্লিনে গিয়ে শুনি মিউনিকে। কাজতো খুঁজেই পাই না।

মার্টিন। আরে একেবারে লাল গন্ধ ভুর ভুর করছে যে! তুমি তাকে গ্রেফ্তার করলে না কেন?

এডসেল। কি যে বল! সে আমার নিজের খুড়ো!

মার্টিন। কিন্তু মিথ্যেবাদী।

এডসেল। তা ভাই মিথ্যে কি সত্যি বলেছে, আমি কি করে জানবো?

মার্টিন। বাঃ রে! আমাদের নেতা বলেন নি, কেউ আর বেকার থাকবেনা?

এডসেল তা জানি।

মার্টিন। সরকারী কতো কাজ রয়েছে।

এডসেল। ভারী তো কাজ! সারাদিন খেটে মাত্র আড়াই মার্ক রোজগার, একটা ইঁদুরেরও পেট ভরে না।

মার্টিন। কি মাথামুণ্ড বকছ?

এডসেল। আচ্ছা, তুমিই বলোনা, ওতে পেট ভরে?

মার্টিন। জানিনা! ডাঃ গোয়েবলস্ কাল বেতারে বলেছেন, ইহুদীদের তাড়াতে হবে।

এডসেল। মা বলে, ইহুদীদের ভিতরেও ভালো লোক আছে।

মার্টিন। (লাফিয়ে উঠে পড়ে) খুব সাবধান! কি যা-তা বকছ!

এডসেল। মা বলে বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

মার্টিন। সাবধান। চাকভাঙা বোলতার মত আজ সবাই রেগে আছে। আজ ভোরে চিড়িয়াখানার দেয়ালে লাল ইস্তাহারে পাওয়া গেছে। এখনো কেউ ধরা পড়েনি।

এডসেল। কমিউনিস্টদের তাহলে মাথা কাটা গেল বলে?

মার্টিন। নিশ্চয়ই!

এডসেল। ধরতে পারলে তবে তো?

মার্টিন। মেজর কয়েকখানা ইস্তাহার নিয়ে এসেছেন, ঐ তো টেবিলের উপর রয়েছে।

এডসেল। কোথায়?

মার্টিন। ঐ যে পাতলা ফুরফুরে কাগজগুলো। ওরা ঐ কাগজেই ছাপে—হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে সুবিধে হয় কিনা। ফ্রেডারিশস্ট্রাসেতে সেদিন একজন মহিলার মুখের উপর ইস্তাহার উড়ে পড়েছিল, সে তো মূর্চ্ছা গেল।

এডসেল। (গলা বাড়িয়ে) কি লেখা আছে, পড়তে পার?

মার্টিন। তুমিই পড়না

এডসেল। তুমি তো ভাই ডেস্কের কাছে আছে।

মার্টিন। (চারদিকে তাকিয়ে ডেস্কের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে) জার্মানীর মজদুর ভাইরা! (হঠাৎ লাফিয়ে সরে গেল)

এডসেল। (ফিসফিস করে) কি হোলো?

মার্টিন। না ভাই আমি পড়তে পারবোনা

এডসেল। তুমি পড়না ভাই। আমি পাহারা দিচ্ছি।

(মার্টিন ডেস্কের কাছে আবার এগিয়ে গিয়ে একখানা ইস্তাহার তুলে নিল। তার হাত কাঁপছে)— ক্রুপের তোষখানা হিটলার ক্ষমতা পাওয়ার আগে লোকসান দিচ্ছিল, এখন সেই কারখানাই শেয়ারহোল্ডারদের শতকরা ছ'টাকা হারে ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করেছে—এডসেল, নজর রেখো ভাই।

এডসেল। তুমি পড়ে যাও।

মার্টিন। (একবার চারদিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে) সাড়ে পাঁচ লাখ মজুর আজ বেকার—তাদের পরিবার মিলিয়ে জার্মাণীর মজুরশ্রেণীর এক তৃতীয়াংশের পেটে আজ অন্ন নেই—এই তো গেল হিটলারের অর্থনীতি......(ইস্তাহার হাত থেকে পড়ে গেল)

এডসেল। তুলে নাও।

মার্টিন। পারব না।

এডসেল। (কাছে এসে) এতো ঘাবড়ে গেলে কেন ?

মার্টিন। কে বললে, ঘাবড়ে গেছি ?

এডসেল। ঘাম ছুটচে।

মার্টিন। গা গরম।

এডসেল। আচ্ছা. এবার তুমি দরজায় পাহারা দাও।

(এডসেল চারদিকে তাকিয়ে ইস্তাহারখানা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলো)—দেশে রুটির অভাব, দুধের অভাব, অথচ হিটলারী সংবাদপত্রগুলো মিথ্যে কথার জালবুনে চলেছে—

মার্টিন। (ভয়ার্তস্বরে) মেজর আসছেন ! (এডসেল ইস্তাহারখানা কোথায় রাখবে ভেবে পেল না। সে মুখে পুরে চিবুতে শুরু করলো। মেজর ঘরে ঢুকতেই চিবোনো বন্ধ করে দুজনেই অভিবাদন জানালো।)

মেজর। (এডসেলের দিকে তাকিয়ে) কিহে ব্যাপার কি ?

মার্টিন। আজ্ঞে ?

মেজর। (এডসেলের দিকে তাকিয়ে) তুমি ! বোবা হয়ে গেছ নাকি ? (এডসেল অতিকষ্টে কাগজের তালটা গিলে ফেললো)

এডসেল। আজ্ঞে ?

মেজর। এখানে কি করছিলে ?

মার্টিন। পাহারা দিচ্ছিলাম। নিচে খবর দাও।

মেজর। যাও দূর হয়ে যাও। কমিউনিস্ট আর্ণষ্ট টাউসিগকে যেন এখনি পাঠিয়ে দেয়।

দুজনে। যে আজ্ঞে ! (ছুটে বেরিয়ে যেতে গিয়ে দুজনে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো। মেজর তাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, তারপর লাল ইস্তাহারখানা তুলে নিলেন ! ইস্তাহার রেখে জার্মাণ পতাকার স্বস্তিকার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর্ণষ্টকে নিয়ে সান্ত্রী ঘরে

ঢুকলো। মেজর পেছন ফিরে আছেন) ওকে রেখে চলে যাও। (সান্ত্রী অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। মেজর মুখ ফেরালেন) টাউসিগ, বোসো। (আর্ণষ্ট ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো, মেজর মুখে রুমাল চেপে ধরে বসলেন।)

মেজর। কি ব্যাপার? একেবারে ভয়ে কুঁকড়ে গেছ দেখছি। বোসো... (আর্ণষ্ট কি ভেবে চুপ করে বসে পড়লো) সিগারেট? (আর্ণষ্ট একটা নিল, মেজর সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। মেজরের কি অভিসন্ধি কে জানে!) টউসিগ, একেবারে বদলে গেছ দেখছি। আমি তোমাকে শার্লটেনবুর্গের সেই মিটিং-এ দেখেছিলাম।

আর্ণষ্ট। মনে আছে ডুরিঙ, মনে আছে।

মেজর। হাতে কি হোলো?

আর্ণষ্ট। কি হোলো তোমার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ?

মেজর। সে কথা আজ থাক। প্রয়োজনই আমাকে বদলে দিয়েছে। বিশুদ্ধ আর্য বংশে বিয়ে করেছি, বদলাবোনা? কিন্তু তাই বলে নাৎসিবাদের শত্রুদের আমি অনিষ্ট করিনি। আমার তো মনে হয়,নাৎসি উর্দি পরে আমি নাৎসিবাদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছি। (হাসলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে) না, না, কথাগুলো বাইরে ছড়িয়ে দিও না। আর দিলেই বা কি হবে, আমি কেয়ার করি না।...তোমার চোখের কোণে ঘৃণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখছি। কিন্তু বন্ধু, ওরা তোমাকে সহজে ছেড়ে দেবে না। তোমার কাছ থেকে যে করে হোক কাজ আদায় করে নেবে। আমাকে বিশ্বাস কর বন্ধু!

আর্ণষ্ট। (তিক্তস্বরে) বিশ্বাস করবো বইকি! বিবেকের দংশন শুরু হয়েছে, বিশ্বাস করবো না!

মেজর। বেশ! তাই কোরো। এখন শোনো—(বাইরে স্বর শোনা গেল। মেজর আর্ণষ্টের মুখ থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে রুক্ষস্বরে বললেন) উঠে দাঁড়াও, তিনটে প্রশ্নের আমি জবাব চাই— (শ্লেগেলের সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন একটি ভদ্রমহিলা) সুপ্রভাত!

হেডভিগ। (মেজরের স্ত্রী) রুপার্ট, তোমার কাছে একটা জরুরী দরকারে এসেছি। (আর্ণষ্টের দিকে তাকিয়ে) এ কে?

মেজর। একজন কমিউনিস্ট।

(হেডভিগ কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে শ্লেগেলের কাছে দাঁড়ালো।)

মেজর। (হেসে) ভয় নেই, ওরা কামড়ায় না।

শ্লেগেল। আঁধারে বাগে পেলে কামড়াতেও ছাড়ে না।

হেডভিগ। ইস্ কি নোংরা! ওরা কি স্নান করে না?

মেজর। সুযোগ সুবিধে পেলে করে বইকি!

হেডভিগ। এরাই আগামী পৃথিবীর প্রভু! (দস্তানা-মোড়া হাত দিয়ে আর্ণষ্টের গালে থাপ্পর মারলো! আর্ণষ্ট চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। হেডভিগের দস্তানা পড়ে গেল, শ্লেগেল কুড়িয়ে তার হাতে দিতে গেল) না, না, ও দস্তানা আমি আর ছোঁব না। (শ্লেগেল দস্তানা টেবিলের উপর রাখতেই মেজর তুলে নিলেন)

মেজর। (বিদ্রূপ ভরে) দামী দস্তানা দেখছি! তারপর হেডভিগ, কি মনে করে ?

হেডভিগ। বেতারে বক্তৃতা দেব, তোমাকে শোনাতে এলাম। (ব্যাগ থেকে একতাড়া কাগজ বার করলো)

মেজর। নিজে লিখলে নাকি ?

হেডভিগ। না, বাবার সেক্রেটারী লিখে দিয়েছে! কিন্তু প্রতি কথাটাই আমার—শুধু কলম ধরে লিখিনি এই যা!

মেজর। ঠিক, ঠিক!

হেডভিগ। তুমি বোধহয় জানো, পঞ্চাশ হাজার জার্মাণ গৃহিণী—

মেজর। গৃহস্থালির কাজ ফেলে হেডভিগ ফন বারবোসার বক্তৃতা শুনবে—তা আমি জানি।

হেডভিগ। আচ্ছা রুপার্ট, কি করে তুমি জানলে আমি ঐ কথাই বলব ?

মেজর। আদর্শ স্বামী কিনা—তুমি কি বলবে ঠোঁট নড়লে বুঝতে পারি। কি বল শ্লেগেল ?

শ্লেগেল। (বিদ্রূপ ভরে) নিশ্চয়ই।

মেজর। হেডভিগ, হাতে বিস্তর কাজ। তোমার বক্তৃতার সারমর্ম্মটুকু শুধু শুনিয়ে যাও।

হেডভিগ। সবটা শুনবে না ?

শ্লেগেল। কি করে শুনচেন ? আপনার স্বামীর হাতে যে বিস্তর কাজ!

মেজর। শুনলে তো ? এইবার চুম্বকটুকু শুনিয়ে দাও।

হেডভিগ। বেশ শেষটা শোনাচ্ছি (পড়লো) জার্মাণীর এই যে নৈতিক নবযুগ নেমে এসেছে, মেয়েদের সেখানে বহু কাজ করবার আছে। আমাদের অধিনায়ক বলেছেন, অবিরত সংগ্রামই মানুষকে মহৎ করে, চিরশান্তি আনে তার ধ্বংস। সেই সংগ্রামের শক্তি যোগাব আমরা—জার্মাণীর নারী জাতি। আমরা বীরের জননী হব, মিথ্যে শিক্ষার মোহে আমরা ভুলবো না। জার্মাণীর সীমা বিস্তৃত হবে, আর সেই বিস্তৃতিতে সাহায্য করব আমরা। রুপার্ট কেমন হয়েছে ?

মেজর। চমৎকার। ফ্যাসিবাদের এমন চমৎকার টীকা আর কেউ করতে পারে নি। তুমি দেখছি, পণ্ডিতদেরও হার মানিয়ে দেবে।

হেডভিগ। এ কিন্তু সব আমার নিজের কথা রুপার্ট।

মেজর। আচ্ছা, এখন এসো। ক্যাপটেন আমার স্ত্রীকে পৌছে দিয়ে এস।

(শ্লেগেলের সঙ্গে হেডভিগ চলে গেল)

দেখছ তো, কেমন চমৎকার দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছি।

আর্ণষ্ট। ক্যাপটেন তোমার কেউ নয় মেজর।

মেজর। তোমারও নয়। সে আমার বংশে সন্দেহ করে। (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে) আধুনিক জগতের কোন লোক পারে এই বর্ব্বরতা সহ্য করতে, বলো বলো টাউসিগ ? এক বিরাট উপদেশ, নব-ন্যায়ের এক প্রকাণ্ড ফিরিস্তি অবিরত কানের কাছে চীৎকার করে চলেছে, তাকে মানতে হবে তার কাছে মাথা নোয়াতে হবে। না, না, এই দুঃস্বপ্ন। (সংযত হয়ে) ক্যাপটেন আমার বংশের ইহুদিরক্তের কথা জানে, আর সেই অস্ত্রে সে শান দিচ্ছে, আমি ক্যাপটেনের গুপ্ত খবর জানি আজ

তাকে তারই বলে আমি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি। এক দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছে—কে হারে কে জেতে! তোমার খুব মজা লাগছে তো?

আর্ণষ্ট। হাঁ।

মেজর। সবই বুঝি টাউসিগ। হাঁ কাজের কথা হোক। তোমার পার্টির সভ্যদের নামের তালিকা তোমার কাছে আছে, আমরা জানতে পেয়েছি!

আর্ণষ্ট। না, নেই।

মেজর। আমি জানতে চাই না। কিন্তু এরা সহজে ছাড়বে না তোমাকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলবে, আবার সুস্থ করে তুলবে—এমনি করে চলবে নির্য্যাতন। কতদিন সহ্য করবে?

আর্ণষ্ট। আমি আমার কর্ত্তব্য ভুলবো না।

মেজর। তুমি জান না, তাই হাসছ। মানুষের রক্তমাংসের শরীর তো? তারা তোমার কমরেডদের কাছে খবর পাঠাবে, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়বে খবর; বন্ধুরা হবে শত্রু। তোমাকে তারা ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে নিয়ে যাবে গুপ্ত আস্তানা হানা দিতে, আদালতে তোমার সঙ্গীদের বিচারের সময়ে তোমাকে রাখবে ফটকে দাঁড় করিয়ে—কি করবে তুমি তখন? ওকি মুখ অমন করছ কেন?

আর্ণষ্ট। হাত টনটন করছে।

মেজর। বেরিয়ে ডাক্তারখানায় হাত দেখিও। আমি লিখে দিচ্ছি।

আর্ণষ্ট। কি বলছ তুমি!

মেজর। ঠিকই বলছি। তোমাকে আমরা মুক্তি দিচ্ছি। উদ্দেশ্য কি জানতে চাও? তোমার দল-বলের সন্ধান। যেখানেই যাবে, তোমার পিছনে পিছনে যাবে গুপ্তচর, যদি কাজ না হয়, আবার ফিরে আসবে, চলবে নির্য্যাতন। শোনো, এক পথ আছে...

আর্ণষ্ট। কি?

মেজর। আত্মহত্যা কর। একটা গুলির তো ব্যাপার। কবরে গিয়ে শান্তি পাবে, পাবে মুক্তি। (উদাত্তস্বরে) তাই ফিরে এলাম...পৃথিবীর নির্য্যাতন-নিপীড়ন আমাকে ফিরিয়ে আনলো... মৃতরা তো অভিশপ্ত নয়—পৃথিবীর নিগ্রহ থেকে তারা যে শান্তি পেয়েছে। তাদের উপর বর্ষিত হোক তোমার অভয় মন্ত্র। শান্তি, শান্তি

(শ্লেগেল ঢুকলো)

ওকে পৌঁছে দিয়ে এলে?

শ্লেগেল। হাঁ। (আর্ণষ্টের দিকে তাকিয়ে) বাঃ বন্দী যে চেয়ারে তোফা বসে আছে! যেন মিতার সঙ্গে কথা বলছে!

মেজর। বন্দীর কাছ থেকে গোপন কথা বার করতে হলে তার সঙ্গে মিতালি পাতাতে হয়—একথা বোধহয় তুমি জাননা শ্লেগেল।

শ্লেগেল।	বন্দীর সুমুখে একথা শুনতে আমি রাজি নই মেজর। উঠে দাঁড়াও! (আর্ণষ্ট উঠে দাঁড়ালো।)

মেজর।	এঘরে হুকুম দেব আমি। তুমি বোসো টাউসিগ, (আর্ণষ্ট বসলো)

শ্লেগেল।	ক্যাপটেন হিসেবে আমি বলবো—

মেজর।	চুপ!

শ্লেগেল।	দেখি কাঁধের উপরের তকমার জোর কদিন থাকে—

মেজর।	চুপ। চুপ ক্যাপটেন!

শ্লেগেল।	(দরজার কাছে গিয়ে থেমে) ইহুদী! অভিশপ্ত ইহুদী!

মেজর।	কি?

শ্লেগেল।	আমি জানি।

মেজর।	কাছে এস! (শ্লেগেল কাছে এলো)

শ্লেগেল।	তুমিই বল, কি বলবে মেজর?

মেজর।	তুমিই বল, কি বলতে চাও?

শ্লেগেল।	তোমার স্ত্রী একথা জানে?

মেজর।	কি কথা?

শ্লেগেল।	কি কথা! ডুরিঙ্ দের বংশাবলী বোধহয় উপরওয়ালারা কেউ ভালো করে দেখেনি

মেজর।	(জামা চেপে ধরে) আর একটা কথা উচ্চারণ করলে—

শ্লেগেল।	কি করবে?

মেজর।	নিজের হাতে?

শ্লেগেল।	(বিদ্রূপভরে হেসে উঠলো) কি দেব মেজর, তলোয়ার না পিস্তল? এই যে পিস্তলটাই হাতে উঠে এলো। (কোমরবন্ধ থেকে পিস্তল বার করলো।) কিন্তু ইহুদীর কি অতো সাহস হবে? ভয়েই হয়তো পালিয়ে যাবে—আর তাইতো তার স্বভাব। (মেজর পিস্তল কেড়ে নিয়ে ঘোড়া টিপলেন, গুলি পেটে বিঁধেছে, শ্লেগেল লুটিয়ে পড়লো।)

মেজর।	(মৃদুস্বরে বললেন) আমি চাইনি—চাইনি। (একজন আর্দালী ছুটে এলো) বাইরে অপেক্ষা কর। বন্দীকে নিয়ে যাবে।

আর্দালী।	(আর্দালী মৃতদেহের দিকে তাকালো।) যো হুকুম। (প্রস্থান)

আর্ণষ্ট।	বিপদে পড়লে তো মেজর।

মেজর।	হাঁ, কিন্তু এ বিপদ একদিন আসবেই—তা আমি জানতাম। পাঁকে একেবারে তলিয়ে গেছি আর্ণষ্ট, সারা দেহ গ্লানিতে ভরে গেছে। মুক্তি চাইছিলাম, আজ সেই মুক্তি পেয়েছি। আর্ণষ্ট, ঐক্যবদ্ধ হোক সম্মেলিত শক্তি—এই আমার কামনা। এই দুঃস্বপ্ন তারা উড়িয়ে দিক, এই রক্তের নেশা তারা ছুটিয়ে দিক, যাও চলে যাও বন্ধু। আমার কথা ওদের কাছে বোলো। এক সেকেণ্ড

দাঁড়াও—সিগারেট নাও (সিগারেট দিলেন) বলো, বলো টাউসিগ, আমি ঘৃণিত নই, আমিও তোমাদেরই একজন।

আর্ণষ্ট। না, তুমি ঘৃণিত নও।

মেজর। মৃত্যু পথযাত্রীর সঙ্গে তুমি কথা কইছ—একথা যেন মনে থাকে টাউসিগ।

আর্ণষ্ট। মরবে কেন বন্ধু ? এখনো যে কত কাজ বাকি।

মেজর। আমার কাজ আমি করেছি। তোমার কমরেডদের বিরুদ্ধে যত প্রমাণ সব আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। আর আমার কোনো কাজ নেই। যাও, চলে যাও বন্ধু ! আর্ণষ্ট। ধন্যবাদ।

আর্ণষ্ট ধীরে ধীরে চলে গেল ! মেজর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তারপর শিস দিতে দিতে ডেস্কের কাছে এসে টানা খুলে পিস্তল বার করলেন। পিস্তলটার উপর রুমাল চাপা দিয়ে টেবিলের উপর রেখে নাৎসি উর্দি সব খুলে ফেললেন, পতাকাটা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন...এবার পিস্তলটা তুলে মুখে পুরে দিলেন। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হয়ে এলো, একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। তীব্র হুইস্‌লের শব্দ।

৪র্থ দৃশ্য

কমরেডদের আস্তানা। প্রায় দশ বারো জন পার্টির সভ্য বসে আছে। ছোট্ট ঘর, বাইরে তালা বন্ধ দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সেক্রেটারী রিপোর্ট পড়ছেন। কার্ল দর্শকের দিকে পিছন ফিরিয়ে বসে আছে। টিল্লিকে দেখা যাচ্ছে। একজন বিখ্যাত মার্কস্‌বাদী বসে আছেন—তাঁর চুল সব প্রায় পেকে এসেছে। ইনি স্টাইকলিৎস। দরজার সুমুখে পাহারা বসেছে।

সেক্রেটারী (পড়ছেন)—গত সপ্তাহে তিনটি নতুন দল সংগঠন করা হইয়াছে। সারা শহরে তাহারা নিয়মিত কাজ করিতেছে। দশই পর্য্যন্ত তিন হাজার রেকর্ড বিলি করা হইয়াছে। এই রেকর্ড গুলিতে চটুল জ্যাজব্যাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রচার করা হইয়াছে। প্রথম থেকেই আমরা (একটি লোক যারা বসে আছে তাদের ভিতর দিয়ে আসছিল দেখে তিনি থামলেন। লোকটি বেঁটে খাটো—নাম জুলিয়াস।) রিপোর্ট শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কমরেডরা অনুগ্রহ করে বসবেন কি ?

জুলিয়াস। (এক পাটি জুতো তার পায়ে) এক পাটি জুতো ঐ কোনে ফেলে এসেছি। ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগছে।

সেক্রেটারী। (আবার শুরু করলেন) প্রথম হইতেই আমরা হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে ইস্তাহার আর প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। ইহাতে আমাদের দুই শত দশ মার্ক ব্যয় হইয়াছে।

(রিপোর্ট রেখে) কমরেডগণ, বিবরণীর যথার্থতা সম্বন্ধে আশা করি আপনারা দ্বিমত কেউ নন। তাই বিবরণী রেখে আমরা কাজের কথায় আসছি। কোনো প্রশ্ন করবার আছে ?

বিভিন্ন স্বর। হাঁ, হাঁ, প্রশ্ন করবার আছে বইকি।

সেক্রেটারী। এক একজন করে প্রশ্ন করুন।

আর্ণো। কমরেড টাউসিগের খবর কি ?

সেক্রেটারী। যাঁরা শহীদ বা বন্দী হয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা আপনাদের পড়ে শোনানো হবে। আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

একজন কমরেড উঠে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলেন—২০২৬ ইউনিটের থ্রেডরিশ মেয়ার্স আর এল্মা সকর তিন তারিখে তাঁহাদের কর্তব্যের জন্যে প্রাণ দিয়াছেন। বারো তারিখে জর্জ ফিজনার নিহত হইয়াছেন (একজন মহিলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাকে আর একজন মহিলা সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কান্না থেমেছে) এই মাসে যাঁহারা বন্দী হইয়াছেন তাঁহাদের নাম যথাক্রমে পল স্মিৎস্লার এবং আর্ণষ্ট টাউসিগ (কমরেড বসে পড়লেন)

সেক্রেটারী। ভাবপ্রবণতার আমাদের সময় নেই, কিন্তু এই বীরদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দু একটা কথা না বললে তাঁদের অপমানই করা হবে। এঁদের কেউ কেউ এখনো নাৎসী কারাগারে বন্দী, কজনকে আমরা চিরদিনের জন্য হারিয়েছি। যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের কথা আমরা ভুলবো না, ভুলতে পারি না। যাঁরা বন্দী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আর্ণষ্ট টাউসিগ সম্বন্ধে-ই আমাদের আলোচনা করা দরকার। ইউনিট সদস্যরা প্রস্তাব করেছেন, তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করা হোক। ব্যাপারটা আপনাদের কাছে পেশ করলাম, আপনারা ভেবে দেখুন। কমরেড টিল্লি ভেষ্টারমান। আর্ণষ্ট সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?

টিল্লি। (উঠে দাঁড়িয়ে) বিশ্বস্তসূত্রে আমরা আর্ণষ্ট টাউসিগ সম্বন্ধে কয়েকটা খবর জানতে পেরেছি। প্রথমে মার্চ মাসে সে বন্দী হয়। তিন সপ্তাহ পরে নাৎসীরা তাকে ছেড়ে দেয়। (কার্ল এবার দর্শকদের দিকে মুখ ফেরালো) সে জানত তার পিছনে গোয়েন্দা ঘুরছে। নাৎসীরা ভেবেছিল দলের অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে ছাড়া পেয়েই সে দেখা করবে এবং তারাও আমাদের গোপন আস্তানার সন্ধান পাবে। কিন্তু সে তা করেনি। চারদিন পরে তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হোলো। আমি তাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম, কার্ল ছিল আমার সঙ্গে (একটু থেমে) প্রথমে চিনতে পারিনি...সে আমার হাত ধরলো—(আবার থামলো) আপনারা বোধ হয় জানেন, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, ভাবতেও পারবেন হয়তো পক্ষপাতিত্বই করছি। কিন্তু তা নয়। আদালতে কমরেডদের বিচারের সময় তাকে দেখা গেছে বলেই কি সে বিশ্বাসঘাতক ? না, না, সে বিশ্বাসঘাতক নয়, বিশ্বাসঘাতক সে হতে পারে না।

বাউম। ঠিক, ঠিক বলেছ।

আর্গো। হার্টমেইম স্ট্রীটে হানার সময় তাকে পুলিশের সঙ্গে দেখা গেছে। ড্রাইভারের পাশে ভ্যানে বসে সে হয়তো তখন মাফ্লার বুনছিল—তাই না কমরেড ভেষ্টারমান ?

সেক্রেটারী। কমরেড আর্গো, আপনার যা বলবার উঠে দাঁড়িয়ে বলুন।

আর্গো। (উঠে দাঁড়িয়ে) টাউসিগের জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে, তাতে খুবই সাবধান হওয়া দরকার। টাউসিগ নির্দোষ হতে পারে, কিন্তু তার পিছনে গোয়েন্দা ঘুরছে।

সেক্রেটারী। স্পষ্ট করে বলুন কমরেড

আর্ণো। ইউনিটের কাগজে কাগজে তার নাম, চেহারার বিবরণ তুলে দেওয়া হোক। পার্টির সে পক্ষে সে বিপদজনক। তাকে আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে।

সেক্রেটারী। কমরেড ভেস্টারমান আপনার কি মত ?

টিল্লি। হাঁ, তাকে আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে, কিন্তু—

সেক্রেটারী। বলুন, কি আপনি বলতে চান ?

টিল্লি। সভাপতির সম্মতি পেলে আমি একখানা ছোট্ট চিঠি পড়ব। এই চিঠি গত সপ্তাহে আর্ণষ্টের কাছ থেকে পেয়েছি। (পড়লে) ওরা তিলে তিলে আমার জীবনীশক্তি শুষে নিচ্ছে। রাতদিন শুধু কানের কাছে বলছে, বন্দীদের সনাক্ত কর, নয়তো তোমায় খুন করে ফেলব, আর বেশি দিন বাঁচব না টিল্লি। কিন্তু কই ওরা আমাকে শেষ করে ফেলছে না কেন ? কালকের হানার সময় ওরা আমাকে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে নিয়ে গিছলো। তুমি বিশ্বাস কর টিল্লি, বিশ্বাস কর, শত নির্য্যাতনেও ওরা আমাকে নুইয়ে দিতে পারেনি। বিশ্বাসহন্তা আমি হইনি। তুমি আর কার্ল আমার ভালোবাসা জেনো। (একপাটি জুতোওলা লোকটা কাছে এসে উঁকি মেরে চিঠিখানা দেখলো)

সেক্রেটারী। আর কারো কিছু বলবার আছে ?

একটি মেয়ে। কমরেড স্টাইকলিৎস কিছু যদি বলেন।

সেক্রেটারী (স্টাইকলিৎসের দিকে তাকিয়ে) আমার মনে হয় না...

জেলদা। হাঁ, হাঁ, উনি বলতে চান।

সেক্রেটারী। কমরেড স্টাইকলিৎস সোনেনবের্গের বন্দীশালায় ছিলেন তিনমাস, সবে ফিরেছেন, আপনারা মন দিয়ে শুনুন, আমাদের বিখ্যাত মার্কসবাদী এসম্বন্ধে কি বলেন !

(স্টাইকলিৎস উঠে সেক্রেটারীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে হাসি)

স্টাইকলিৎস। এমন জটিল ব্যাপারে যখন অভিযোক্তা দোষী কি নির্দোষ জানা যায় নি—তখন সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে সাবধান হতে হবে বই কি ! কিন্তু সংগ্রামের সময় (থেমে কি ভাবলেন, আবার বলতে শুরু করলেন) শ্রেণী সংগ্রামের সময়...আমার মনে হয়...(গায়ের শালখানার পাড়ের উপর বার বার হাত বুলোলেন) কি বলছিলাম—যেনো...(হতাশ হয়ে চারদিকে তাকালেন) জেলদা, জেলদা এ কোথায় এলাম ?

জেলদা। বেন্নো, এরা বন্ধু।

স্টাইকলিৎস। কি বলছিলাম জেলদা ?

জেলদা। তুমি বোসো।

স্টাইকলিৎস। না, না, তুমি আমায় বাড়ী নিয়ে চলো জেলদা !

সেক্রেটারী। হাঁ, হাঁ, ওঁকে বাড়ী নিয়ে যাও।

জেলদা। চলো, এই যে তোমার টুপি।

স্টাইকলিৎস। তোমার হাত ধরেছি, আর ভয় নেই। বিদায় বন্ধুদল, বিদায়। প্রাতরাশ খেতে আমার ওখানে

নিমন্ত্রণ রইলো।...বিদায়...! (জেলদা তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজা আবার বন্ধ হয়েছে)

বাউম। এমন লোকটাকে পাগল করে দিলো!

সেক্রেটারী। ভাবপ্রবণতার এ সময় নয় কমরেডগণ। কাজের সময়—কাজ করতে হবে—ভাবোচ্ছ্বাস চলবে না

(তাঁর চোখ জলে ভরে গেছে, তিনি মুখ ফিরিয়ে সংযত হতে চেষ্টা করলেন।)

কার্ল। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমার ভায়ের সম্বন্ধে আমি দুচারটে কথা বলতে চাই।

সেক্রেটারী। এইখানে এসে দাঁড়ান কমরেড!

(নিচের তলায় পিয়ানো আর বেহালা বাজছে)

কার্ল। কমরেডগণ, আপনারা বাজনা শুনে বোধ হয় অবাক হয়ে যাচ্ছেন, ভাবছেন কে বাজাচ্ছে। এই বাড়ীতে—হাঁ এই বাড়ীতেই আমি আর আমার ভাই জন্মেছিলাম, আমরা এই আবহাওয়ায়ই বড় হোয়ে উঠেছিলাম। ঐ যে পিয়ানো আর বেহালার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন—কারা বাজাচ্ছেন জানেন? আমার কাকা আর তাঁর বন্ধু সেলিগমান। যুদ্ধ, বিপ্লব, ইহুদীদের উপর নির্য্যাতন—নিপীড়ন ওঁদের বুক ভেঙে দিয়েছে, ওঁরা তাই বেটোফেন আর মোৎসার্টের সুরে শান্তি খুঁজছেন। এখন মোৎসার্ট শুরু হয়েছে...সুরের বন্যা ঢেকে দিয়েছে যুদ্ধের নৃশংসতা, বিপ্লবের রক্তবন্যা, ইহুদীদের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার। ওঁরা শান্তি খুঁজছেন—হাঁ শান্তি খুঁজছেন। আমার এই প্রলাপ আপনারা ক্ষমা করবেন, ক্ষমা করবেন আমার এই উদ্বেল উচ্ছ্বাস। কিন্তু মৎসার্টের এই সুরটিই আমরা দুভাই অনেকদিন বাজিয়েছিলাম। সে আজ উনিশ বছর আগের কথা, কিন্তু আজও জীবন্ত হয়ে আছে সেই স্মৃতি। যাকগে সে কথা। (হঠাৎ দৃঢ় হয়ে কঠিন স্বরে) আজ তো সুরের বন্যায় ভেসে যাবার দিন নয়। কিসের জন্য আমরা যুদ্ধ করছি? আজ ভাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাইয়ের শত্রু। বহু কমরেডের আজ—আজ ঘর নেই, ভাই নেই—এমন কি মা বাবাও নেই! কেন—সে উত্তর আপনারা সবাই জানেন। আজ আমাদের কি করতে হবে? সেই কথাই তো আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? শুনুন, সে আমাদের কমরেড নয়, আমাদের পার্টির কলঙ্ক। সে আমার ভাই নয়। মুখোস খুলে ফেলতে হবে, চিনিয়ে দিতে হবে তাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে বিদ্রূপ করবে—জীবনের অন্ধ গলিতে হোঁচট খেতে খেতে খেতে সে চলবে। হাঁ, আমার ভাই, আমার কমরেড আজ থেকে আমার পার্টির কেউ নয় আমার কেউ নয়। আমার ভাই নেই, নেই পরিবার, শ্রমিক আমাদের সেস্থান পূর্ণ করেছে। দীর্ঘজীবী হোক বিপ্লব, দীর্ঘজীবী হোক গণতন্ত্রের সত্যস্বরূপ!

(কার্ল বসে পড়লো। বাজনা থেমে গেছে। ভোট নেওয়া হলো, টিল্লি ছাড়া সবাই হাত তুলেছে। টিল্লি চারিদিকে তাকালো, কে একজন শব্দ করে বাদাম ভেঙে খাচ্ছে। এবার ধীরে ধীরে টিল্লিও হাত তুললো)

৫ম দৃশ্য

কার্লের ঘর। মাঝখানে একটি মাত্র দরজা। অন্ধকারে টাইপরাইটারের শব্দ ভেসে আসছে। আলো জ্বলে উঠতেই কার্ল আর টিল্লিকে দেখা গেল। তারা টাইপ করছে। টিল্লি এবার থামলো।

টিল্লি। কটা ভুল হয়ে গেছে।

কার্ল। তা হোক না।

টিল্লি। শরীরটা ভাল নেই কার্ল।

কার্ল। খুব সাবধান! একটু গড়িয়ে নাওনা।

টিল্লি। কার্ল, তুমি কি কোনোদিন ভয় পেয়েছ?

কার্ল। পেয়েছি বই কি।

টিল্লি। না, না, সত্যিকথা বলো।

কার্ল। হাঁ, সত্যি কথাই বলব। যেখানে আমরা আজ চলেছি, ঝঞ্ঝা বাহিনীর গুণ্ডারা আশেপাশে ঘুরছে। হয়ত প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতেই পারব না। না, না টিল্লি, আমি এমন বীর পুরুষ নই যে ভয় পাব না।

টিল্লি। আচ্ছা, ওর কোনো খবর পেয়েছ?

কার্ল। প্রয়োজন নেই?

টিল্লি। কেন?

কার্ল। প্রমাণ আমরা পেয়ে গেছি।

টিল্লি। কার্ল, তোমার বিশ্বাস হয়?

কার্ল। প্রথমে বিশ্বাস করিনি। ভেবেছি, এ নাৎসীদের মিথ্যা গুজব। কিন্তু—

টিল্লি। এখন বিশ্বাস কর।

কার্ল। হাঁ। আমাদের বিশ্বস্ত কমরেডরা খবর এনেছে, তাকে চোখে চোখে রেখেছে তারা।

টিল্লি। কিন্তু ভুলও তো হতে পারে। হয়তো তারা তাকে ওষুধ খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে। না, না কার্ল, গুপ্তচর সে হবে না। তার আগে সে আত্মহত্যা করত (জামা চেপে ধরলো।)

কার্ল। দেখো, ছিঁড়ে ফেলোনা যেন। (ঠাট্টার সুরে)

টিল্লি। (উত্তেজিত হয়ে) উত্তর দাও, উত্তর দাও কার্ল?

কার্ল। সে দোষী। আমি জানি সে দোষী।

টিল্লি। সে যদি আজ জীর্ণ দেহ আর মন নিয়ে ফিরে আসে, তুমি তার সঙ্গে দেখা করবে না কার্ল? সে কি বলতে চায় তুমি শুনবে না? বলো, বলো কার্ল?

কার্ল। তার কাছ থেকে কিছু আমি শুনতে চাই না।

টিল্লি। সে না তোমার ভাই!

কার্ল। ভাই—কিন্তু ভ্রাতৃত্বের এক কানা কড়িও আর দাম নেই

টিল্লি। এখনই যদি সে এসে জোরে ধাক্কা দেয়!

কার্ল। তুমি তাকে ভালোবাস টিল্লি।

টিল্লি। আমার কথার উত্তর দাও কার্ল।

কার্ল। তুমি একাই কি তাকে ভালোবাস টিল্লি? আমি কাঁদিনি? কাঁদতে কাঁদতে কতো রাতে আমার ঘুম হয়নি। জ্বরের ঘোরে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছি।

টিল্লি। আস্তে বল, কেউ শুনতে পাবে।

কার্ল। (ফিস ফিস করে, কিন্তু উত্তেজনা কমেনি) যেদিন হাসপাতালে দেখা করতে গেলাম—তার সেই শীর্ণ মুখ তো আমি ভুলতে পারিনি। ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো আমাকে সকলে তাড়া করেছে। (বসে পড়ে) টিল্লি, তুমি আর আমার কাছে এসো না। তোমাকে দেখলেই তার কথা আমার মনে পড়ে।

(দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শোনা গেল)

টিল্লি। কার্ল, কার্ল, দরজা খুলে দাও! সে এসেছে! হাঁ, আমি জানি, সে এসেছে।

কার্ল। (টিল্লির মুখের দিকে তাকালো। টিল্লি দরজা খুলে দিতে যাচ্ছে, কার্ল তাকে বাধা দিল। ফিস ফিস করে) তুমি কি পাগল হয়েছ টিল্লি?

টিল্লি। আমি জানি, সে এসেছে।

স্বর। (বাইরে) কার্ল···

কার্ল। (দরজার সুমুখে গিয়ে) না, আমি তাকে ভিতরে আসতে দেব না।

টিল্লি। আমি তাকে ভিতরে নিয়ে আসবো। সে অপেক্ষা করছে···

কার্ল। অপেক্ষা করে করে সে চলে যাবে।

টিল্লি। কার্ল, কার্ল! কি যা তা বকছ? সে হয়তো অসুস্থ···

কার্ল। হোক অসুস্থ, বন্দীশিবিরে অমন কতো অসুস্থ কমরেড মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।

টিল্লি। ভুল, এ তোমার ভুল।

কার্ল। বেশ, ভুলই যদি হয়, একটা ভুলে হাজার হাজার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ থেকে অব্যাহতি পাব।

স্বর। (দরজায় ঘা দিয়ে) কার্ল, কার্ল...

টিল্লি। চাবি দাও, আমি খুলে দেব।

কার্ল। (তার দিকে তাকিয়ে কার্ল টেবিলের উপর চাবি রেখে দূরে সরে দাঁড়ালো। টিল্লি দরজা খুলে দিল। আর্ণষ্ট দাঁড়িয়ে আছে, প্রকাণ্ড একটা কালো টুপি তার মাথায়, টুপির আড়ালে শীর্ণ মুখখানা ঢাকা পড়ে গেছে, হাতে একমুঠো টাকা নিয়ে সে খেলা করছে। পরণের পোষাকটা ঢিলে। এযেন আর্ণষ্ট নয়, আর্ণষ্টের প্রেতাত্মা)

আর্ণষ্ট। টিল্লি...

টিল্লি। ভিতরে এস আর্ণষ্ট

আর্ণষ্ট। আসবো...?

টিল্লি। এসো এসো...(আর্ণষ্ট ভিতরে এলো, কার্ল মুখ ফিরিয়ে নিল। টিল্লি দরজায় চাবি দিয়ে তার কাছে

কাছে ফিরে এসে টিলে ওভারকোট আর টুপিটা খুলে নিল। আর্ণষ্টের খেয়াল নেই। সে টাকাগুলো নিয়ে খেলছে, টুং টাং শব্দ হচ্ছে। মাথার চুলে তার পাক ধরেছে। হঠাৎ ঝপ ঝপ করে টাকাগুলো মেঝেয় পড়ে যেতে তার খেয়াল হোলো, সে কোথায় এসেছে)

আর্ণষ্ট। টিল্লি...

কার্ল। এখানে তুমি কেন এসেছ ?

আর্ণষ্ট। এসেছি—

কার্ল। মিথ্যে কথায় আমাদের ভোলাতে এসেছ ?

টিল্লি। কার্ল, কার্ল, ওকে বলতে দাও।

কার্ল। আমার ঘরে শত্রুর স্থান হবে না—স্থান হবে না বিশ্বাসঘাতকের—

আর্ণষ্ট। চুপ! চুপ!

কার্ল। কেন চুপ করব? মিকল তোমাকে পুলিসের সঙ্গে দেখেছে, আগো দেখেছে আদালতে। তুমি গোয়েন্দা, পুলিশের গোয়েন্দা!

টিল্লি। কার্ল চেঁচিয়োনা, ওরা শুনতে পাবে।

আর্ণষ্ট। কার্ল, আমি...(কার্ল দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, আর্ণষ্ট সুমুখে এসে দাড়ালো) আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে কার্ল।

কার্ল। পথ ছাড়ো!

আর্ণষ্ট। না, ছাড়বো না, না শুনে তুমি যেতে পাবেনা। (কার্ল তাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেয় ফেলে দিল, দরজা চাবি বন্ধ। টিল্লির দিকে তাকিয়ে বললো)

কার্ল। চাবি দাও?

টিল্লি। না।

(কার্ল আর্ণষ্টকে মেঝে থেকে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিল)

আর্ণষ্ট। কেউ আমার কথা শুনতে চায় না! বেশ তো, কাউকে আমি বলতে চাই না, নিজের কাছে বিড়বিড় করে বলে যাব। পথে কতদিন তো এমনি নিজের কাছে নিজে বলেছি, ছেলে মেয়েরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে—নিজে ভয় পেয়েছি। না, না, তোমাদের আমি বলব না, বলতে চাই না। আমি চেয়ারকে বলছি। চেয়ার, চেয়ার শোনো। (চেয়ারটা টেনে নিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসে) প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে হবে, দ্বিতীয় কি কি অভিযোগ আছে জানতে হবে (টিল্লি ভয় পেয়ে চেয়ার সরিয়ে নিল। আর্ণষ্ট তবু থামলো না) এখন সাথীদের জবানবন্দী, কি ঘটেছিল বল? কে তোমাকে বললে?

কার্ল। (উত্তেজিত স্বরে) তোমার ও অভিনয় আমি শুনতে চাই না।

আর্ণষ্ট। (লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) তুমি কি মনে কর, তোমার কাছে করুণা ভিক্ষা করতে এসেছি? না, না। টিল্লি আর তুমি, দুজনকেই জানিয়ে দিতে এসেছি, আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মিথ্যা। আমার এ মিথ্যা কলঙ্ক তোমাদের স্পর্শ করবে, তোমাদের মাথা নুইয়ে দেবে এ আমি চাই না।

কার্ল। ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

আর্ণষ্ট। আমি কিন্তু তাকে উড়িয়ে দিতে পারিনা। টিল্লির বুকে আছে আমার সন্তান। এই মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা সে বয়ে বেড়াবে এ আমি চাইনা কার্ল!

কার্ল। মিথ্যা কলঙ্ক! তুমি জানো প্রতি ইউনিটের সংবাদপত্রের শিরোনামা চিৎকার করে বলছে, তুমি বিশ্বাস-ঘাতক, তুমি বিশ্বাসঘাতক।

আর্ণষ্ট। তারা জানে?

কার্ল। জানে।

আর্ণষ্ট। যখন প্রথম মুক্তি পাই সে খবরও জানে?

কার্ল। সে তো চারমাস আগের কথা।

আর্ণষ্ট। তারা আমাকে মুক্তি দিয়েছিল।

কার্ল। আর তার বদলে তুমি দিয়েছিলে কমরেডদের ধরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি।

আর্ণষ্ট। কিন্তু আমি তাদের ধরিয়ে দিই নি।

কার্ল। পা জখম হয়েছিলে বলেই পারনি

আর্ণষ্ট। বেশ...বেশ। সবই জানো দেখছি।

কার্ল। হাঁ, জানি।

আর্ণষ্ট। ওরা আবার আমাকে ধরে নিয়ে গেলো। আবার নতুন করে শুরু হোল প্রশ্ন, স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করলাম। তারপর গেলাম হাসপাতালে। এখন ভাবি, মরিনি কেন? মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যেতাম, জল ঢেলে ওরা জ্ঞান ফিরিয়ে আনতো তারপর আবার চাবুক পড়তো।

কার্ল। কবে সব স্বীকার করলে?

আর্ণষ্ট। এখনো করিনি

কার্ল। করনি?

আর্ণষ্ট। (আপন মনে) হানা দিতে যেত ওরা ভ্যানে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে নিয়ে যেত, পা বাঁধা থাকত—

কার্ল। কিন্তু একটা সংবাদও তো তুমি পাঠাতে পারতে?

আর্ণষ্ট। দু ডজন পাঠিয়েছি। ওরা গায়েব করেছে। তুমি বুঝি বিশ্বাস করতে পারছনা কার্ল?

কার্ল। না।

আর্ণষ্ট। আদালতের সুমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে হোত আমাকে—

কার্ল। সে আমরা জানি।

আর্ণষ্ট। ভিতরে হাকিমরা বলতো, অস্বীকার কোরো না, তোমাদের কমরেড সব ফাঁস করে দিয়েছে। কেউ কেউ বিশ্বাসও করতো।

কার্ল। হুঁ, নতুন পোশাক, পকেট ভর্ত্তি টাকা কোথায় পেলে?

আর্ণষ্ট। ওরা দিয়েছে। আমাকে যাতে পোষা পায়রা বলে মনে হয়, তাই ওরা নতুন পোশাক পরিয়ে দিয়েছে, পকেটে ভরতি করে দিয়েছে টাকা। তারপর ইস্তাহার বেরিয়েছে—আর্ণষ্ট টাউসিগ সরকারের পোষা পায়রা। কে ছাপিয়েছে ইস্তাহার জিজ্ঞেস করছ? না কমরেডরা নয়, নাৎসিরা, কমরেডরা আমাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ভিড়ের ভিতর থেকে কতোদিন ঢিল ছুঁড়েছে—এই তো চলছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও আজ আমাকে ঠাট্টা করে। চারিদিকে অবিচার অত্যাচার!

কার্ল। কেন, কেন, ভেবে দেখেছ কি?

আর্ণষ্ট। রাত্রে একজন গোয়েন্দা আমাকে তার বাড়ি নিয়ে যায়। সেইখানেই থাকি। আমি যেন কেমন হয়ে গেছি—শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরে যায়। রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে দেখি ঘামে বিছানা ভিজে গেছে। জিভ পুরু হয়ে এসেছে, চোখ খুলতেও কেমন কষ্ট হয়।

টিল্লি। আর্ণষ্ট,বলো, আমরা কি করতে পারি?

আর্ণষ্ট। কিছু. কিছু না। শুধু আমাকে বিশ্বাস করো টিল্লি, এমন কাউকে আমি কাছে পেতে চাই, যে আমাকে বিশ্বাস করে। আমি বিশ্বাসঘাতক নই, বিশ্বাসঘাতক নই! তবুও জানি, আমি দল হারিয়েছি, আমার পরিচয় দেবার মতো আজ আর কিছুই নেই। আজ আমার সম্বন্ধে পার্টির সভ্যদের সতর্ক করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তোমরা দুজনতো আমাকে বিশ্বাস করতে পার! পারবে? দলগত নীতির দিক দিয়ে পারবেনা জানি, কিন্তু ভাই হিসেবে, স্বামী হিসেবে তো পারবে? কার্ল অমন করে তাকিয়ো না!

কার্ল। হুঁ! বুঝেছি।

আর্ণষ্ট। কি?

কার্ল। গন্ধ ভুর ভুর করছে! তুমি গায়ে সেণ্ট মেখে এসেছ?

আর্ণষ্ট। সেদিন একটা দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কি খেয়াল হোলো, দোকানে ঢুকে সুগন্ধি সাবান কিনলাম। ফুলের মতো গন্ধ, (আর্ণষ্ট শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। কার্ল ইতিমধ্যে টেবিল থেকে ইস্তাহারগুলি সরিয়ে ফেলেছে) পাঁচ সপ্তাহ আগে হাতখানা দেয়ালে না কিসে লেগে আহত হয়, পচে উঠেছিল। ওরা কেটে ফেললো—চমৎকার ডাক্তার কেলনার। (দীর্ঘক্ষণের বিরতি। হাঁ, একখানা হাত তার নেই। নুলো হাতখানা পকেটে পুরে রেখেছিল বলেই এতক্ষণ বোঝা যায়নি, এখন হঠাৎ পকেট থেকে তুললো। টিল্লি তার কাছে ছুটে এল) ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা! তিন মাস কেটে গেল! খুব আরামে কাটেনি। তাই বলছিলাম, তোমাদের সব শুনতে হবে, শুনতে হবে। কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি, ওদের কাছে সব খুলে বলতে হবে। (হঠাৎ হেসে উঠলো, তার পর ফিস ফিস করে) তোমরা কি করবে জানো? এই যে যোগাড় করে নিয়ে এসেছি—এই এই যে পিস্তলটা, একহাত দিয়ে তো পারব না, নাও আমাকে হত্যা কর।

কার্ল। হত্যা করব?

আর্ণষ্ট। হাঁ, হত্যা কর। পিস্তলটা তুলে নাও। কার্ল, চুপ করে রইলে কেন? এক সময়ে না তুমি

আমাকে খুব ভালোবাসতে ? হত্যা কর, হত্যা কর। আর একদিন দেরী করলে হয়ত আদালতে দাঁড়িয়ে আসামীদের সনাক্ত করব, তাদের সবাইকেই যে আমি চিনি। তখন তো আরো সর্ব্বনাশ হবে। দাঁড়িয়ে দেখছ কি, ঘোড়া একটু ঠেলে দাও, হাঁ দাঁড়াও, এই টাকা এনেছি, এনেছি আমাদের সংগ্রাম ভাণ্ডারে জমা দিতে। আর পারতো, একজন কমরেডকে জানিও, বিশ্বাসঘাতক আমি নই। ওরা আমাকে নির্য্যাতন-নিপীড়নে পাগল করে দিয়েছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের কলঙ্ক এঁকে দিতে পারে নি।

কার্ল। সত্যি ?

আর্ণষ্ট। হাঁ!

টিল্লি। না, না, তুমি মরতে পাবে না।

আর্ণষ্ট। টিল্লি আর তো আমার কিছু করবার নেই, কার্ল—?

কার্ল। ওরা আগেই ওকে হত্যা করেছে।

আর্ণষ্ট। ঠিক ঠিক। কিন্তু তুমি বেঁচে আছো, কমরেডরা কাজ করে চলেছে। যেদিন আমরা সফল হব, সেদিন তো আমার অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না, এই যে সাম্যের প্রাকার গড়ে উঠলো, তার একটা অংশতো আমারই গড়া। কার্ল দেরী করোনা। পিস্তল তুলে নাও!

কার্ল। না, না, আমি পারব না।

আর্ণষ্ট। আমি নিজেও যে পারব না কার্ল। শরীরে শক্তি নেই...ছি, টিল্লি কাঁদে না। শ্রমিকের বুর্জোয়াদের মতো কান্না সাজেনা! কার্ল, কি করবে বল ?

কার্ল। আমি পারব না। নিজের পথ তুমি নিজে খুঁজে নাও—ওদের হাতের খেলনা তুমি হোয়োনা। পৃথিবী তখন জানবে, তুমি নির্দোষ...(উত্তেজিত হয়ে) আমি তো তোমার বিচারক নই আর্ণষ্ট!

আর্ণষ্ট। জটিল কলকব্জা (পিস্তল তুলে নিল) জার্মান শিল্পীর হাতের সেরা কাজ! টিল্লি, কার্ল, ব্যথায় আমাদের বুক খান খান হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর মতো মহান বুঝি আর কিছুই নেই। এই ব্যথাই একদিন আনন্দের জন্ম দেবে। হিংসার সাম্রাজ্যের হবে অবসান, রাতের আঁধারের পরে আসবে আলোর বন্যা। আমরা প্রস্তুত, আগুনে পুড়ে পুড়ে আমরা খাঁটি হয়ে গেছি; আমাদের রক্তই একদিন পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে দেবে, আসবে প্রতিভোর মুক্তি। অভিশাপ মোচন হবে, বিশ্ব সোভিয়েটে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাস করবে মানুষ! হাঁ, সেই নিরাপত্তা, সেই মুক্তির দিন মানুষের এগিয়ে আসছে (কার্ল আর টিল্লির দিকে তাকিয়ে) কাজ করে যাও কমরেড। সেদিন আসছে—আসছে। (প্রস্থান)

টিল্লি। (এক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, তার পর দরজার দিকে ছুটলো। কার্ল তাকে বাধা দিল) কার্ল, কার্ল, ওকে ফেরাও, ওকে ফেরাও।

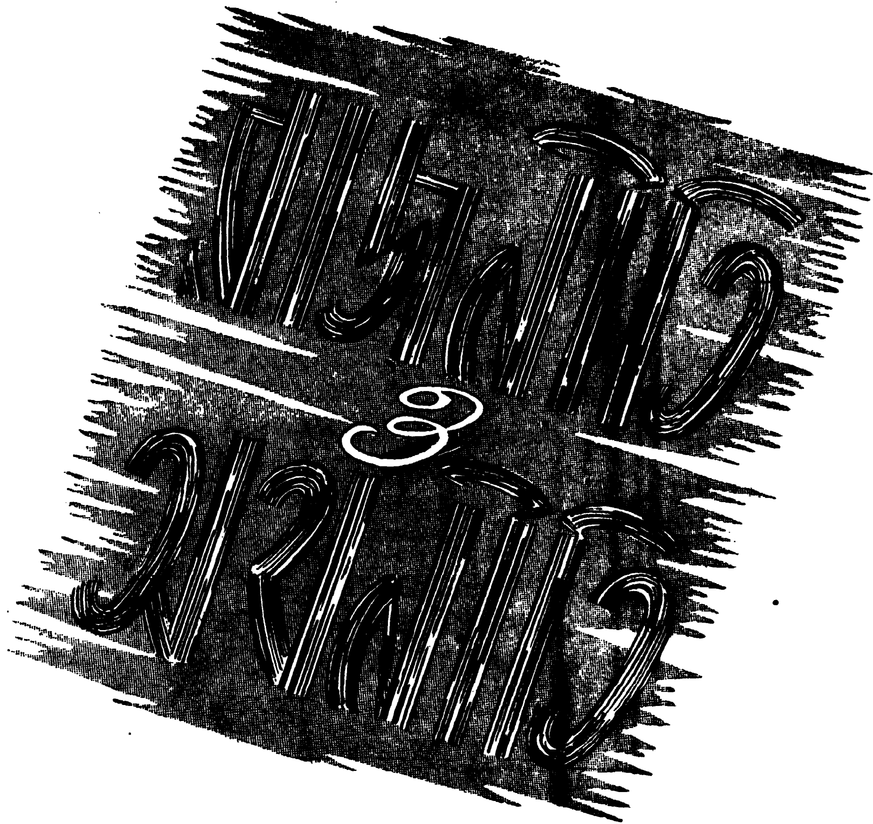
কার্ল। না, না, ওকে মরতে দাও।

টিল্লি। কার্ল.........(গুলির শব্দ শোনা গেল)

কার্ল। বাঁচুক, এমনি করেই সেই বেঁচে উঠুক!

পর্দা ধীরে নেমে এলো

অশোক গুহ



স্বাধীনতার নানাদিক

এই বছর মার্চ্চমাসের মাঝামাঝি সময়ের কথা। ইংলণ্ড হইতে ভারতগামী একটী জাহাজ। আরোহীদের মধ্যে দুইজন বাঙালী যুবক ছিলেন, একজনের নাম সমর সেন অপরটী হইতেছেন লতিফ-পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান। ইংলণ্ডে ছুটী ফুরাইবার পর সৈন্যবাহিনীর কয়েকজন ইংরেজ সেই জাহাজে ফিরিতেছিলেন। অপরাপর আরোহীদের মধ্যে ভারতের সোভিয়েট দূতাবাস সম্পর্কিত একজন কাজাক্ ভদ্রলোক এবং একজন ইউরোপীয় ইহুদী ডাক্তার ছিলেন। এই কয়জন মিলিয়া জাহাজে প্রতিদিন বেশ একটী আড্ডা জমাইত। সমর ছিল জাহাজের মধ্যে পিংপং খেলার সেরা ওস্তাদ—ইংরেজ সৈনিক রবার্ট সমরের কাছে পিংপং-এ হারিবার পর দুজনে খুব বন্ধুত্ব হয়।

একদিনের সান্ধ্যসভায় কথা উঠিল স্বাধীনতা লইয়া। ঠিক হইল প্রত্যেকে নিজের নিজের ধারণা অনুযায়ী স্বাধীনতার কথা বলিবে। প্রথমে সুরু করিল সমর।

সমরের কথা : আমার অন্তর থেকে স্বাধীনতা বলতে ভারত থেকে ইংরেজ তাড়ানোর কথা বেরিয়ে আসে। ছেলেবেলার একটা ঘটনা বেশ মনে পড়ে, বোধ হয় সেইদিনই আমার দেশপ্রেমের দীক্ষা। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে তখন খুব ভাল ব্যাণ্ডের বাজ্‌না হ'ত। বাজ্‌না শুনতে গিয়ে দেখি যে সেটা আমাদের জন্য নয়। সাহেব-মেমরা সব ভালো জায়গা দখল ক'রে বসেছে, বাঙালীরা অচ্ছুতের মতো এধারে-ওধারে দাঁড়িয়ে আছে, সাহেবরা কোনও দেশী আদমী কাছাকাছি এলে ভুরু কোঁচ্‌কাচ্ছে। আমাদেরই কলকাতা সহরে! আমাদেরই ট্যাক্সের পয়সা থেকে ভাড়া করা ব্যাণ্ড! আমার মন তিক্ততায় ভ'রে উঠ্‌ল, বাজ্‌না না শুনে চ'লে এলাম। দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াতে না পার্‌লে যে আমাদের মনুষ্যত্ব ব্যর্থ তা মনেপ্রাণে বুঝ্‌লাম। তারপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও পীড়নের সঙ্গে পরিচিত হ'য়েছি,—দেশবাসীর অনাহার, দারিদ্র্য, বেকারী সব কিছুর সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখ্‌তে পেয়েছি। আমাদের দেশে আর্থিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা বল্‌তে আমি মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ ইংরেজ তাড়ানো বুঝি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে আমি কোন ইংরেজকে বিশ্বাস করিনা।

সমরের কথার মধ্যে যথেষ্ট জ্বালা ছিল। বৈঠকের আবহাওয়া থম্‌থমে হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ রবার্টের চোখেমুখে অস্বস্তির ভাব দেখা গেল। এরপরে রবার্ট বলা সুরু করিল ঃ

ভারতের পরাধীনতার জন্য সমর যা ব'লেছে তার কতক অংশে আমার দুঃখ হ'লেও আমি ইংলণ্ডের খেটে-খাওয়া লোকেদের তরফ থেকে বল্‌ছি যে আমি ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। সমর পরাধীন দেশের লোক ব'লে ভালো ক'রে বুঝ্‌তে পারেনি যে ইংলণ্ড হ'চ্ছে আসলে দুটো,—খেটে-খাওয়া লোকেদের ইংলণ্ড আর শোষক সাম্রাজ্যবাদীদের ইংলণ্ড। ভারতকে পরাধীন ক'রে রেখেছে যারা, ঠিক তাদেরই বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী লড়াই করছে। ইংলণ্ড ভারতের মতো পরাধীন নয় কিন্তু জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের শতকরা ৮০।৯০ জনই পরাধীন। ১৯৩৮ সালে বৃটেনের সমগ্র ব্যক্তিগত সম্পদ একত্র করলে তার পরিমাণ হত সতর শো কোটী পাউণ্ড। আর ইংলণ্ডের শতকরা একজন ছিল এর শতকরা ৫৫ ভাগের মালিক; শতকরা ৭জন ছিল শতকরা ৮৫ ভাগের মালিক। পাঁচটা বড় বড় ব্যাঙ্ক বেশীর ভাগ লেনদেনের কর্ত্তা,—তারা মনে করলে যখন খুসী গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যবস্থা অচল করতে পারে। লোহা, রেলওয়ে, কয়লা, রসায়ন প্রভৃতি শিল্পে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানদের কর্ত্তৃত্ব। এদের সঙ্গে আবার বড় বড় ব্যাঙ্কগুলোর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। প্রায় সমস্ত বড় বড় খবরের কাগজ ধনীদের হাতে, এমনকি লেবারপার্টির মুখপত্র 'ডেলী হেরাল্ড' পর্য্যন্ত ধনীরা দখল ক'রেছে। সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী, পররাষ্ট্র বিভাগ, সরকারী দপ্তরখানা সর্ব্বত্র বড় বড় সব পদ ধনীশ্রেণীর সন্তানদের একচেটিয়া অধিকারে। এর ফলে ধনীশ্রেণীর পলিসিই সরকারী নীতি হ'য়ে উঠে। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে দুটো মহাযুদ্ধ এবং লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হ'য়েছে,—দুটো মহাযুদ্ধের যুগে ৩০ লক্ষ লোক বেকার হ'য়েছে, মজুরী কমেছে। আবার যুদ্ধের পরে সংকট আসছে। বেকার সমস্যা আস্‌ছে এবং একচেটিয়া কারবারীরা নিজেদের স্বার্থে তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্ল্যান করছে। আমি ইংলণ্ডে স্বাধীনতার লড়াই বল্‌তে বুঝি যে একচেটিয়া কারবারের অবসান করতে হ'বে, সমস্ত শিল্প ও যানবাহন রাষ্ট্রের সম্পত্তি করতে হবে, জনসাধারণের সকলের জন্য কাজ ও ন্যায্য জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে, সরকারী দপ্তরখানায় এবং সৈন্যবিভাগের উপরতলায় ধনীদের বাসা ভাঙ্গতে হবে, উপনিবেশগুলো স্বাধীন করতে হবে, তৃতীয় মহাযুদ্ধের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে। ইংলণ্ডের আজকের দিনে স্বাধীনতা হচ্ছে ধনীদের পলিসিমতো চলবার বাধ্যবাধকতা। যারা ভারতকে গোলাম করেছে, তারা ইংলণ্ডের শতকরা ৮০।৯০ জন লোককেও গোলাম ক'রে রেখেছে। ভারতের স্বাধীনতার লড়াই আমার লড়াইকে জোরদার করে,—ভারতে সাম্রাজ্যবাদের আপোষের চক্রান্ত আমার লড়াইকে দুর্ব্বল করে। আমি চাই যে সমর দেশে ফিরে গিয়ে স্বাধীনতার আপোষহীন সংগ্রাম সুরু করুক, ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী সেই সংগ্রামে নিজেদের স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের সমর্থনই দেখ্‌বে।

এইবার লতিফ কথা বলিল : সমর ভারতবর্ষের সকলের মনের কামনার প্রাথমিক দিকটাই ব্যক্ত করেছে। একথা সত্যি যে আমাদের দেশের সকলেই মনেপ্রাণে ইংরেজ তাড়ানোর কথা ভাবে। কিন্তু স্বাধীনতা তো অত সরল সহজ নয়? ইংরেজ তো গেল, তারপর দেশী রাজারা? ইংরেজের সৃষ্টি জমিদারেরা? ইংরেজের কারবারের নূতন সঙ্গীসাথী টাটা-বিরলাদের কর্ত্তৃত্বের প্রশ্ন? মুসলমানপ্রধান এলাকায় স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রশ্ন? আর এই সব প্রশ্নের সমাধান ছাড়া ইংরেজ-তাড়ানোই বা সফল হবে কি ক'রে? জনসাধারণের স্বার্থে, পূর্ণবয়স্কদের ভোটে এবং সকলের সংগ্রামের জোরে এই সব কটী প্রশ্নের সমাধান ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আমার কাছে কেমন অবাস্তব মনে হয়।

কাজাক ভদ্রলোকটী ভাল ইংরেজী জানেন না। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে তিনি নিজের বক্তব্য সুরু করিলেন : ভারতে নানাজাতির বাসের জন্য যে সমস্যা, আমাদের সোভিয়েট ইউনিয়নে তার সমাধান করা হ'য়েছে। আমাদের দেশে সমস্ত সমভাষাভাষী জাতির আলাদা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার আছে,—এই সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নে মিলিত হ'য়েছে। জাতিগত লড়াই যা জারের আমলে ছিল,—শোষণ, পক্ষপাতিত্ব এবং বাধ্যতামূলকভাবে একত্র বেঁধে রাখার যুগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার শেষ হয়েছে। গত যুদ্ধে নাৎসি আক্রমণের বিরুদ্ধে লেনিনগ্রাডের রক্ষায় লেনিনগ্রাডের নাগরিকের পাশে কাজাক যুবক একই রকম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে জারশাহী রাশিয়া টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবার অবস্থায় পৌঁছেছিল, এবার সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বলে আমাদের একতার মধ্যে একটুও ফাটল ধরেনি।

আরও একটা কথা বলি। সেবছর যখন বিখ্যাত নিগ্রো গায়ক পল রোব্‌সন তাঁর বালক পুত্রকে নিয়ে রাশিয়ায় আসেন। দুজনেই রাশিয়ায় উপলব্ধি করলেন যে এখানে লোকের মন থেকে গোরা-কালা বৈষম্যের জন্য ঘৃণা অথবা অবহেলার মনোভাব একেবারে নেই। শোষণ নেই, জাতিগত বা ধর্মগত ভেদাভেদ নেই, ষ্টালিন শাসনতন্ত্রে দেশের পরিচালনায় ব্যাপক জনসাধারণের শক্তি ও প্রতিভা রূপায়িত হতে পেরেছে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ১৯১৩ সালের তুলনায় বহুগুণ উঁচু হয়েছে,—আমার মনে হয় আমাদের সোভিয়েট ইউনিয়নে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নের জবাব সশরীরে বর্ত্তমান।

এইবার আলোচনা সুরু হইল। লতিফ তার পুরানো প্রশ্ন তুলিয়া সমরের কাছে উত্তর চাহিল।

লতিফ : আচ্ছা ধরো ভারতে ইংরেজ নেই, মন্ত্রিমিশন তো ইংরেজ ফিরিয়ে আনবার কথা দিয়েছে! তারপর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানুষের যোগ্য ব্যবহার সব আপসে এসে যাবে?

সমর : ইংরেজ গেলে শোষণের একটা মস্ত বড় ভার চ'লে যাবে।

লতিফ: বৃটিশ তো সম্বৎসরে ২০ কোটী টাকা বার্ষিক ট্রিবিউট পায়? ধরো বৃটিশ রাজ থাক্‌লোনা—বৃটিশ রাজ না থাকা সম্বন্ধে আমরা এখানে সকলেই একমত তো?

শ্রোতারা সকলেই সায় দিলেন।

—কিন্তু ধরো যে টাটা ও বিরলার সঙ্গে বৃটীশ মূলধন ও মালিকদের যোগাযোগ থাকলো, দেশী রাজগুলো থাকলো, জমিদারী প্রথা থাকলো। ইঙ্গ-ভারত সন্ধি অনুযায়ী কিছু বৃটিশ সৈন্যও থাকল। তাহলে কি তোমার জন সাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের যোগ্য ব্যবস্থা হবে?

সমর: স্বাধীন হ'লে শিল্পের মালিক, জমিদার এবং দেশীয় রাজাদের শায়েস্তা করতে কতক্ষণ?

ইহুদী ডাক্তার: এবার আমাদের কিছু বল্‌তে হলো! ভারত থেকে ইংরেজ যাক্ সে বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই। কিন্তু মনে করো হিট্‌লারের জার্ম্মানীও তো বিদেশী রাজার অধীন ছিলনা কিন্তু সেখানে কি স্বাধীনতা ছিল?

সমর: নিশ্চয়ই ছিল।

ডাক্তার: স্বাধীনতা বলতে প্রতিদিনকার জীবনে গোটাকতক মোটামুটী অধিকার বুঝি, যেমন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, ধর্ম্মমতের স্বাধীনতা, জাতিগত বৈষম্যের লোপ প্রভৃতি। হিটলারী শাসনে মজুর ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল, ইহুদিদের হত্যা করা সুরু হ'ল,—আমারই স্ত্রীপুত্রদের মধ্যে কেউ বেঁচে নেই। পূর্ব্ব প্রাশিয়ার জমিদার য়ুঙ্কারদের রাজত্ব এবং সমস্ত জার্ম্মানী জুড়ে পাঁচ সাতটা বড়ো বড়ো একচেটিয়া কারবারের প্রভুত্ব কায়েম হ'ল। বড়ো বড়ো কারবারের লাভ তিনগুণ বাড়ল আর শ্রমিকদের জীবনযাত্রা দরবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে নাম্‌তে লাগলো। এখন মনে করো যে তোমাদের সরাসরি ইংরেজ প্রভূত্ব নেই কিন্তু রাজত্বের দখল গিয়েছে কারবারী আর জমিদারদের হাতে। তাহ্‌লেও কি স্বাধীনতা হ'ল?

কাজাক: যেমন মনে করুন জারের রাশিয়া, সেখানে শ্রমিক অধীন ছিল, কৃষক প্রায় দাস ছিল আর আমাদের মতো সমস্ত অ-রুশীয় জাতিগুলি গোলামের অধম ছিল। শুধু তাই নয়। রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে রুশিয়া পরাধীন না হ'লেও বাস্তবে রুশিয়া আবার বৃটিশ ও ফরাসী ধনকুবেরদের কথায় উঠ্‌ত বস্‌ত।

সমর: একথা ঠিক যে স্বাধীনতা বল্‌তে বৃটিশ অধিকার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথাই আমরা ভাবি, দেশও তাই চায় এবং নেতারা তাই বলেন।

রবার্ট: যেমন ইংলণ্ডে গণতন্ত্র আছে?

সমর: তাই।

রবার্ট ঃ তোমার কথা এই দিক দিয়ে ঠিক যে পরাধীনতা কিংবা স্বেচ্ছাতন্ত্র অথবা ফ্যাসিজমের তুলনায় ইংলণ্ডের গণতন্ত্রেরও যথেষ্ট দাম আছে। কিন্তু আমি বল্‌তে চাই যেমন যুদ্ধের আগে গণতন্ত্র সত্ত্বেও ইংলণ্ডে গড়ে ২০ লাখ বেকার ছিল, গণতন্ত্র সত্ত্বেও দু' দুবার ধনীদের স্বার্থে লড়াই হল, তেমনি এখন লেবার পার্টির জয় সত্ত্বেও গণতন্ত্র কাজের হবে না যদি না—

সমর ঃ যদি না কি হয় ?

রবার্ট ঃ যদি না একচেটিয়া কারবার, ব্যাঙ্কের প্রভুত্ব, সৈন্য বাহিনী ও সরকারী দপ্তরে ধনীদের ক্ষমতা নষ্ট করা যায়।

সমর ঃ ওঃ তুমি তো সাম্যবাদের কথা এনে ফেল্‌লে। তোমার কথায় সাম্যবাদ ছাড়া স্বাধীনতার বা গণতন্ত্রের অথবা জনসাধারণের সুখসুবিধার গারান্টি নেই! কিন্তু সাম্যবাদ সত্ত্বেও রাশিয়ায় কেন স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র নেই ?

কাজাক ঃ রাশিয়ায় স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র নেই ?

সমর ঃ নেই-ই তো। রাশিয়ায় সুখ আছে কিন্তু স্বাধীনতা নেই।

কাজাক ঃ আমার মনে হয় যুদ্ধের আগেকার যুগের রুশ সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য নিরপেক্ষ লেখকের বই তুমি পড়ো নি। যেমন তোমাদের টেগোর, অথবা ইংলণ্ডের সিড্‌নী ওয়েব কিংবা ডীন অব্‌ ক্যাণ্টারবরী। পড়েছ কি ?

সমর ঈষৎ লজ্জিত ভাবে মাথা নাড়িল।

কাজাক ঃ আচ্ছা ওসব বই না হয় নাই পড়লে কিন্তু হিটলারের যুদ্ধ যা স্পষ্ট প্রমাণ করল, তা কেন স্বীকার করবে না ? স্বাধীন না হলে এ যুদ্ধে রাশিয়ার জনসাধারণের বীরত্বের ব্যাখ্যা তুমি কি ক'রে করবে ?

সমর ঃ রাশিয়ার লোক দেশপ্রেম থেকে লড়েছে।

কাজাক ঃ অবশ্য অবশ্য। কিন্তু জারের সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধে রাশিয়া টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গিয়েছিল। সৈন্যরাও বিদ্রোহ করেছিল। দেশপ্রেম সেদিন কোথায় ছিল বলো ?

সমর ঃ তুমি কি ভাবে ব্যাখ্যা করবে ?

কাজাক ঃ জারের যুগে রাশিয়া ছিল বহু জাতির বন্দীশালা—সোভিয়েট যুগে প্রত্যেকটী জাতি স্বাধীন ও সমান। তারা নিজেদের পৃথক রাষ্ট্র গড়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানগুলি জনসাধারণকে দারিদ্র্য, ও বেকার সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়েছে, সাম্যবাদ শোষণপ্রথাকে আগেই খতম করেছিল। সর্ব্বশেষে ষ্টালিনগণতন্ত্রে সবদেশের চাইতে ব্যাপক গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে। এই জন্য শৌর্য, দেশপ্রেম, উদ্ভাবনী শক্তি এবং একতার অপরাজেয় শক্তি নিয়ে রাশিয়া লড়াই করেছে।

সমর : স্বাধীনতার নানাদিক নিয়ে অনেক ভাববার কথা আছে। আমার অন্তরের রাগ ইংরেজের বিরুদ্ধে কিন্তু শুধু রাগ দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না একথা বুঝলাম। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতির সমস্যা, বিলেতী ধনীদের সঙ্গে দেশী ধনীদের চুক্তির সমস্যা, দেশীয় রাজ্য ও জমিদারী প্রথা আর বেকার ও দারিদ্র্য সমস্যা সব কিছুর সমাধান না হ'লে স্বাধীনতার চেহারা পূর্ণাঙ্গ হয় না। তবু আমার মনে হচ্ছে এ সবগুলিই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গে জড়িত, এই গুলোর উপর ভিত্তি করেই বৃটিশ আছে। তাই একই সঙ্গে এদের অবসানের জন্যে এগোতে হবে।

সেদিনকার আলোচনা এইখানেই শেষ হইয়াছিল।

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী

ধনতন্ত্রের গলদ কোথায়

ধনতন্ত্র বলতে কি বোঝায়? ধনবিজ্ঞান নামে একটা শাস্ত্র আছে। ইংরাজিতে তাকে বলে ইকনমিক্‌স্‌। ধনবিজ্ঞানের নাম আমরা সবাই শুনেছি। নানা রকম অঙ্ক ক'ষে ও মিহি তর্কের জাল বুনে এই শাস্ত্র কী সব খটমট কথা বলে তা আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না।

আসলে কিন্তু ধনতন্ত্র জিনিসটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়। যেটাকে অর্থনীতি বলা হয় সেটা কিছুই নয়, এক ধরণের গৃহস্থালী। বাড়ীর মা এই গৃহস্থালী চালান। বাড়ীর মা যে জিনিসটা বোঝেন সেটা মায়ের রকমসকম দেখে আমরাও কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। বাবা রোজগার করে যে টাকাটা আনেন, মা সেটা এমন ভেবেচিন্তে হিসাব করে খরচ করেন যে বাড়ীর সকলের অভাব মোটের উপর এমন ভাবে মেটে যে অন্য কোনো ভাবে খরচ করলে তেমনটি মিটতো না। অর্থাৎ মার একটা প্ল্যান আছে। এবং সেই প্ল্যানটা খরচের দিক থেকে ভালই। কিন্তু মা তো শুধু খরচই করেন, রোজগারটা করেন বাবা। বাবার রোজগারটা ঠিক ক'রে দেয় কে? এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই ভাবতে হবে বাবা কোন্ শ্রেণীর লোক। ধনতান্ত্রিক সমাজে মোটের উপর দুই শ্রেণীর লোক আছে। একদল লোক মালিক। জমি, খনি, কল, কারখানা ডক, জাহাজ, রেল, বাস ইত্যাদি সব রকম উৎপাদন যন্ত্রের মালিক তাঁরা। আর একদল লোক শ্রমিক। এঁরা খেটে খান, মালিকরা কাজ না দিলে এঁদের উপোস, মালিকরা এঁদের যে মাহিনা দেন তাই এঁদের রোজগার। মালিকরা মুষ্টিমেয়, সমাজের অধিকাংশ লোকই শ্রমিক। দেশের অধিকাংশ কিশোর কিশোরীদের বাবা এবং মা এই শ্রমিকের দলে। কাজেই বাবা রোজগারি ক'রে কত আনেন সেটা বুঝতে হলে শ্রমিকের মাহিনা কি করে ঠিক হয়, এই প্রশ্ন ওঠে।

এ জিনিসটা বোঝাও মোটেই শক্ত নয়। ধনতান্ত্রিক জগতে মানুষের শ্রম পণ্যের মতো বাজারে বেচাকেনা হয়। শ্রমিক যদি আট ঘণ্টা শ্রম করেন, এই আট ঘণ্টা শ্রমের

ফলে তিনি যা উৎপাদন করবেন তার সবটুকু তিনি পাবেন না। মালিক তাঁর শ্রমটুকু কিনবেন এমন একটা মাহিনা দিয়ে যাতে ক'রে কায়ক্লেশে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীপুত্রের খাওয়া-পরা চলতে পারে। এই মাহিনা দিয়েই যখন শ্রমটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তখন পণ্য হিসাবে মানুষের শ্রমের এইটুকুই মূল্য। এই মাহিনায় যে সব জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যায় তা উৎপাদন করতে হয়তো বার ঘণ্টার বেশী শ্রম করতে হয় না। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক (অর্থাৎ অধিকাংশ পরিবারের বাবা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাও) নিজের জন্য শ্রম করেন চার ঘণ্টা এবং বাকী চার ঘণ্টা শ্রম করেন মালিকদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য।

এই মালিকদের আমরা বলি পুঁজিপতি। পুঁজিপতিদের আমলে সমাজের চেহারাটা কি রকম দাঁড়িয়েছে তাই একটু ভেবে দেখা যাক্। বহু মানুষে একত্র হয়ে যখন একটা বিরাট পরিবার গড়ে তোলে তখন তাকেই আমরা বলি সমাজ। সমাজ নিজের অভাব মেটাবার জন্য একটা গৃহস্থালী রচনা করেছে। প্রকৃতি মানুষকে কিছুটা সম্পদ দিয়েছে, যেমন, আকাশ, বাতাস, জল, নদী, পাহাড়, জঙ্গল, জমি, খনি। কিন্তু প্রকৃতির অযাচিত ভাবে দেওয়া সম্পদে মানুষের কুলোয় না। মানুষকে তাই প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে অনেক কিছু আদায় করে নিতে হয়। মানুষ মাথা খাটায় ও কায়িক শ্রম করে। এই ক'রে সে অনেক হাতিয়ার ও যন্ত্র বানিয়েছে, কল কারখানা, রেল, খাল, জাহাজ, বন্দর, লোহার ও কয়লার খনি তৈরী করেছে, গরু, মহিষ ঘোড়া ও ছাগল প্রতিপালন ক'রে নিজের শ্রমকে লঘু করার চেষ্টা করেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক'রে মানুষ প্রকৃতির কত রহস্য আবিষ্কার করেছে, কত কৌশল ও উপায় উদ্ভাবন করেছে অল্প শ্রমে কার্যসিদ্ধির জন্য।

এই সব জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা-কৌশল, হাতিয়ার-যন্ত্র সমাজের গৃহস্থালী পরিচালনার কাজেই লাগানো উচিত। কি কি জিনিস উৎপাদন করতে হবে, কোন্ জিনিসটা কতখানি উৎপাদন করতে হবে, বর্তমানের জন্যই বা কতটুকু জিনিস সরবরাহ করা দরকার এবং ভবিষ্যতের জন্যই বা কি সংস্থান করা দরকার এই সব ব্যবস্থা জন সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি প্ল্যান করেন তারই নাম হবে সোশালিজম্ বা সমাজতন্ত্র। সামাজিক গৃহস্থালীর পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় অভাবগুলিকে গুরুলঘু হিসাবে সাজানো মোটেই অসম্ভব নয়। সাধারণ বুদ্ধি, বিজ্ঞানের শিক্ষা ও জনমতের সাহায্যে এই কাজটা অনায়াসেই সম্পন্ন করা যায়।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের কাজটা আদৌ গৃহস্থালীর মতো পরিচালিত হচ্ছে না। গৃহের লোকেরা সবাইকে যদি আপনার লোক বলে মনে করে তবেই তো একটা গৃহস্থালী গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজে সবার মধ্যে এই আপন বোধটা

মোটেই নেই। এ সমাজে গৃহস্থালী নেই, আছে গৃহযুদ্ধ—ধনিকে ও শ্রমিকে। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি শ্রমিক প্রাণান্ত শ্রম ক'রে প্রকৃতির হাত থেকে যে সব ঐশ্বর্য আদায় করেছে সেই সব জমি খনি ও কল কারখানা মানুষের অভাব মেটানোর উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এসব মালিকদের সম্পত্তি। তাঁরা এগুলোকে ব্যবহার করছেন পুঁজি হিসাবে। যন্ত্র জিনিসটা আসলে হওয়া উচিত মানুষের ভৃত্য। মানুষেই তাকে সৃষ্টি করেছে নিজের কাজে লাগানোর জন্য। আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতো মানুষের ফরমাস খাটাই তার কাজ। কিন্তু যন্ত্র যখন পুঁজি হয়ে উঠে তখন সে আর শুধু যন্ত্র থাকে না, সে তখন হয় যন্ত্র-দানব। আরব্য উপন্যাসের মানুষের ফরমাস খাটা দৈত্য নয়, এ হচ্ছে আধুনিক যুগের মানুষ-খেকো ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। এই যন্ত্ররূপী ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের পৈশাচিক লীলা দেখে আমাদের রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেক কবি, দার্শনিক ও মানবহিতৈষী অত্যন্ত ভীত হয়ে এর তীব্র নিন্দা করে গেছেন। কিন্তু দোষ তো যন্ত্রের নয়। যন্ত্র যন্ত্রই, মানুষ তাকে যে ভাবে চালাবে সে সেই ভাবে চলবে। যন্ত্রের মধ্যে পুঁজিপতিরূপে যে ভূতটি বাস করছে সেই ভূতটি ছাড়ানো দরকার।

যন্ত্র যখন পুঁজিতে পরিণত হয় তখন সেটার চেহারা বদলে যায়। ইঁট কাঠ লোহা দিয়ে গড়া তার বাস্তব যান্ত্রিক রূপটা তখন আর চোখেই পড়ে না। সেটা হয়ে ওঠে মাত্র একটা অঙ্কের হিসাব—এত টাকা। তোমার আমার মতো লোক তাকে দেখি একটা জড়বস্তু রূপে। কী বিরাট এই কীর্তি! মানুষের অতীত ইতিহাস, যার পুরোপুরি ধারণা করতে আমাদের মন অক্ষম, যার পাতায় পাতায় লেখা আছে লক্ষ কোটি মানুষের ধ্যান ও ধারণা, আশা ও স্বপ্ন, কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম, কত কঠোর জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা, কত সহযোগিতার ও সমবায়ের অমর কাহিনী, সেই ইতিহাসটাই ঘনীভূত হয়ে জমাট রূপ পেয়েছে যন্ত্রে। সুতরাং যন্ত্র তো কোনো ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি হতেই পারে না। তার আর্তনাদের মধ্যে বেজে উঠে সমগ্র মানবসমাজের চিরন্তন কান্না, সে যখন গর্জে উঠে তখন শুনতে পাই লক্ষ মানুষের সমবেত জয়ধ্বনি। কিন্তু ধনতান্ত্রিকের চোখে যন্ত্রটা শুধু একটা টাকার অঙ্ক—চার কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিন টাকা পাঁচ আনা দু'পাই মালিক মিস্টার অমঙ্গলরাম ভিন্‌দেশী। যন্ত্র আর যন্ত্র নয় সেটা একটা পুঁজি। আর পুঁজির উদ্দেশ্য হলো সমাজের অভাবমোচন নয়, পুঁজিকেই আরো বাড়িয়ে তোলা। কি ক'রে এত টাকা আরো অত টাকাতে পরিণত হবে এটাই পুঁজিপতিদের লক্ষ্য। সামাজিক গৃহস্থালীর সম্বলটুকু তাঁরা ব্যবহার করতে চান নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য। জমির মালিক চান খাজনা, যাঁরা শুধু টাকা জমিয়েছেন তাঁরা চান সুদ এবং যাঁরা যন্ত্রের মালিক তাঁরা চান কিছুটা সুদ ও কিছুটা লাভ। এ সবই বিভিন্ন রকমের মুনাফা। মুনাফার স্বরূপটা একই। শ্রমিকের শ্রমার্জিত ফলের কিছুটা অংশ জমির,

যন্ত্রের ও টাকার মালিকরা মালিকানা বাবদ আত্মসাৎ করছেন। এরই নাম মুনাফা। মুনাফা দেওয়ার অর্থ শ্রমিকরা কয়েক ঘণ্টা শ্রম করছেন নিজেদের জন্য এবং বাকী শ্রমটুকু করছেন মালিকদের জন্য। এই বাকী শ্রমটুকুর জন্য শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছেন না, এটা তাঁরা বেগার খাটছেন।

পুঁজিপতিরা যতই অঙ্কের হিসাব করুন না কেন, চার কোটি টাকা কেমন ক'রে আট কোটি হয় এবং আট কোটি টাকা ষোল কোটি হয়, সামাজিক গৃহস্থালীটা মোটেই অঙ্কের জিনিস নয়, সেটা খাঁটি বস্তু জগতের ব্যাপার। জিনিস পত্র তৈরী হয় মানুষের ভোগের জন্য। এটা তো অত্যন্ত সহজ কথা। কোনো রকম তর্কের দ্বারাই এটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চার কোটি টাকাকে প্রথমে জিনিসে পরিণত করতে হবে, তারপর সেই জিনিস বিক্রয় ক'রে আট কোটি টাকা করতে হবে। কিন্তু কিনবে কে? সমাজের শতকরা নব্বুই জন লোকই শ্রমিক। শ্রমিকদের যে বেতন দেওয়া হচ্ছে তা দিয়ে তাঁরা সমগ্র উৎপন্ন পণ্যের এক অংশ মাত্র কিনতে পারেন। বাকী অংশটুকুর অংশীদার মুনাফাখোর মালিকের দল। মালিকদের আয় এত বেশী যে তাঁরা লাখো রকমের বিলাসিতা করেও আয়ের সামান্য ভাগই ভোগ করতে পারেন। ভোগই যদি তাঁরা করবেন তাহলে পুঁজিই বা বাড়বে কি ক'রে এবং অঙ্কের সঙ্গে অঙ্ক জুড়ে বৃহত্তর অঙ্কের স্বপ্নই বা তাঁরা দেখবেন কি ক'রে? কিন্তু বাকী আয়টুকু যদি তাঁরা খরচ না করেন তাহলেই বা মুনাফা বজায় থাকে কি ক'রে? সমগ্র উৎপন্ন পণ্য যদি বাজারে বিক্রয়ই না হয় তাহলে মুনাফাটা আসবে কোথা থেকে? কিছুদিন হয়তো পুঁজিপতিরা জমি, বাড়ী, বাগান, খনি, কল, কারখানা ইত্যাদি কিনে বাজার সরগরম রাখতে পারেন। তখন তাঁদের মনে হয়, আহা সঞ্চয়ের কী মহিমা, পুঁজির কী দেবদুর্লভ বিভূতি! প্রত্যেকটা টাকা নিজের দেহের জ্যোতি দিয়ে আরেকটা টাকা প্রসব করছে। এ যেন পৌরাণিক উপকথা। কিন্তু নিজেদের সঞ্চয় দিয়ে নিজেরাই কলকব্জার যন্ত্রপাতি কিনে যে বেশীদিন বাজার গরম রাখা যায় না, এ ভুল ভাঙতে তাঁদের বেশী সময় লাগে না। যন্ত্র জিনিসটা তো মানুষের ভোগে লাগে না। যন্ত্রের উদ্দেশ্য হলো মানুষের ভোগে লাগে এমন সব জিনিস বেশী ক'রে উৎপাদন করা। কেউ যদি যন্ত্র কেনেন তাহলে মানুষের ভোগে লাগে এমন সব জিনিস তাঁকে তৈরী ক'রে বিক্রয় করতে হবে। নইলে যন্ত্রটা হবে তাঁর গলার ফাঁস। কিন্তু ভোগের জিনিস কিনবে তো শ্রমিকরা—কেননা তাঁরাই সমাজের শতকরা নব্বুই জন। তাঁদের হাতে সমগ্র ভোগের পণ্য কেনার মতো টাকা কোথায়?

কাজেই ধনতান্ত্রিক সমাজে মাঝে মাঝে সংকট দেখা যায়। ধনতান্ত্রিকরা বিলাপ করতে থাকেন, বাজার খারাপ হয়ে পড়েছে, জিনিসপত্র বড় বেশী উৎপন্ন হচ্ছে। বাজারে মন্দা এলেই পুঁজিপতিরা কলকারখানা বন্ধ করেন, শ্রমিকদের ছাড়িয়ে দেন। লক্ষ লক্ষ লোক বেকার

হয়ে পড়ে এবং তাদের ছেলেপুলেরা খেতে পরতে পায় না। ব্যাপার কী? না মানুষ বড় বেশী যন্ত্র নির্মাণ ক'রে খাওয়া-পরার জিনিস বড় বেশী উৎপন্ন করেছে। এই উলট পুরাণ সম্পর্কে একট চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে। কয়লার বাজারে মন্দা আসার দরুণ এক কয়লাখনি শ্রমিকের চাকরি গিয়াছে। প্রচণ্ড শীত, বাড়ীতে আগুন পোয়াবার মতো কয়লা নেই। ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করছে, বড় শীত করছে, আগুন জ্বালাচ্ছো না কেন? মা বল্‌লেন, কয়লা নেই। ছেলে বল্‌লে কয়লা নেই কেন? মা উত্তর দিলেন, তোমার বাবার রোজগার বন্ধ। ছেলে জিজ্ঞাসা করলে, বাবার রোজগার নেই কেন? মা বল্‌লেন, বড় বেশী কয়লা উৎপন্ন হয়েছে বলে।

বেশী কয়লা উৎপন্ন হয়েছে বলে ঘরে ঘরে কয়লার অভাব হবে এই আজব অবস্থার সৃষ্টি করে ধনতন্ত্র। কেননা পুঁজি বাড়ানোই তার লক্ষ্য, সামাজিক গৃহস্থালী নিপুণভাবে চালিয়ে অভাব মোচন ক'রে মানুষকে সুখী করা তার লক্ষ্য নয়। মুনাফা বাড়ানোর জন্য ধনতান্ত্রিক উৎপাদক উৎপাদনপ্রণালীব উন্নতি করতে বাধ্য হন। তার ফলে অনেক নতুন যন্ত্র ও নতুন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। ছোট কারখানা উঠে গিয়ে বড় বড় কারখানা স্থাপিত হয়েছে। প্রত্যেকটি কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিকের মধ্যে কাজ এমন ভাবে বখরা করে দেওয়া হয় যে প্রত্যেকের কাজের সঙ্গে অপর সকলের কাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে। কোনো আধুনিক কারখানায় প্রবেশ করলে কেউ বলবে না যে উৎপাদনের কাজটা কোনো একজনের অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের। বেশ বোঝা যাবে, সমবেত ও সংঘবদ্ধ সামাজিক শ্রমের দ্বারাই ধনতান্ত্রিক জগতে উৎপাদন হয়। অর্থাৎ দশে মিলেই কাজ হয়। শুধু যে কারখানাতেই শ্রমবিভাগ ব্যাপকভাবে রয়েছে তাই নয়, সমাজের মধ্যেও শ্রমবিভাগের শিকড় সমগ্র সমাজের মাটিকে শক্ত ক'রে কামড়ে ধরেছে। এক জায়গায় যে জিনিস উৎপন্ন হচ্ছে সব জায়গায় তার ব্যবহার। কোনো শক্তি, কোনো কারখানাই স্বতন্ত্র ভাবে বাঁচতে পারে না।

এই সামাজিক উৎপাদনের জগতে যদি ব্যবহারের জন্য উৎপাদন না হয়ে বিক্রয়ের জন্য, মুনাফার জন্য, পুঁজি বাড়ানোর জন্য উৎপাদন হয় তাহলেই সংকট ঘটে। পুঁজি যতই বাড়তে থাকে সমাজের উৎপাদন করার ক্ষমতা ততই বাড়ে এবং শ্রমিকদের মাল কেনবার ক্ষমতা ততই কমে। কাজেই বিক্রয়ের বাজারটা ছোট হয়ে আসে এবং বিক্রয় সমস্যা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। একজনের মাল বিক্রয় না হলেই তিনি অপরজনের মাল কিনবেন না। এবং এই দ্বিতীয়জনটির আয় কমে গেল বলে তিনি আবার তৃতীয়জনের মাল কিনবেন না। একজনের ব্যয় অপরজনের আয়। সুতরাং এক জায়গায় মন্দা ঘটলেই হু হু ক'রে মন্দাটা দেশময় এবং পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। এই মন্দার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুঁজিপতিরা বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করেন ও মাল বিক্রয়ের জন্য পরের দেশে বাজার খোঁজেন। বিরাট বিরাট

কারখানা যেখানে উৎপাদন করে সেখানে ছোট পুঁজিপতিরা আর কল্কে পান না। বর্তমান শতাব্দীতে চলেছে বড় পুঁজিপতির যুগ। কোটি কোটি টাকার মালিক কয়েকটি ধনকুবের পুঁজিপতির হাতে অধিকাংশ ব্যবসায় চলে গিয়েছে। যেখানে কোটি টাকার নিরাপত্তা সংকটাপন্ন, সেখানে পরস্পরের সংগে প্রতিযোগিতা করা নিতান্তই মূর্খতা। তাই এই সব বিরাট পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে যোগসাজস ক'রে মনোপলির সৃষ্টি করেছেন। মনোপলি পুঁজিতন্ত্রের ভিতরটায় ঘুণ ধরে গিয়েছে। নিজের দেশে বাজার সংকীর্ণ। নতুন উপনিবেশ স্থাপন ক'রে পুঁজিকে ব্যবহার করার সুযোগ আর নেই। কেননা উনবিংশ শতাব্দীর শেষেই বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিরা পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মধ্যে বখরা করে নিয়েছেন। সুতরাং এখন তাঁদের একমাত্র উপায় যুদ্ধ ক'রে পরের বখরা কেড়ে নেওয়া। যুদ্ধ ছাড়া পুঁজিপতিদের অন্য উপায় নেই বলে মনোপলি পুঁজিতন্ত্রকে সাম্রাজ্যবাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের কাজে শ্রমিকদের নিযুক্ত ক'রে এঁরা ঘরের বেকার সমস্যার সমাধান করতে চান। উগ্র জাতীয়তার পচা মদ খাইয়ে এঁরা দেশের লোককে নেশায় আচ্ছন্ন করেন। জাতীয়তার নামে এঁরা দেশের লোকের স্বাধীনতা কেড়ে নেন, শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়ন ভাঙেন। ঘরে ও বাইরে যুদ্ধই তাঁদের একমাত্র নীতি। জাতীয়তার ও স্বদেশপ্রেমের নামে দেশের ও বিদেশের সমগ্র জনসাধারণকে ধ্বংস করতে যদিও এঁরা খুবই তৎপর কিন্তু প্রয়োজন হলে নিজেদের পুঁজিরক্ষার জন্য পেতঁ্যা, দারলাঁ, লাভাল বা চেম্বারলেনের মতো নিজেদের দেশকে বিদেশীর কাছে বিক্রয় করতে এঁরা একটুও পশ্চাৎপদ নন্। এই দেউলে, বর্বর ও খুনী মনোপলি পুঁজিতন্ত্রই সাম্রাজ্যবাদ, ওরফে ফ্যাশিজম্। পুঁজিতন্ত্র আজ বর্বর, খুনী ও স্বৈরাচারী। এই স্বৈরাচারী, সমরমুখী, ক্রোড়পতিতন্ত্রের ধ্বংস না হলে মানুষের মঙ্গল নেই।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

খবরের কাগজ

খবরের কাগজ। নাম শুনলেই শরীরে রোমাঞ্চ হয়। ছাপার অক্ষরের একটা মন ভুলানো যাদু আছে। খবরের কাগজে লিখেছে একথা শুনলেই আমরা ভক্তিতে, বিশ্বাসে বিগলিত হয়ে পড়ি। গান্ধীজী বলেছেন, খবরের কাগজ হচ্ছে এযুগের বেদ বাইবেল কোরাণের সামিল। কথাটা নতুন নয়। প্রাচীন ইতিহাসে আছে নানা রাজবংশের প্রবল প্রতাপের কাহিনী, আমাদের এই গণতন্ত্রের যুগে আছে তেমনি প্রবল প্রতাপান্বিত খবরের কাগজ বংশের কাহিনী। কার্লাইল ব্যঙ্গ করেছিলেন, খবরের কাগজ তো নয়, খবরের কাগজ-বংশ (Broad-sheet Dynasty.)। নেপোলিয়ন বলতেন, বন্দুক বেয়নেটের চাইতেও খবরের কাগজের ক্ষমতা ঢের বেশী মারাত্মক। এক জার্ম্মান জুলুমবাদ রাজনীতিজ্ঞ বলেছিলেন যে আইন কানুন তৈরীর ক্ষমতা আমি চাই না। খবরের কাগজগুলি সাতদিনের জন্য আমার হাতে ছেড়ে দিলেই, মতলব হাসিল করতে পারব। পিকউইক সাহেবও ভক্তিভরে খবরের কাগজের সম্পাদককে সেলাম দিয়ে বলেছিলেন—খবরের কাগজ হচ্ছে একটী মহাপরাক্রান্ত এঞ্জিন। কথাটায় একটুও বাড়াবাড়ি নেই।

শোনা যায়, খবরের কাগজ জনমতের আয়না। অর্থাৎ লোকে যা চায়, যা ভাবে খবরের কাগজ তাই প্রকাশ করে, সমর্থন করে। এক কথায়, খবরের কাগজ জনসাধারণের ভৃত্য। এক সময়ে কথাটী সত্যি ছিল বৈকি। সে অনেকদিন আগের কথা। যখন কাগজ বার হ'ত ব্যবসার খাতিরে নয়, জনস্বার্থের খাতিরেই। তখনকার দিনে কাগজ বার করা বা চালানো দস্তুরমত বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। লাভ তো ছিলই না, উপরন্তু সরকারী হুমকী, কারাবাস, নির্ব্বাসন সবই খবরের কাগজের সম্পাদক, প্রকাশক এবং মালিকের পাওনা ছিল। আমাদের দেশের প্রথম যুগের ইংরেজী কাগজের মালিক হিকির সঙ্গে হেষ্টিংসের লড়াইটা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যাপার। তেমনি বাকিংহাম নামে আর একজন খবরের কাগজ ব্যবসায়ীকেও এদেশে নানা দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল। গণতন্ত্রের প্রথম যুগে খবরের কাগজের এই রকম দুর্গতি। কেবল এই দেশে নয়, সব দেশেই। সব দেশেই সরকারের সঙ্গে খবরের কাগজের লড়াই ছিল জনমতের লড়াই। আমরা ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের কথাই প্রধানতঃ বলছি। এই দুই দেশে খবরের কাগজ এক সময়ে ছিল ষোল আনাই জনমতের বাহক। ব্যবসায়ের জন্য নয়, মুনাফার

জন্য নয়, স্বাধীন মত প্রকাশ ও প্রচার করাই ছিল তখনকার কাগজের উদ্দেশ্য। ওদেশে যেমন মর্লি, সি, পি, স্কট, ষ্টেড, ডেলানী, স্পেণ্ডর, জার্ভিন—সব বড় বড় নির্ভীক স্পষ্টবাদী সম্পাদক, যাঁরা নানা দুরবস্থার সঙ্গে লড়াই করে কাগজ চালিয়েছেন। তেমনি আমাদেরও জাতীয় সংবাদপত্রে প্রথম প্রাণ সঞ্চার করেন তিলক, ফিরোজশা মেটা, অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, চিত্তরঞ্জন এবং আরো অনেক দেশপ্রেমিক। এঁরা কেউই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কাগজ বার করেন নি, ব্যবসাদারী স্বার্থের তোয়াক্কা করেন নি।

কাগজ সম্রাট

খবরের কাগজের সেই যুগ আর নাই। এখন হচ্ছে মালিকের কাগজ, মালিকের মতই জনমত। অথবা মালিক জনমতকে যে পথে চালাতে চান, তাঁর কাগজও তেমনি ভাবে খবর ছাপে, ভাঙ্গে, গড়ে, চাপা দেয়, মন্তব্য করে। সম্পাদকেরও অবস্থাও আজ পাঁচ রকম ব্যবসায়ের মনিবের চাকরের মতন। কেন এমন হল তার কারণ খুঁজে বার করা কষ্টকর নয়। এখন খবরের কাগজ লাভজনক ব্যবসায় তো বটেই, উপরন্তু মালিকদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতেও খবরের কাগজের ক্ষমতা অসীম। জনসাধারণ বলতে আমরা যাদের বুঝি, খবরের কাগজ বার করা বা চালানো তাদের আর্থিক ক্ষমতার বাইরে। ফ্রান্সে মজুরেরা নিজেদের যৎসামান্য চাঁদা সংগ্রহ করে একখানা কাগজ বার করেছিল—লিউম্যানিটে, তাঁদের সম্বল ঐ কাগজখানা এবং আরো ছোটখাট দু চার খানা।

ইংলণ্ডের কম্যুনিস্টরা সমবায়ের ভিত্তিতে ডেইলী ওয়ার্কার চালু করেছে। এই কাগজ কোন মালিকের নয়, সমবায়ের নিয়মমত সব অংশীদারই সমানভাবে এই কাগজ পরিচালনা ব্যাপারে অধিকারী। এইরকম যেসব দেশে মজুর আন্দোলন শক্তিশালী, সোশালিস্ট, কম্যুনিস্ট দলের প্রতিপত্তি আছে, সেই সব দেশে জনস্বার্থের সমর্থনে ২।৪ খানা কাগজ বার হয়েছে, যেমন এদেশে চলছে স্বাধীনতা ও প্রজাশক্তি। তবে এদের প্রচারই বা কত হতে পারে? ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, জমিদারী ইত্যাদির মালিক যারা তাদেরই অর্থবল বেশী। কাজেই তারা এবং তাদের সম্পাদকেরাই বেশীরভাগ কাগজের মালিক। একমাত্র সোভিয়েট দেশেই সমস্ত কাগজ জনসাধারণের হাতে। মজুরসংঘ, কম্যুনিস্ট দল, শিল্পীসংঘ এমনতর বিভিন্ন সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি কাগজ পরিচালনা করতে অধিকারী। আপাততঃ সাম্যবাদী দেশকে বাদ দেওয়া যাক, আমরা যেরকম ব্যবস্থার অধীনে আছি সেখানে জনমতের বা খবরের কাগজের অবস্থাটা কি?

প্রথমেই দেখা যাক গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকার অবস্থাটা কিরকম। যেসব কাগজ মালিকের হুকুমে জনসাধারণকে নিক্তিমাপা ওজনে চামচ করে খবর পরিবেশন করছে তারা নিশ্চয়ই জনসাধারণের ভৃত্য নয়। তারা হচ্ছে কাগজ সম্রাটদের প্রচার যন্ত্র। ছয়জন কোটীপতি কাগজ

সম্রাট সারা আমেরিকা বেঁধে রেখেছে তাদের খবরের কাগজের শিকল দিয়ে। আর এই ছয়জনের মতামত অনুসন্ধান করে দেখা গিয়াছে যে এরা প্রত্যেকেই গণতন্ত্রের শত্রু, ফ্যাসিবাদের সমর্থক, মজুর আন্দোলনের ঘোরতর বিরোধী। এদের কাগজগুলিও ঠিক মনিবদের ছাঁচে ঢালা। আবার শুধু খবরের কাগজের একচেটিয়া মালেকানা নিয়েই ব্যাপারটা শেষ হচ্ছে না। কাগজগুলি বেশীর ভাগ খরচের জন্য নির্ভর করে সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের উপর। একে বলে নিউজ এজেন্সী— যেমন রয়টার, য়্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ আমেরিকা, ইউনাইটেড প্রেস অফ আমেরিকা ইত্যাদি। এই য়্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ আমেরিকা একটা বিরাট মালেকানা ব্যবসায়, এর আয় হচ্ছে বছরে তিনকোটী টাকা। এর হাতের মুঠোর মধ্যে আছে ১১২৪ খানা কাগজ। প্রায় সবগুলি খবর-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানই এমনিভাবে মুনাফার উদ্দেশ্যে গঠিত; এরা মুনাফার জন্য খবর ভাঙে, গড়ে, চাপা দেয়। কি আমেরিকা, কি এদেশে সর্বত্রই খবর সরবরাহের কর্তা এরা এবং এদের অনুচরেরা।

যুদ্ধের আগে ফ্রান্সে ছিল ২৫ খানা দৈনিক কাগজ, তার মধ্যে চারখানা বড় বড় শিল্পপতিদের হাতে, আর দশখানা ফ্রান্সের হর্তাকর্তা দুইশত পরিবারের হাতে। কথায় শুনি যে ইংলণ্ডে স্বাধীন মত প্রচারের খুব সুবিধা। খুব সুবিধা বটে, যদি পকেটে প্রচুর টাকা থাকে অথবা স্বাধীন মতটা বড় বড় কাগজের মালিকের মনের মত হয়। একখানা দৈনিক কাগজ বার করতে আমেরিকায় লাগে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা, ইংলণ্ডে নিশ্চয়ই পাঁচ লক্ষের কম নয়, ভারতবর্ষে খুব সাদাসিধা ভাবে কাগজ বার করতে পঞ্চাশ হাজার টাকা অবশ্যই দরকার। এখন ইংলণ্ডে খবরের কাগজের স্বাধীনতাটা কি রকম দেখা যাক। স্বাধীনতাটা সাধারণের জন্য কাগজ-পত্রে। আসলে ভোগ করছেন জনকয়েক লর্ড ধরনের লোক এবং শিল্পপতি। লর্ড কেমস্‌লি, ক্যামরোজ, বিভারব্রুক, য়্যাষ্টর, এইসব কাগজ সম্রাটেরা লণ্ডন এবং মফঃস্বলের কাগজগুলির মালিক। অর্থাৎ এরাই জনসাধারণকে খবর জানাবার অথবা না জানাবার মালিক।

ভারতবর্ষে অবস্থাটা এখনো এত সঙ্গীন হয়নি বটে। কিন্তু খবরের কাগজের উপর আমাদের কোটীপতি শিল্পপতিদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছে। বিড়লা, ডালমিয়া, গোয়েঙ্কা এঁরা কাগজকে ঠিক মুনাফার ব্যবসায় হিসাবে নিচ্ছেন না। এঁরা বড় বড় কাগজ দখল করে নিচ্ছেন, জনমতকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখবার জন্য। এদেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম। বই পড়ে জ্ঞান সঞ্চয় করার মত উৎসাহ, অভ্যাস এবং অর্থসঞ্চয় আরো কম। কাজেই খবরের কাগজই এদেশে জনশিক্ষার বাহন। সেই বাহন কোটীপতি ব্যবসায়ীদের হাতে থাকলে তাঁরা নিশ্চিন্ত মনেই মুনাফা-লুটের রাজত্ব চালাতে পারবেন। দিল্লী, এলাহাবাদ, পাটনা, কটক সব বড় বড় কেন্দ্রের প্রধান কাগজগুলি আজ বিড়লা ও বিড়লা অনুচরদের হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছে। ডালমিয়া এবং গোয়েঙ্কাও অমনিভাবে কাগজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছেন। ফলে হবে কলে ছাঁটা চালের মত বিড়লা-ডালমিয়া-

গোয়েঙ্কা প্রভুদের কলে-ছাঁটা খবর জনসাধারণের খোরাক। পণ্ডিত নেহেরু আক্ষেপ করে বলেছেন, আমাদের দেশে গ্রামেই বাস করে অধিকাংশ লোক, অথচ আমাদের কাগজগুলিতে গ্রামের দুঃখ-দুর্দ্দশার খবর সামান্যই থাকে। পণ্ডিতজী আক্ষেপ করেছেন মাত্র, প্রতিকারের কোন পরামর্শ দেননি। মালিক-মহাপ্রভুদের কাগজগুলি মুনাফা ও মালেকানা স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই চলতে বাধ্য। জনমত জনসাধারণের স্বার্থ এইসব নিয়ে নিতান্ত প্রয়োজনের বেশী মাথা ঘামানো আমাদের জাতীয় সংবাদপত্রগুলির কাজ নয়। চার্চিলের বিরুদ্ধে গরম গরম বুলি আমাদের কাগজে রোজ মেলে, কিন্তু কাপড়ের বাজারে মুনাফা শিকারীদের কীর্ত্তি কাহিনী আমাদের কাগজে কতটুকু বার হয় ? অবস্থাটা এই যে খবরের কাগজে লিখেছে এই কথা মাত্রই আমাদের অনেকের বিশ্বাস জন্মায়। কার কাগজ লিখেছে, কেন লিখেছে ওসব প্রশ্ন নিয়ে আমরা বড় একটা ব্যস্ত হই না। খবরের কাগজে কি লেখেনি, বা লেখে না এবং কেন লেখে না তারও সন্ধান আমরা নিই না।

মিথ্যার বেসাতি

খবরের কাগজ কি লেখে এবং কি লেখে না ; কোন খবর ছাপে এবং কোন খবর ছাপে না—এইসব প্রশ্নের উত্তর পেতেই হবে। কাগজ সম্রাট নর্থ ক্লিফ নির্লজ্জভাবেই বলেছিলেন, খবরের কাগজের ক্ষমতা হচ্ছে খবর চাপা দেওয়ার কারসাজীতে (the power of the prees is to sup-press)। আর একজন রসিক ব্যক্তি বলেছিলেন খবরের কাগজের কাজ হচ্ছে লোক-ভুলানো, লোক ঠকানো এবং লোককে আমোদ দেওয়া। সব কাগজই অবশ্য এই রকম মিথ্যার বেসাতি নয়। কাগজ-সম্রাট ও তার পুঁজিপতি মুরুব্বীদের স্বার্থেই খবরের কাগজ চলে। সেই স্বার্থ অনুসারেই ঠিক হয়, কতটুকু খাঁটী খবর এবং কতখানি ভেজাল দেওয়া হবে। লোক ঠকানোর একটা কায়দা হচ্ছে খবরের হেড লাইন—অর্থাৎ খবরের উপরে বড় বড় অক্ষরে যে শিরোনামা থাকে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে অধিকাংশ পাঠকই হেডলাইন পড়ে খবর সম্বন্ধে ধারণা করেন। যেমন ধর্ম্মঘটের খবরের শিরোনামা হল—মিলে ধর্ম্ম-ঘটের ফলে প্রচুর লোকসান। অমনি ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে ন্যায় অন্যায়ের বিচার চাপা পড়ল, লোকসানের কথাটাই মনে গাঁথা রইল। মালিকদের কাগজগুলিতে হেড লাইনকে মতলব মত সাজানো হয়। তাতে মালিকদের খুসীমত পাঠকদের মনে ভাল মন্দ ধারনা সৃষ্টি করা যায়। রাজনৈতিক দলাদলির উদ্দেশ্যেও হেড লাইন খুবই কাজে লাগে। রোজ যদি পাঠকেরা হেড লাইন পড়েন "মুসলীম লীগ গুণ্ডামী" বা "বর্ণ হিন্দুর আধিপত্য" অথবা "ব্রিটিশের দালাল কমুনিষ্ট" তা হলে বারবার পুনরুক্তিতে পাঠকদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হওয়া স্বাভাবিক। খবরের কাগজে লিখেছে যে! গোয়েবেল্‌শের কাগজে দিনের পর দিন ইহুদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা এইভাবে বড় বড় হরফে ছাপা হ'ত। গোয়েবেল্‌সী নীতি হচ্ছে মিথ্যা যত আজগুবি হয় এবং

যত জোরের সঙ্গে প্রচার করা যায়, সাধারণকে বিশ্বাস করানো ততই সোজা হয়। গোয়েবেলসী কায়দার কিছু কিছু নমুনা এদেশের কাগজেও দেখা গিয়েছে—দেশপ্রিয় পার্কের হাঙ্গামা, কালীঘাট বোমা রহস্য এবং এমনতর আরো অনেক ব্যপারে। সাধারণ পাঠকের মনে মালিকমহাপ্রভুদের বক-ধর্ম্মী কাগজের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। কাজেই মন-গড়া খবর ধারালো হেডলাইন সাধারণ পাঠকের মনে সহজেই দাগ কেটে যায়। খুব সাবধানী পাঠকও ধরে নেন সবটা সত্য না হলেও কিছুটা সত্য নিশ্চয়ই। নতুবা কাগজে বারবার লিখছে কেন?

হার্ষ্টের ১৮ খানা কাগজ সারা আমেরিকায় এইভাবে সমস্ত রকম প্রগতিবাদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়ায়। হার্ষ্ট নিউইয়র্কের অফিসে বসে টেলিগ্রাফের কল টেপেন, সারা আমেরিকায় তাঁর কাগজগুলিতে একরকম হেডলাইন, এক ছাঁচে ঢালা খবর বার হয়। লর্ড কেমস্‌লির লণ্ডন ও মফঃস্বলের কাগজগুলিও এই রকম কলে ছাঁটাই। এদেশে বিড়লার কাগজগুলি এই কায়দা অনুসরণ করছে।

সোভিয়েটের কুৎসা একসময়ে লণ্ডন সহরে টাইম্‌স্ অফিসের ঘরে বসেই তৈরী হ'ত, পরে ঐ খবরগুলি চালানো হ'ত খাস রুশিয়া থেকে আমদানী টাট্‌কা খবর বলে। ইরাণের ব্যাপারে এইরকম চটকদার রূপকথা মালিকদের "স্বাধীন" সংবাদপত্রে বার হতে দেখা গিয়েছে। একদিন খবর বার হচ্ছে সোভিয়েটের সৈন্য উত্তরে দক্ষিণে সারা ইরাণে ঘোড়দৌড় করছে, পরদিনই টেহেরাণ থেকে তার প্রতিবাদ বার হয়েছে। আমেরিকার একজন স্পষ্টবাদী সাংবাদিক বলেছেন মালিকদের স্বার্থে মিথ্যা, অর্দ্ধসত্য এবং আজগুবী খবর প্রচারে নিউইয়র্ক টাইম্‌সের জুড়ি নাই। এই কাগজখানি ১৯১৭ সন থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত প্রায় দুইশত বার ভবিষ্যতবাণী করেছে যে সোভিয়েট রাশিয়ার মরণ কাল ঘনিয়ে এসেছে। যেখানেই খবরের কাগজ বড় বড় শিল্পপতি পুঁজিপতির সম্পত্তি সেখানেই খববের এই দুর্গতি। এখনকার খবরেব কাগজের স্বাধীনতা হচ্ছে খবরের কাগজ সম্রাটদের স্বাধীনতা, অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতা। মালিকেরা স্বভাবতঃই সোভিয়েট রাশিয়া, সাম্যবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে খাপ্‌পা। কাজেই সোভিয়েট এবং দুনিয়ার সাম্যবাদীদলগুলি সম্বন্ধেই খবরের জুয়াচুরী চলে সব চাইতে বেশী। জমিদারীর অত্যাচার মালিক মহাজনের মুনাফালুটের কলঙ্কময় কাহিনী আমাদের দেশের কয়খানি কাগজে কতটুকু জায়গা পায়? কাগজ সম্রাট ও তাদের মুরুব্বীদের মরজী যতটুকু। মালিক মহাজন পুঁজিবাদি দেশের কর্ত্তাব্যক্তি, সেইসব দেশে খবর হচ্ছে কেনাবেচার সামগ্রী জনমতের স্বাধীনতা মালিকের স্বাধীনতা। নেতাদের প্রতিপত্তিও খবরের কাগজের উপর নির্ভর। তারা যতক্ষণ মালিক মহাজনদের স্বার্থের বিরুদ্ধে সোজাসুজি ভাবে না দাঁড়াচ্ছেন, ততক্ষণ কাগজসম্রাটেরা নেতাদের প্রসার প্রতিপত্তি বজায় রাখবে। যেখানে জনসাধারণের স্বার্থের

সঙ্গে মালিকানা স্বার্থের প্রত্যক্ষ বিরোধ সেখানে কাগজ সম্রাটদের কাগজে খবর ভাঙ্গা গড়া চাপা দেওয়া হবেই। লণ্ডনের একজন স্পষ্টবাদী সাংবাদিক সম্প্রতি লিখেছেন বাজারে সাম্যবাদ ও সোভিয়েটবিরোধী লেখা এবং খবর চড়া দামে বিক্রী হয়েছে। কারণ ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদীরা এখন চায় সোভিয়েট সম্পর্কে জনসাধারণের মনে বিরুদ্ধ ভাব সৃষ্টি করতে।

মুনফাশিকারীর কাছে সত্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম কিছুই নয়। বিলাতের লর্ড ঘরানাদের কাগজগুলি হিট্‌লার মুসোলিনীর কম স্তবস্তুতি করেনি। যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সের বেশীর ভাগ কাগজ সরকার অথবা ফ্যাসিবাদীদের কাছ থেকে ঘুঁষ নিত। দেশরক্ষার যুদ্ধে ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়ের কারণও এই একটী। খবরের কাগজ অবশ্য সোজাসুজি ঘুঁষ সব সময় নেয় না। তবুও মুনাফা-শিকারী বড় বড় কাগজের মুখ সব দেশেই অন্যভাবে সোনার শিকলে বাঁধা। সেই শিকল হচ্ছে বিজ্ঞাপন।

সোনার শিকল

কত তেল, ওযুধ, সাবান, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্সের বিজ্ঞাপনই না দেখি আমরা খবরের কাগজে রোজ। সবই কি বিশ্বাস করি? সেটা অবশ্য ঠিক নয়। তবুও দিনের পর দিন যদি চটকদার বিজ্ঞাপনগুলি চোখের উপর ধরা থাকে, তবে কিছুটা বিশ্বাস নিজের অজ্ঞাতেই যেন মনের মধ্যে বাসা বাঁধে।

রোজ বড় বড় হরফে পাঁচখানা কাগজে যদি ছাপা হয়, অমুক ওষুধ খাও, শরীর ভাল হবে, অমুক তেল মাখলে চুল ঘন হবে, অমুক টুথপেষ্ট বীজানুনাশক ইত্যাদি তাহলে অবিশ্বাস করা শক্ত হয় বৈকি। খবরের কাগজওয়ালারা অবশ্য বিজ্ঞাপন ছাপবার আগে ওষুধ খেয়ে দেখে নি, তেলও মাখে নি, টুথপেষ্ট কেমন তাও পরীক্ষা করে নি। বিজ্ঞাপনের মাপ অনুযায়ী টাকা নিয়েছে, বিজ্ঞাপন ছেপেছে এই মাত্র। খবরের কাগজের খবর অনেক, বিজ্ঞাপনের আয় ছাড়া খবরের কাগজ চালানো শক্ত। কাজেই খবরের কাগজের পড়ুয়াকে খবর ছাড়াও অতিরিক্ত অনেক কিছু পড়তে হয়। বিজ্ঞাপন পড়ার জন্য আমাদের দণ্ড দিতে হয় অনেক রকম। প্রথমতঃ ছাপার অক্ষরে যা বার হয় তাকে একদম অবিশ্বাস করা শক্ত হয়। কাজেই বিজ্ঞাপন দেখে আমরা কখনো কখনো জিনিষপত্র, ওষুধ ইত্যাদি কিনি এবং অনেক সময়ে ঠকি। আমেরিকার কথাই বলি, কারণ ওই দেশ হচ্ছে বিজ্ঞাপনের রাজা। আমেরিকার একটা সরকারী দপ্তর হিসাব করে দেখিয়েছে যে মিথ্যা বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলে প্রতিবৎসরে আমেরিকার জনসাধারণ দণ্ড দেয় প্রায় দেড়শ কোটী টাকা। পচা খাবার, বাজে ওষুধ, সিগারেট, তেল, টুথপেষ্টের জন্যই দণ্ড দিতে হয় বেশী। এমন কি ফোর্ড, ক্রাইস্‌লার, জেনারেল মোটর প্রভৃতি বড় বড় মোটর গাড়ীর কোম্পানীকেও মিথ্যা বিজ্ঞাপনের জন্য দায়ী করা হয়েছে।

প্রশ্ন হবে, কেন এর কি কোন প্রতিকার হয় না? আমেরিকা তো গণতন্ত্রের দেশ, সকলের ভোট আছে, সকলেরই প্রতিনিধি তো সেখানকার সরকারী শাসন ব্যবস্থা চালায়। এইসব জাল বিজ্ঞাপন বন্ধ হয় না কেন তবে? এর জন্য চেষ্টা অবশ্য হয় মাঝে মাঝে। তবে যারা বিজ্ঞাপন দেয় তারা হচ্ছে বড় বড় ব্যবসায়ের মালিক, কোটীপতি; তাদেরই দলের লোকে সব আইন সভা ভরতি। খবরের কাগজ সব তাদেরই হাতের মুঠোয়, কারণ তারা দেয় বিজ্ঞাপনের জন্য মোটা টাকা, তাদের হাতেই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়; প্রশ্ন হবে, সে কী, খবরের কাগজ নাকি শুনি জনসাধারণের ভৃত্য, জনমতের বাহন। ঐ রকম একটা কথা চলতি আছে বটে। খবরের কাগজ জনসাধারণের মন কতকটা যোগায় সত্যি। কিন্তু তারও আগে তাকে খুসী রাখতে হয় বিজ্ঞাপনদাতা বড় বড় ব্যবসাদারকে। তা ছাড়া খবরের কাগজের মালিকেরাও বড় ব্যবসাদার। সব মালিকেরই অবশ্য ব্যবসাদারী বুদ্ধি সমান নয়। আমেরিকায় যেমন, একখানি কাগজ (P. M.) আছে, যা বিজ্ঞাপন একটিও নেয় না। এর মালিক একটু খামখেয়ালী দরাজ ভাবের লোক, তার নিজের আর দু খানা কাগজের লাভ থেকে এই একখানার লোকসান তিনি পুষিয়ে নেন। আবার আমেরিকাতেই আর একখানা কাগজ আছে যাতে মদ, অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদির বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। কিন্তু দুই একখানা কাগজের সুবুদ্ধিতে কি হবে? যদি আমেরিকার সব দৈনিক কাগজের মোট প্রচার সংখ্যা প্রতিদিন সাড়ে চারকোটী হয় তবে তার মধ্যে সাড়ে তিন কোটীর বেশী কাগজেই বিজ্ঞাপন ছাপে। ১৯২৯ সালের হিসাব দিচ্ছি। এই হিসাবেও মোট বিজ্ঞাপনের আয় জানা যায় না। কেবল ইলেক্‌ট্রিক আর মোটর কোম্পানীগুলিই এই বছরে খবরের কাগজওয়ালাদের দক্ষিণা দিয়েছিল সাড়ে সাত কোটী টাকা। মোট বিজ্ঞাপনের আয় নিশ্চয়ই আরো অনেক গুণ বেশী।

ফল হচ্ছে এই যে খবরের কাগজ এমন কিছু লিখতে সাহস করে না যাতে বড় বড় ব্যবসার মালিকদের ক্ষতি হয়। এবং এমন অনেক কিছু লেখে যা বড় বড় মালিক পুঁজিপতিদের স্বার্থের জন্য দরকার কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর। যদি জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে বড় বড় মালিকদের স্বার্থের বিরোধ দেখা দেয়, তবে বেশীর ভাগ কাগজই যায় বড় বড় মালিকদের দিকে। একটা উদাহরণ দিই, আমেরিকার বড় বড় কারখানার মালিকদের একটা সমিতি আছে, আমাদের দেশেও আছে। আমেরিকার এই কারখানা মালিকদের সমিতির বিরুদ্ধে আইন সভায় একজন সদস্য খুব বড় রকম নালিশ করেন। আমেরিকার কোন কাগজই এই খবর ছাপেনি, এক কম্যুনিস্টদের ডেইলী ওয়ার্কার ছাড়া। প্রশ্ন হবে, তবে যে শোনা যায় কোন খবর চাপা দেওয়া বা মিথ্যা করে সাজানো খবরের কাগজের নীতিবিরুদ্ধ? ঐ রকম একটা কথা চলতি আছে বটে। কাজে কিন্তু সেটা মানা হয় খুবই কম। আমরা সেটা আগেই দেখিয়েছি। আসলে

যেমন খবরের কাগজ জনসাধারণের ভৃত্য নয়, জনমতের বাহনও নয়, তেমনি খবর নিয়ে লুকাচুরি খেলাটিও ব্যবসাদারেরা খারাপ মনে করে না।

ঐ যে আমেরিকার কারখানা মালিক সমিতির কথা বলেছি, ওরা কি করছে দেখা যাক। ওরা জানে যে সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ এসব জনসাধারণের পক্ষে ভাল হলেও, ওদের ব্যবসা মুনাফা শিকার এ সবের পক্ষে ভাল নয়। তাই ওদের ধুয়া হচ্ছে "স্বাধীন আমেরিকায় স্বাধীন ব্যবসা"। স্বাধীন ব্যবসা মানে অবশ্য ওদের একচেটিয়া ব্যবসা যাতে সরকারও যেন হাত না দেয়। জনসাধারণের চাপে সরকার চায় জিনিষ পত্রের দাম 'কণ্ট্রোল' হোক। অমনি কারখানা মালিক সমিতি বড় বড় কাগজের মারফৎ হৈ চৈ তুললো, কণ্ট্রোল মানে স্বাধীনতা নষ্ট, আর স্বাধীনতা নষ্ট মানে সর্ব্বনাশ। খবরের কাগজ গুলি এই বাবদ বিজ্ঞাপনের দক্ষিণা পেল একশো কোটী টাকা। জিনিস পত্রের দাম কণ্ট্রোল বন্ধ করার জন্য মালিকেরা বিজ্ঞাপনের বন্যা এনে দিল ৪৫০ দৈনিকে, ১৫০ সাপ্তাহিকে। এর থেকেই বোঝা যাবে টাটা-বিড়লা-ডালমিয়া-গোয়েঙ্কাদের হাত কেন আজ খবরের কাগজের ব্যবসায়ের দিকে এগুচ্ছে।

বিজ্ঞাপন ছাড়াও আরো মারাত্মক কৌশল বার হয়েছে জনসাধারণকে ঠকানোর জন্য। সেটী হচ্ছে পয়সা দিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপানো। এই কৌশলও আমেরিকাতে চালানো হচ্ছে এবং এদেশেও দেখা দিয়েছে। আমেরিকার শিল্পপতিরা এই বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে। একজন স্পষ্টবাদী আমেরিকান সাংবাদিক দুঃখ করে বলেছেন, "এই কি খবরের কাগজের স্বাধীনতা না গোলামী ?" ভারতবর্ষের কোটীপতিরাও এই গোলামী ব্যবস্থা চালু করতে এগিয়েছেন। তবে কি অবস্থাটা আমাদের হবে এই যে সকালে উঠে বিড়লার মাখন ও ইসপাহানীর চা খেয়ে বিড়লা বার্ত্তাবহ থেকে "স্বাধীন" সংবাদ ও মত সংগ্রহ করে বিড়লা মিলের ধুতিপরে বিড়লার অফিসে, কারখানায় দিনমজুরী ? এই অবস্থাটা নিশ্চয়ই কোন রকম স্বাধীনতার পক্ষেই সুবিধাজনক নয়। খবরের কাগজ পড়ুয়াদের তাই ভুললে চল্‌বে না মালিক মহাজন মুরুব্বীদের কাগজ যা লেখে তা সবই সত্য নয়। আর যা সত্য তা সবই লেখা হয় না।

জর্জ বার্ণার্ড শ' সেইজন্য বলেছেন, এমন কাগজ চাই যা ভদ্র সমাজকে সাহস করে বলতে পারে যে তাদের সমাজ খাড়া রয়েছে নিঃস্ব জনসাধারণের উপর ডাকাতি করে, খুন করে। আমাদের কাগজগুলির কি সেই সাহস আছে—যে সব কাগজের মুখ মালিকের স্বার্থে বাঁধা, যে সব কাগজের একমাত্র গুণ হল মুরুব্বী নেতাদের চাটুবিদ্যা ?

সরোজ আচার্য্য



ওয়াহাবী আন্দোলন

আঠারো শতকের শেষ পর্ব। দিল্লীর বাদশাহের গৌরব মলিন হয়ে এসেছে। সাম্রাজ্যের শক্তি বহুদিন থেকেই নিঃশেষ হয়ে আসছিল। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তত দিনে ভারতবর্ষে নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলছে। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ও আর্যাবর্তে যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল তাদের প্রায় সকলেই এই নবাগত শক্তির আঘাতে আঘাতে মূর্ছিত হয়ে পড়্‌ল—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের অন্তে তাকে বাধা দেবার মত তেমন কোনো দেশীয় রাজ্য অবশিষ্ট রইল না। নবলব্ধ শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে সওদাগর এদেশে রাজা হয়ে বসল। ভারতবাসীর পক্ষে সে কাহিনী বেদনাময়, মর্মান্তিক।

ইংরেজ রাজা হল। কিন্তু ভারতবাসী এই নব দাসত্বকে কখনো নির্বিচারে মেনে নেয় নি। যখনই সুযোগ এসেছে তখনই প্রাণপণ শক্তিতে বিদ্রোহ করেছে। বিদ্রোহ দমিত হয়েছে রক্তাক্ত নিষ্ঠুরতায়—লোহার শিকল ভাঙ্গে নি—কিন্তু বিদ্রোহীরা মরেও নি। আঘাতে প্রতিঘাতে নব নব শক্তি সঞ্চয় করেছে। এই ইংরাজ বিরোধী বিদ্রোহের ধ্বজা প্রথম উড়িয়েছিলেন—তাকে সংগঠিত, পরিচালিত করেছিলেন—ভারতীয় মুসলমানেরাই। এই গৌরব তাঁদেরই প্রাপ্য। এর কারণও ছিল। মুসলমান রাজশক্তির দুর্বল ও অশক্ত হাত থেকেই ত ইংরাজ কোম্পানী এদেশে রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করে নেয়। এ বিদ্রোহের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ও রূপ ওয়াহাবী বিদ্রোহ—আর বিদ্রোহের নেতা ছিলেন আবার তখনকার মুসলিম ভারতের আধ্যাত্মিক নায়কেরাই। এ বিদ্রোহের কাহিনী আমাদের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যতালিকায় বড় একটা শোনা যায় না—যা শুনি তারও অনেকাংশই বিকৃত মিথ্যা কিম্বা অর্ধ সত্য। তাই বোধ হয় আজ প্রয়োজন আছে আধুনিক ভারত ইতিহাসের এই বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়কে নতুন করে স্মরণ করবার—প্রয়োজন আছে বিগত দেড়শত বছরে ইংরেজ শাসনের অভিজ্ঞতার আলোতে তার অন্তর্নিহিত রূপ-সত্যকে দেখে নেবার। তাহলেই বুঝ্‌তে পারব ভারতে ইংরেজ-শক্তির সত্যিকার ভূমিকা—চিনতে পারব তার রাষ্ট্রনীতির মূল সত্য।

উল্লেখ করা হয়েছে ওয়াহাবী বিদ্রোহের সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মুসলমান ভারতের আধ্যাত্মিক নায়ক। রাষ্ট্রক্ষমতা হারাবার বেদনাকে সহজে ভুলতে

ওঁরা প্রস্তুত ছিলেন না, একথাও বলা হয়েছে। এ রাজনৈতিক পরাজয় ও পতনের কারণ খোঁজা হল ধর্ম-বিচ্যুতির মধ্যে। মুসলমান সমাজকে তাই প্রাচীন ইসলাম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা চলল। ভারতবর্ষে নতুন এক ইস্‌লাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল বোধ হয় ওয়াহাবী বিদ্রোহের আদর্শগত পটভূমিকা—অন্ততঃপক্ষে নেতাদের স্বপ্ন তাই ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহ···বঙ্কিমের আনন্দমঠের প্রেরণা উৎস—যা বাংলার প্রথম অগ্নিযুগের বীর যোদ্ধাগণকে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সংগে ওয়াহাবী আন্দোলনের তুলনা করা চলে। সংগে সংগে এটাও স্মরণীয় যে ওয়াহাবী বিদ্রোহের সামাজিক রূপ বিচার এবং ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণের এটাই শেষ কথা নয়—শেষ কথা নয় এই কারণে যে এর মূলে সর্বাংশেই ধর্মের গোড়ামি ছিল না। বস্তুতঃ সমসাময়িক মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা বিদ্রোহকে অনিবার্য করে তুলেছিল। বাংলাদেশ সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ করে সত্য।

ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রথম জন্ম বোধ হয় বাংলা দেশেই—এখান থেকেই তা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণে আন্দোলনের নেতৃত্বও প্রধানত বাংলা দেশ থেকেই আসে। এঁদের মধ্যে প্রথমই স্মরণীয় মৌলভী সারিয়াত্‌উল্লাহ্‌। তাঁকেই ওয়াহাবী আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক মনে করা চলে। তিনি ফরিদপুর জেলার বাহাদুরপুরের অধিবাসী কিন্তু তাঁর জীবনের বিশ-বৎসর আরব দেশেই কাটে। স্বদেশে ফিরে তিনি 'ফ্রেজী' নামে এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। সারিয়াত্‌উল্লাহ্‌র পর তাঁর পুত্র দাদু পিতার স্থানে অভিষিক্ত হলেন এবং বাহাদুর-পুরেই নিজের প্রধান কার্য দপ্তর স্থাপন করেন। এই স্থান থেকে কৃষক সমাজকে—ওঁরা প্রধানতই মুসলমান—রক্ষা ও তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য আন্দোলন চলাতে লাগলেন। বাহাদুরপুরের সীমানা ছাড়িয়ে এই গণ-জাগৃতি ক্রমশঃই সমগ্র ফরিদপুর, চব্বিশ পরগণা এবং নদীয়া জেলায় এক প্লাবনের সৃষ্টি করল। কলিকাতা ও তার পার্শ্বস্থ অঞ্চলের নায়ক ছিলেন তিতু মিয়া নামে এক রহস্যময় ব্যক্তি। প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ওয়াহাবীর বিদ্রোহের রোমাঞ্চকর কাহিনীর সংগে এই ব্যক্তির নাম ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর জীবন বৃত্তান্তও এই কারণে স্মরণীয়।

... . ১৮৩১ সাল। বাংলা দেশে ওয়াহাবী আন্দোলন তখন ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ নিয়েছে। চব্বিশ পরগণা, ফরিদপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলা এই বিদ্রোহের অগ্নিস্পর্শে চঞ্চল হয়ে উঠল। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র মানুষের মৃত্যুভয়হীন এই কঠিন সংগ্রামের শপথ তখন শাসন কর্তাদের স্নায়ু-গ্রন্থীতে নিদারুণ কম্পন জাগিয়েছে। এই বাধামুক্ত ঝড়ের মুখে বুঝি ইংরেজ শাসনের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বিদ্রোহ দমনের জন্য ১৪ই নভেম্বর কলকাতা থেকে এক সামরিক বাহিনী পাঠান হল। বিদ্রোহীদের দুর্বার আক্রমণের সামনে তারা দাঁড়াতে পারল না—ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। ১৭ই নভেম্বর আবার চেষ্টা হল—আবার বিদ্রোহীরা অসীম সাহসে রুখে দাঁড়াল। সরকারী বাহিনী নদীপথে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচল। যারা পারল না তাদের রক্তধারায় নদীর বুক লাল হয়ে গেল···

ভারতের ইতিহাসে এ কাহিনী অমর—আর অমর সেই বিদ্রোহীদের নায়কও। তিনিই তিতু মিয়া।

এক সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সন্তান—ছোট-খাট জমিদার কন্যার পাণি-গ্রহণের পুরস্কার স্বরূপ জীবনে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত—তিতু মিয়ার প্রথম পরিচয় এই। কিন্তু নিজের চরিত্রের দুর্ধর্ষতা তাকে ঘর-ছাড়া করল এবং এক পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে তিনি জীবিকা উপার্জন করতে লাগলেন। শোনা যায় সেই সময় এক গুপ্ত আড্ডায় জড়িত থাকার ফলে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তৎকালীন বাংলার ভদ্রশ্রেণী নিজেদের পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য এই সমস্ত 'আড্ডার' সাহায্য নিতেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিতু মিয়া মক্কা যাত্রা করেন। এই পবিত্র তীর্থ-স্থলেই সৈয়দ আহম্মদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। তিতু মিয়ার জীবনের এক নতুন পর্বের সূত্রপাত হল—সুরু হল তাঁর বিদ্রোহী জীবনের—আর জীবনের এই পর্বই ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রেখেছে।

তিতু মিয়ার মৃত্যু কাহিনী বেদনাময়। কিন্তু সে মৃত্যু—বীরের। ১৭ই নভেম্বরের পরাজয়ের স্মৃতি মুছতে না মুছতে সরকারী দপ্তর বিদ্রোহ দমনের নতুন আয়োজন করলেন। বিপুল সে আয়োজন। অজস্র সমর-সম্ভার সজ্জিত অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যের—এদের মধ্যে দেশীয় সিপাইও ছিল—এক বাহিনী কলকাতা থেকে যাত্রা করল। তারপর যুদ্ধ—প্রচণ্ড রক্তস্রাবী লড়াই এর মধ্যে বিদ্রোহীদের ভাগ্য-সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। তারা পিছু হটল। নিজেদের সুরক্ষিত আশ্রয়কেন্দ্রে আত্ম-গোপনের চেষ্টা করল। কিন্তু বিজয়ী সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণের ঘূর্ণিবাত্যা তাদের শেষ আশ্রয়কেন্দ্রও উড়িয়ে নিয়ে গেল! তিতু মিয়া প্রাণ হারালেন।

তিতু মিয়ার পতন ও মৃত্যু ওয়াহাবী আন্দোলনের এক বিশেষ পর্ব—এই কথা স্মরণ রাখা দরকার। সরকারী ফৌজের হাতে বিদ্রোহের এই শোচনীয় পরাজয়ের পর আন্দোলনের প্রধান ঘটনা-কেন্দ্র আর বাংলায় রইল না। পাটনা সদর দপ্তর তখন কর্মমুখর এইখান থেকে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন উলায়েত আলি এবং ইনায়েত আলির নেতৃত্বে নতুন শক্তি সঞ্চয় করেছে। এই বিখ্যাত আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের গুরু ছিলেন রায় বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ।

এই দুই নেতা বাংলা এবং সমগ্র দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করে "ঘৃণিত শত্রুর" বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। ইনায়েত আলি মালদহ, রাজসাহী, বগুড়া, নদীয়া ফরিদপুর এবং পাটনায় সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভুত করলেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় বাংলা দেশে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। যদি নরক যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাও তবে হয় বিজেতার বিরুদ্ধে প্রতিমুহূর্তে সংগ্রাম কর আর না হয় অভিশপ্ত দেশ থেকে পালিয়ে যাও—জেলায় জেলায় এমনি রাজদ্রোহমূলক প্রকাশ্য প্রচার চলল।

পাটনাকেন্দ্র ক্রমশঃই সমস্ত ভারতের ওয়হাবী আন্দোলনের প্রধান কার্যদপ্তর হয়ে দাঁড়াল। এই বিদ্রোহী দপ্তরকে এক প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের সামরিক ঘাটি বলে বর্ণনা করা চলে। তাদের নিজস্ব গুপ্ত বিচার কক্ষ পর্যন্ত ছিল। বাংলার বিভিন্ন জেলায়ও অনুরূপ গুপ্ত কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই সমস্ত কেন্দ্র পাটনার সদর দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত এবং প্রয়োজনীয় লোক ও টাকা সংগ্রহ করে পাঠাত। গঠন নৈপুন্যের দিক থেকে বাংলার কেন্দ্রগুলি বোধ হয় আদর্শ স্থানীয় ছিল। প্রতি গ্রামে খাজনা আদায়ের জন্য একজন করে কর্মচারী নিযুক্ত হত এবং জেলার ভারপ্রাপ্ত নেতা সংগৃহীত সমস্ত অর্থ পাটনায় পাঠাতেন।

ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রথম দিকে ইংরেজের পক্ষ থেকে সামান্য বাধাই আসে। অনেক সময় এমনকি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসের সামনেই প্রকাশ্যে রাজদ্রোহমূলক প্রচার চলতে দেখা গিয়েছিল। সরকারের এই নির্লিপ্ততার কারণও ছিল—আর তাও বিশেষ ভাবে লক্ষনীয়।

পশ্চিম-ভারতে তখন ওয়াহাবীরা শিখদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করছে। তাদের নেতা রায় বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ। তিনি ও তাঁর শিষ্যরা শিখদের দ্বারা সেখানকার মুসলমান সমাজের উপর অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। 'কাফের' শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সৈন্য ও অর্থ সংগৃহীত হল। মনে রাখা দরকার: ইংরেজ শক্তি তখন পর্যন্ত পাঞ্জাব বিজয় সম্পুর্ণ করতে পারেনি—শিখ ও ওয়াহাবিদের এই ভ্রাতৃবিরোধ ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারের এক পরম সুযোগ এনে দিল। বলা বাহুল্য তারা এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করতে ছাড়ে নি। বস্তুতঃ শিখদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের পরোক্ষভাবে সমর্থন করল। এমনি করে পাঞ্জাবের এই ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শিখদের বিরুদ্ধে এক 'ধর্ম যুদ্ধ'এর রূপ নিল। শিখ ও মুসলমানদের এই ভ্রাতৃ বিরোধের ফলে হল ইংরেজের সুবিধা।

ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে ওয়াহাবীরা সীমান্তে জড় হল। এই সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে সৈয়দ আহম্মদ বোলানের পথে আফ্‌গানিস্থানে প্রবেশ করলেন এবং সেখান থেকে খাইবার গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে পাঞ্জাব আক্রমণ করলেন। ১৮৩০ সালে পেশোয়ারের পতন হয়। কিন্তু নিজেদের অন্তর্বিরোধের জন্য বিদ্রোহীদের শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল—পেশোয়ার

অতি অল্প কালের মধ্যে তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে সীমান্ত প্রদেশের সোয়াত উপত্যকায় হটে এল এবং সেখান থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করতে লাগল। ইতিমধ্যে ইংরাজ সৈন্য সম্পূর্ণভাবে পাঞ্জাব জয় করে ফেলেছে। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহাবীদের সম্পর্কে তাদের মনোভাবও সম্পূর্ণ পালটিয়ে গেল। সাম্রাজ্যের দায়ে শিখদের বিরুদ্ধে যে শক্তিকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত তারা প্রশ্রয় দিয়েছিল এবার তাদের বিরুদ্ধেই পূর্ণশক্তিতে আঘাত হানল—আঘাত হানল নবলব্ধ সাম্রাজ্যের বনিয়াদকে সুদৃঢ় করবার জন্য। ডিভাইড্ এণ্ড রুল—রাষ্ট্রনীতির এই নির্মম শঠতায় সাম্প্রতিক ভারত-ইতিহাস কলঙ্কিত। ওয়াহাবীদের শক্তিকেন্দ্রগুলিকে নির্মূল করার জন্য ইংরেজ সমস্ত শক্তি নিয়োগ করল। এই শক্তি পরীক্ষায় বিদ্রোহীরা একটির পর একটি পরাজয় বরণ করে অবশেষে আত্মসমর্পণ করল। বিদ্রোহী নেতারা বন্দী হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক দুঃসাহসী বিদ্রোহ প্রচেষ্টা এমনিভাবে দুর্বার শক্তির আঘাতে নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল—বিদেশী দাসত্বের শেষ চিহ্ন নিজেদের রক্তে ধুয়ে ফেলবার জন্য ভারতে হিন্দুমুসলমান সম্মিলিত শক্তিতে আর একবার মৃত্যুপণ করে উঠে দাঁড়াল। ওয়াহাবীরা এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করল আর বিদ্রোহ দমনের পর এর জন্য পুরস্কারও পেল—অমানুষিক লাঞ্ছনার নিষ্ঠুর সে পুরস্কার।

কৃষ্ণপদ দত্ত

লেভেলার আন্দোলন

আজকাল রাজা রাজড়ার মাথা নেওয়া বা এক কথায় তাঁদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া একটা মামুলী ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে ক'বছর ধরে সারা দুনিয়াব্যাপী এত বড় একটা লড়াই হয়ে গেল, সেটা থামতে না থামতেই দেখা যাচ্ছে ঝড়ের মধ্যে পাকা আমের মত টুপ্‌টাপ্‌ সব রাজা মহারাজারা খসে পড়ছেন। তিনদিন আগেও তাঁদের অমিত প্রতাপের দাপটে সবাই জড়সড় হয়ে থাক্‌ত; কিন্তু দুদিন পরে তাঁদের আর কোনও পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না।

মাস কয়েক আগেকার কথা। সকলেরই মনে আছে। ইটালীর লোকেরা সবাই ভোট দিয়ে ঠিক করল যে, রাজাকে আমরা আর চাই না। আর, রূপকথার আজগুবী গল্পের মতো রাজা উম্বার্টো সাহেবকেও বাক্স পেঁট্‌রা গুছিয়ে রাণীর হাত ধরে মনের দুঃখে বনে চলে যেতে হল। যুগোশ্লোভিয়ার চাষী মজুররা তো ক্ষেপে উঠে বলল—ওসব রাজা টাজা এখানে আর চলবে না। রাজা পিটার আর কি করেন! লণ্ডনে আমাদের বৃটিশ সরকারের দেওয়া একটা বাড়ীতে বসে হুঙ্কার ছাড়লেন—এখানে বসেই আমি রাজত্ব চালাব। দেশের লোকে তো শুনে হেসেই অস্থির।

এই রকম ভাবে সারা ইউরোপে আজকাল এ ব্যাপারটা ডালভাতের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন কি আমাদের ভারতবর্ষের আমরাও কারও পিছনে পড়ে নেই। চার বছর আগেই আমরা আমাদের রাজা বৃটিশদের বলে দিয়েছি—"ভারত ছাড়"। ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ৪০ কোটি লোক এই ৪ বছরে পথে প্রান্তরে কল আর কারখানায় এককণ্ঠে আওয়াজ তুলেছে—"ভারত ছাড়।" এমন কি কাশ্মীরের লোকেরা পর্য্যন্ত সেখানকার বৃটিশ সিংহের পালিত মুষিক রাজকে নোটিশ জারী করেছে—কুইট্‌ কাশ্মীর।

এসব কাণ্ড তো আজকাল হামেশাই ঘটছে। কিন্তু ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে ৩০০ বছর আগেই ইংলণ্ডের লোকেরা এমনি এক রাজার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছিল। তারা শুধু তাকে চাইনা বলেনি—শেষ পর্য্যন্ত তাকে দেশের লোকের পয়লা নম্বরের শত্রু বলে তার প্রাণ নিয়ে তবে ঠাণ্ডা হয়েছিল।

প্রকাশ্য বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জানুয়ারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। সারা পৃথিবীতে রাজারা যখন নির্বিঘ্নে রাজত্ব চালাচ্ছেন তখন ইংলণ্ডের লোকেরা হঠাৎ ক্ষেপে উঠে তাঁর প্রাণ পর্য্যন্ত নিয়ে নিল কেন ?

ইংলণ্ডে তখন খুব গোলমাল চলছে। ব্যবসা বাণিজ্য সবে মাত্র সুরু হয়েছে। বড় বড় জমিদার বাড়ীর আঙিনা পেরিয়ে কিছু কিছু লোক ব্যবসাবাণিজ্য করে *নিজেরাই দুচার পয়সা* ঘরে আন্‌ছে। ব্যবসার সুবিধার জন্য তারা পুরানো নিয়মকানুনের পরিবর্ত্তন দাবী করল। বড় বড় জমিদাররা কিন্তু ব্যাপারটা সুনজরে নিলেন না। দশ বিশ হাজার বিঘার জমিদারীতে এতদিন তাঁরা মহাসুখেই ঘরসংসার চালাচ্ছিলেন। জমিদারীর এলাকায় গরীব গোলামদের উপর যখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য করে দুচার পয়সা হাতে পেয়ে তারা আর এখন তাঁকে মান্‌তে চায় না। তাই তাঁরাও দল বেঁধে এই নতুন স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন।

দেশের রাজা তখন সব চেয়ে বড় জমিদার। কাজে কাজেই তিনিও তাঁর সৈন্যসামন্ত পাইক বরকন্দাজ নিয়ে এসে এই সব গরীব গোলাম আর তাদের নেতাদের বললেন—খবরদার, ভগবানের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে বেশী চালাকি চল্‌বে না। বড় বড় দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক গির্জ্জার পাদ্রীরাও তাঁদের সঙ্গ নিলেন।

কিন্তু লোকে তা শুনবে কেন ? দেশের হালচাল তো বদলে গেছে। রাজা আর জমিদারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল। পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিরা এগিয়ে এসে রাজাকে বল্‌লেন—সময় বদলিয়েছে। সুতরাং তোমাকেও ক্ষমতা ছাড়তে হবে। রাজা বল্‌লেন—তা কখনো হয় না। এরা বল্ল—হতেই হবে। যুদ্ধ লেগে গেল। রাজা জমিদার আর তাঁদের ভাড়াটিয়া সৈন্যরা একদিকে। আর পার্লামেণ্টের নেতৃত্বে দেশের অগণিত গরীব গোলাম চাষী মজুর। ক্রমওয়েল, ফেয়ারফ্যাক্স প্রভৃতি নেতারা পার্লামেণ্টের সেনাবাহিনী পরিচালনা করে একটার পর একটা যুদ্ধে রাজাকে হারিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। রাজার ক্ষমতা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল। পার্লামেণ্টই দেশের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠ্‌ল।

পার্লামেণ্টের নেতারা তখন থম্‌কে দাঁড়ালেন। তাঁরা বল্‌লেন—রাজা তো গেলই। এখন আবার সুখের ঘর বাঁধা যাক। সাধারণ লোক কিন্তু তাতে রাজী হল না। তারা বলল—রাজা গেছে বটে, কিন্তু আমাদের দুঃখ তো যায় নি। পেটমোটা বড় বড় জমিদারদের ভারী বুটের নিচে পিষে পিষে তারা এতদিন মরার মত বেঁচে ছিল। রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা ক্ষমতা আর শক্তির আস্বাদ পেয়ে জেগে উঠেছে। নতুন চেতনা আর উদ্দীপনায় তাদের চোখমুখ তখন ঝলমল করছে। তাই তারা বলল—থামাথামি নয়।

এগিয়ে চলো।. দুঃখ কষ্ট আর নিপীড়নের অন্ধকারে এতদিন আমরা প্রতিটি মুহূর্ত গুণেছি। এবার মুক্তির আলো আমাদের চোখে লেগেছে। আমরা মুক্ত হব—দুঃখ দারিদ্র্য থেকে, জমিদার পাদ্রী আর রাজার শোষণ থেকে। আমাদের এই সুন্দর দেশকে আমরা স্বাধীন করব।

পার্লামেণ্টের নেতারা তা কিছুতেই হতে দেবেন না। রাজাকে সরিয়ে তাঁরা ক্ষমতা দখল করেছেন—গৃহ যুদ্ধের গোলমালের ভিতর অনেকে বেশ দু চার পয়সা কামিয়েও নিয়েছেন। সাধারণ লোকের দুঃখ কষ্টের দিকে তাঁরা চোখ বন্ধ করে থাক্‌লেন। সাধারণ লোক নেতাদের এই বিশ্বাসঘাতকতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌ল। প্রত্যেক দিন পার্লামেণ্টে হাজার হাজার আপীল আসতে লাগ্‌ল।

—আমরা ভেবেছিলাম যে তোমরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবে। কিন্তু তোমরা আমাদের উপর নতুন দাসত্ব আর শৃঙ্খল চাপিয়েছ। আমাদের জীবন সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম তোমাদের হাতে—তোমরা প্রতিদিন আমাদের হাজার হাজার ভাইকে হত্যা করছ। রাজাকে উচ্ছেদ করে তোমরাই এখন রাজা হয়েছ।

লিলবার্ণ, ওভারটন, ওয়ালউইন্—এঁরা তখন এই গরীব গোলাম সাধারণ লোকের নেতা হিসাবে দাঁড়িয়ে উঠেছেন। বজ্রদৃপ্ত কণ্ঠে এঁরা ঘোষণা করলেন—স্বাধীনতা সকলের জন্য। সুখ-সুবিধা সকলের জন্য। পার্লামেণ্ট যদি লোকের দুঃখ মোচন না করে—তাহলে লোকে পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধেই লড়াই চালাবে। লিলবার্ণ ওভারটনের নেতৃত্বে নতুন গণ-আন্দোলন জেগে উঠ্‌ল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এটাই লেভেলার্ আন্দোলন বলে খ্যাত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই আন্দোলনের ঢেউ সারা ইংলণ্ডে তোলপাড়ের সৃষ্টি করল। এমন কি সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও।

কিন্তু শাসকদের নীতি সকল সময়েই একই ধরণের—জেল, পুলিশ, লাঠি আর গুলি। ১৬৪৯ এ ২৬শে মার্চ্চ লিলবার্ণ, ওভারটন, ওয়ালউইনকে গ্রেপ্তার করে টাওয়ার অফ্ লণ্ডনে আটক করা হল। এর প্রতিবাদে সারা ইংলণ্ডে দারুণ হৈ চৈ পড়ে গেল। ২রা এপ্রিল প্রায় ৮০,০০০ লোক একটা গণদরখাস্তে তাঁদের মুক্তি দাবী করল। এপ্রিলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ হল। ক্রমওয়েল তাকে কঠোর হস্তে দমন করে বিদ্রোহীদের নেতা লক্‌ইয়ারকে প্রাণদণ্ড দিলেন। ২৯শে এপ্রিল লণ্ডনে তাঁর শব শোভাযাত্রায় যত লোক হয়েছিল, আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে সেরকম শোভাযাত্রা খুব কমই হয়েছে। সৈন্যদের বিদ্রোহ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল—বান্‌বেরী, স্যালসবেরী, বাকিংহাম্পশায়ার আর অক্সফোর্ড, ডার্বিশায়ার সমারশেট্‌শায়ারে।

১৪ই মে বারফোর্ডে ক্রমওয়েল বিদ্রোহের একটা বড় দলকে গুলীবারুদের সাহায্যে

ধ্বংস করে দিলেন। লণ্ডন সহরের বড় বড় ধনিকরা টাকার তোড়া দিয়ে ক্রমওয়েলকে অভ্যর্থনা করল। পার্লামেণ্টের নেতারা রক্তের নদীতে জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও লড়াইকে ধ্বংস করে দিতে লাগলেন।

এদিকে তখন লেভেলার্সদের চেয়েও আর একদল চরম পন্থী জেগে উঠছে। ডিগার্সদের নেতা উইন্‌স্ট্যান্‌লী ঘোষণা করলেন—

ইংলণ্ডের মাটি ইংলণ্ডের জনসাধারণের। সকলেই এর সমান সুবিধা ভোগ করবে।

আগেকার সরকার (অর্থাৎ রাজা) যেমন ভাবে হত্যা, জুলুম, জের-জবরদস্তি করে তার শাসন চালিয়েছে, এখনকার সরকারও ঠিক তাই করছে। তা না হলে, দলে দলে লোককে কেন জেলে আটক করা হচ্ছে? হাজার হাজার নিরীহ লোককে কেন শুধু শুধু হত্যা করা হচ্ছে?—

পার্লামেণ্টকে উদ্দেশ্য করে উইনস্ট্যান্‌লী বল্‌লেন—রাজার অত্যাচার আর নিপীড়ন সহ্য না করতে পেরে সাধারণ লোক তোমাদের লড়াই করতে ডেকেছিল। রাজার অত্যাচার ধ্বংস হ'য়েছে বটে, কিন্তু শোষণের সেই বিরাট বৃক্ষ এখনো তার ডালপালা ছড়িয়ে শিকড় গেঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। গরীব লোকের স্বাধীনতার সূর্য্য তার আড়ালে পড়ে গেছে। এই শোষণের বৃক্ষকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেল্‌লে, তবে লোকে স্বাধীনতার সঙ্গীত গাইতে পার্‌বে।

ইতিহাসে যাঁর নাম নেই, সেই বিস্মৃত নেতা উইনস্ট্যান্‌লীর চিন্তাধারা এই সময় সব চেয়ে বেশী ইংলণ্ডের জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করেছিল। জমি কারও একচেটিয়া সম্পত্তি নয়—সুতরাং সকলেই মিলে মিশে চাষ করবে। আর সকলেই ফসলের সমান অংশ পাবে—এই ছিল ডিগার্সদের মূল কথা।

১৬৪৯ এর ১লা এপ্রিল সারে জেলার ওয়ালিটন গ্রামে সেণ্ট জর্জ্জ পাহাড়ের সংলগ্ন জমিতে উইনস্ট্যান্‌লীর নেতৃত্বে ডিগার্সরা চাষবাস সুরু করল। দেখতে দেখতে দিন মজুর আর একেবারে গরীব লোকরা এই আন্দোলনের পিছনে এসে দাঁড়াল। ইংলণ্ডের দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এই ডিগার্স আন্দোলন।

পার্লমেণ্টের কর্ত্তারা সেই লাঠি, গুলী আর বন্দুকের সাহায্যে চালালেন তীব্র দমন নীতি। গুলী বারুদের সে ঝাঁঝের কাছে লেভেলার্স আর ডিগার্সরা আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ল।

ক্রমওয়েল আর পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডকে এমন রাস্তায় নিয়ে চললেন যে, যার ফলে সেই প্রথম চালর্সের বড় ছেলে দ্বিতীয় চার্লস্ আবার সোনার মুকুট মাথায় নিয়ে ফিরে এলেন।

কিন্তু লেভেলার্স ও ডিগার্সরা সফল না হতে পারলেও, তারা জনসাধারণের মনে যে

এক নতুন স্বপ্ন আর উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল—তা ইংলণ্ডের লোক কখনও ভুলে যায়নি। তাই বার বার তারা মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে। বার বার তাদের লড়াই তারা চালিয়ে গেছে। রাজা ফিরে এলেন বটে, কিন্তু সে দাপট আর ফিরল না। কিন্তু সে সব আর এক প্রসঙ্গ।

৩০০ বছর পরে ইংলণ্ডের সমস্ত ঘটনা আমাদের কাছে খুব আজগুবী মনে হয়। তারা যে উদ্দেশ্য আর আদর্শ নিয়ে লড়াই করতে গিয়ে তাদের লালরক্তে ইংলণ্ডের মাটিকে ভিজিয়ে তুলেছিল, আজ আমাদের ভারতবর্ষের ৪০ কোটি লোকই তো তার জন্য সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে—এক কণ্ঠে আওয়াজ তুলছে—সকলের স্বাধীনতা আমরা অর্জ্জন করবই, বৃটিশকে এদেশ থেকে তাড়াবই।

প্রিয় শঙ্কর রায়



বিজ্ঞান

আনবিক বোমা



১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসের এক ভোরবেলায় চমকে উঠে এই পৃথিবীর মানুষ আবিষ্কার করলে এক নতুন যুগ শুরু হয়েছে। চারিদিকে সোরগোল পড়ে গেল। ব্যাপার কি? ব্যাপার কিছুই নয়—দুটি মাত্র বোমা জাপানের দুটো বড় শহরকে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল সবাই এ বোমা হল বিংশ শতাব্দীর অবদান—আণবিক বোমা। কিন্তু এই আবিষ্কার শুধু একটা মারাত্মক অস্ত্রের আবিষ্কার নয়। এই আবিষ্কারে সন্ধান মিলেছে এক বিরাট শক্তির। বৈজ্ঞানিকের বহুদিনের স্বপ্ন হয়েছে সফল। জগতের সূক্ষ্মতম বস্তুও আজ মানুষের করায়ত্ত। সংগে সংগে বৈজ্ঞানিক গবেষণারও মোড় গেছে ঘুরে।

উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা পদার্থকে বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে পদার্থের সূক্ষ্ম অংশ হল অনু—আর অনুর সূক্ষ্ম অংশ হল পরমাণু। বৈজ্ঞানিক ডাল্টন এ কথাও বলেছিলেন যে পরমাণুর চেয়ে ছোট আর কিছুই নেই। শুধু তাই নয়, পরমাণু নিত্য ও এক জাতের পরমাণুকে অন্য জাতের পরমাণুতে রূপান্তর করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই মতবাদে ভাঙন দেখা দিল গত শতাব্দীর শেষ দিকে। যে পরমাণু ছিল অভিবাজ্য তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল আর সেই ভাঙ্গা পরমাণুর মধ্যে খোঁজ পাওয়া গেল আরও সূক্ষ্ম কণিকার। এর সূচনা হল তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কারে। ১৮৯৬ সালে বেকরেল লক্ষ্য করলেন যে ইউরেনিয়াম থেকে রশ্মি বেরিয়ে আসে ও ইউরেনিয়াম রূপান্তরিত হয় সীসায়। ম্যাডাম কুরী পরে লক্ষ্য করেন যে ইউরেনিয়ামএর খনিজ পিচ ব্লেণ্ড (Pitch blend) থেকে আরও তীব্র রশ্মি বেরিয়ে আসে। পিচ ব্লেণ্ড থেকে তিনি প্রধানতঃ দুটি মৌলিক পদার্থ আলাদা করলেন, তাদের নাম

দিলেন পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম। ক্রমে এই রকম আরও কয়েকটি রশ্মিবিকীরণকারী মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হল—যেমন এ্যাকটিনিয়াম (actinium), থোরিয়াম (thorium) ইত্যাদি। এই সমস্ত পদার্থকে বলা হল তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ (Radio active element) রশ্মি-বিকীরণ শেষ হলে এদের শেষ পরিণতি হয় সীসায়।

এই থেকে প্রমাণ হয় যে একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু আর একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত হতে পারে, আর একটি পরমাণু আরও ছোট কণিকার সমষ্টি।

পরমাণুর গঠন সম্পর্কে প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেল গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের ফলে। গ্যাসের চাপ খুব কমিয়ে তার মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের চেষ্টা করলে দেখা গেল যে নেগেটিভ তড়িৎপ্রান্ত (cathode) হতে একটি রশ্মি বেরিয়ে আসে; তাকে বলে ক্যাথোড রশ্মি (cathode ray)। এর মধ্যে থাকে নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত অত্যন্ত দ্রুতগামী অতিক্ষুদ্র কণিকা; এই কণিকাগুলিকে বলা হল ইলেকট্রন। পরমাণুর ওজনে এর দান প্রায় কিছুই নয়।

কোনও পদার্থ সাধারণ ভাবে তড়িৎযুক্ত নয়; কাজেই পরমাণুতে নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন আছে বলে সমানসংখ্যায় পজিটিভ তড়িৎযুক্ত কণিকা থাকতে হবে। এই পজিটিভ তড়িৎযুক্ত কণিকা আবিষ্কার করেন লর্ড রাদারফোর্ড। তিনি নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে আলফারশ্মি চালনা করেন। তা থেকে তিনি পেলেন পজিটিভ তড়িৎযুক্ত কণিকা যার ওজন প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান ও যার পজিটিভ তড়িতের মাপ প্রায় ইলেকট্রনের নেগেটিভ তড়িতের সমান। এই কণিকাগুলির নাম দেওয়া হল প্রোটন।

নানা গবেষণার পর রাদারফোর্ড দেখালেন যে পরমাণুতে কতকগুলি প্রোটন এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। আর তার চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন। ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলে একটি শক্ত গঠন তৈরী করতে হলে ইলেকট্রনগুলিকে প্রোটনের চারদিকে ঘুরতে হবে, না হলে প্রোটনের আকর্ষণে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রে জমা হবে ও তাতে কেন্দ্র হবে তড়িৎশূন্য।

কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যাকে বলা হয় পরমাণুর আণবিক সংখ্যা (atomic number) কেন্দ্রে যদি শুধু প্রোটনই থাকত তা হলে মৌলিক পদার্থের আণবিক ওজন ও আণবিক সংখ্যা হ'ত সমান কেনন৷ প্রোটনের ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান বলে আণবিক ওজন হত প্রোটনের সংখ্যার সমান। কিন্তু একমাত্র হাইড্রোজেনের পরমাণু ছাড়া সবক্ষেত্রেই আণবিক ওজন আণবিক সংখ্যার চেয়ে বেশী। তালে একথাই প্রমাণ হয় যে কেন্দ্রে এমন কতকগুলি কণিকা আছে যার ওজন প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান কিন্তু যারা

তড়িৎ শূন্য। কেন্দ্রে এদের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন রাদারফোর্ড ও চাডউইক ১৯৩২ সালে। বেরিলিয়াম নামে মৌলিক পদার্থের উপর আলফা রশ্মি ফেলে তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে তা থেকে এক প্রকার রশ্মি বেরিয়ে আসছে যেটা তড়িৎশূন্য কিন্তু তার মধ্যে এক রকমের সূক্ষ্ম কণিকা আছে যার ওজন প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান। এই কণিকাগুলিকে বলা হ'ল নিউট্রন (Neutron)। পরমাণুর আণবিক ওজন তার আণবিক সংখ্যার চেয়ে যত বেশি পরমাণুর কেন্দ্রে ঠিক ততগুলি নিউট্রন আছে। হাইড্রোজেনের আণবিক সংখ্যা ও আণবিক ওজন দুইই এক, কাজেই হাইড্রোজেনের পরমাণুর কেন্দ্রে কোনও নিউট্রন নেই ; হিলিয়ামএর আণবিক ওজন ৪ ও আণবিক সংখ্যা ২, সুতরাং হিলিয়ামএর পরমাণু কেন্দ্রে ৪-২ বা দুটি নিউট্রন আছে, ইউরেনিয়ামএর আণবিক ওজন ২৩৮ ও আণবিক সংখ্যা ৯২, কাজেই পরমাণু কেন্দ্রে ২৩৮-৯২ বা ১৪৬ নিউট্রন আছে ; ইত্যাদি।

পরমাণুর গঠন তাহলে মোটামুটি এই রকম—পরমাণুর মধ্যে তিন রকমের সূক্ষ্ম কণিকা আছে, (১) ইলেকট্রন ; এগুলি নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত, এর ওজন অতি নগণ্য (২) প্রোটন ; এগুলি পজেটিভ তড়িৎযুক্ত, তড়িতের পরিমাণ ইলেকট্রনের নেগেটিভ তড়িতের সমান, ওজন প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান (৩) নিউট্রন ; এগুলি তড়িৎবিহীন, ওজন প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। সমস্ত প্রোটন ও নিউট্রন কেন্দ্রে জমা হয়ে আছে, আর প্রোটনের সমানসংখ্যক ইলেকট্রন তার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে,—যেন একটা ছোটখাটো সৌরজগৎ। কেন্দ্রের আয়তন পরমাণুর আয়তনের তুলনায় খুবই নগণ্য কিন্তু পরমাণুর ওজনের সমস্তটাই এখানে কেন্দ্রীভূত।

কোনও মৌলিক পদার্থের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার আণবিক সংখ্যার উপর। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে একই মৌলিক পদার্থের আণবিক ওজন বিভিন্ন কিন্তু এই ওজনের পার্থক্য খুবই কম। কারণ প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকলেও নিউট্রনের সংখ্যা কিছুটা কমবেশি হতে পারে অর্থাৎ আণবিক সংখ্যা ঠিক থাকলেও আণবিক ওজন বিভিন্ন হবে। পদার্থের ধর্ম আণবিক সংখ্যার উপর নির্ভর করে ব'লে ধর্মের কোনও পার্থক্য দেখা যায় না, যদিও নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্যের জন্য আণবিক ওজন বিভিন্ন হয়। এই সমস্ত বিভিন্ন আণবিক ওজনের পরমাণুকে বলা হয় আইসোটোপ (Isotope)। স্বাভাবিক হাইড্রোজেনের আণবিক সংখ্যা ১ ও আণবিক ওজন ১, কিন্তু আর একটি পদার্থ দেখা যায় যার ধর্ম হাইড্রোজেনের ধর্মের মত কিন্তু আণবিক ওজন ২ ; এটিকে বলা হয় গুরু হাইড্রোজেন। এর কেন্দ্রে আছে একটি প্রোটন ও আর একটি নিউট্রন।

পরমাণুর কেন্দ্রের গঠন খুব শক্ত ; প্রোটন ও নিউট্রনগুলি পরস্পরকে এমনভাবে -

আঁকড়ে আছে যে তাদের বিচ্ছেদ ঘটান খুব কষ্টকর। কিন্তু এত শক্তি এল কোথা থেকে? এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আইনষ্টাইন।

বস্তু ও শক্তিকে আগে দেখা হত সম্পূর্ণ আলাদা করে। বস্তুর সঙ্গে শক্তির যে কোনও সম্পর্ক আছে তার কোনও আভাসই পাওয়া যায় নি, কারণ বস্তুর মধ্যে শক্তি সঞ্চালিত করলে (গরম করলে বা চালাতে থাকলে) ওজনের কোনও পরিবর্তন সুক্ষ্মতম যন্ত্রের সাহায্যেও ধরা পড়ত না (সবচেয়ে দ্রুতগামী কামানের গোলার ওজন বাড়ে মাত্র দশ কোটি ভাগের ১ ভাগ)। আইনষ্টাইন প্রমাণ করলেন যে বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে উৎপন্ন শক্তি সাধারণভাবে উৎপন্ন শক্তির চেয়ে বহুকোটিগুণ বেশি।

একটি পরমাণুর ওজন তার মধ্যেকার প্রোটন ও নিউট্রনের ওজনের সমষ্টির চেয়ে কিছুটা কম; কাজেই পরমাণু গঠনের সময় প্রোটন ও নিউট্রনের ওজন কিছুটা কমে যায়। যেটুকু ওজন এইভাবে নষ্ট হয়ে যায় তা সেইটুকুই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে প্রোটন ও নিউট্রনগুলিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে। এই জন্য পরমাণুর গঠন এত দৃঢ়। কেন্দ্রে লুকানো এই শক্তি সাধারণ উপায়ে উৎপন্ন শক্তির চেয়ে অনেক কোটিগুণ বেশী হলেও এর অস্তিত্ব প্রায় অজ্ঞাতই ছিল।

এর পরে সুরু হল পরমাণু কেন্দ্রকে ভাঙ্গাগড়ার প্রচেষ্টা; এর সূচনা করেন রাদারফোর্ড ও চাডউইক। এ্যালুমিনিয়ামের উপর আল্‌ফা রশ্মি ফেললে তা থেকে বেরিয়ে আসে নিউট্রন আর এ্যালুমিনিয়াম রূপান্তরিত হয় ফসফরাস নামে মৌলিক পদার্থের একটি তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপসএ। এটি ক্রমশঃ রশ্মি বিকীরণ ক'রে শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় সিলিকন ব'লে আর একটি মৌলিক পদার্থে। এর ফলে যেটুকু শক্তি ছাড়া পায় তা অত্যন্ত নগন্য। কিন্তু এথেকে প্রমাণ হয় যে একটি মৌলিক পদার্থকে কৃত্রিম উপায়ে অপর আর একটি মৌলিক পদার্থে পরিবর্তিত করা সম্ভব।

পরমাণুকে এই ভাবে ভাঙ্গতে হলে নিউট্রনই সব চেয়ে কাজে লাগে। প্রোটন পজিটিভ তড়িৎযুক্ত বলে কেন্দ্রের প্রোটন তাকে ফিরিয়ে দেয় আর ইলেকট্রন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত হওয়ায় পরমাণুর বাইরের স্তরই ভেদ করতে পারেনা। নিউট্রনের এইসব অসুবিধা নেই। তা হলেও সাধারণভাবে উৎপন্ন নিউট্রন খুব শক্তিশালী হয়না। কিন্তু সাইক্লোট্রোন প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে নিউট্রনকে শক্তিশালী করে পরমাণুর কেন্দ্রকে ভাঙ্গা সম্ভব।

নিউট্রনের সাহায্যে সাধারণ মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে ভাঙ্গা গড়ার ফলে যে সমস্ত মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তার আণবিক ওজন প্রথম পদার্থের আণবিক ওজনের খুব কাছাকাছি, আর তা থেকে যেটুকু শক্তি ছাড়া পায় তাও খুব নগণ্য। তাছাড়া স্বাভাবিক তেজষ্ক্রিয়

পদার্থের রশ্মিবিকীরণের ফলে যে টুকু শক্তি ছাড়া পায় তাও খুব নগণ্য। সেজন্য রাদারফোর্ড ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে আণবিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার কখনও সম্ভব হবেনা।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা এত সহজে হাল ছেড়ে দিলেন না। এত বড় শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়ে তাকে কাজে না লাগাতে পারা পর্যন্ত তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা দেখা গেল ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইউরেনিয়ামকে কৃত্রিমভাবে রূপান্তরিত করার চেষ্টার ফলে।

ইউরেনিয়াম (আণবিক ওজন ২৩৮) একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ, এই পদার্থটী বহুদিন ধরে রশ্মিবিকীরণ ক'রে সীসায় পরিবর্তিত হয়। কাজেই এক্ষেত্রে পরিবর্তন খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না, কয়েকটি প্রোটন ও ইলেকট্রন মাত্র সরে যায়। কিন্তু ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে ইউরেনিয়ামএর পরমাণু প্রায় দু'টো সমান অংশে ভেঙ্গে যায় ও প্রচুর শক্তির সৃষ্টি হয়। থোরিয়ামকেও এই ভাবে ভাঙ্গা সম্ভব হয়েছে।

সাধারণ ইউরেনিয়ামএর আণবিক সংখ্যা ৯২ ও আণবিক ওজন ২৩৮। কিন্তু এর একটি আইসোটোপ আছে যার আণবিক ওজন ২৩৫, কাজেই এর কেন্দ্রে আছে ৯২টি প্রোটন ও ২৩৮-৯২ অথবা ১৪৩টি নিউট্রন। এর কেন্দ্র যথেষ্ট বড়, সেইজন্য এর ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা আছে। একটি দ্রুতগামী নিউট্রন একে আঘাত করলে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে আর এটা পরিবর্তিত হয় অন্য একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থে। কিন্তু যদি নিউট্রনটি ধীরগামী হয় তা হ'লে সেটা কেন্দ্রে বন্দী হয়ে যায়। জলের ফোঁটা খুব বড় হলে যেমন প্রায় দুটো সমান অংশে ভেঙ্গে যায় ঠিক তেমনি ইউরেনিয়াম (২৩৫) পরমাণু দুটো প্রায় সমান অংশে ভেঙ্গে যায় আর নিউট্রন দ্রুতবেগে বেরিয়ে আসে। অংশ দুটির একটি হ'ল বেরিয়াম ও অপরটি ক্রিপ্‌টন নামে একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এর ফলে ইউরেনিয়াম পরমাণুর $\frac{1}{1000}$ ভাগ বিলীন হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে পরমাণুর মধ্যে লুকান প্রচণ্ড শক্তি ছাড়া পায়। এই শক্তি যে কত ভীষণ তা প্রমাণ করে আণবিক বোমার ধ্বংস-শক্তি। যে আণবিক বোমায় হিরোসিমা সহর প্রায় ধ্বংস হয়েছে তার বিস্ফোরক অংশ ছিল একটি মুরগীর ডিমের মত।

আণবিক বোমার আবিষ্কার কিন্তু শুধু একটা মারাত্মক বোমার আবিষ্কার নয়। এই আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিকদের বহু ধারণা বদলে গেছে—আজ তাঁরা নতুন শক্তির সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু এই নতুন শক্তির উৎস সন্ধানের ফলে আমাদের সমাজে নতুন সংকট দেখা দিয়েছে। আণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যানে প্রয়োগ করাই বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন ও সাধনা—কিন্তু সেই স্বপ্নকে নির্মম ভাবে ভেঙ্গে দিতে চাইছে কায়েমী স্বার্থের দল। তারা জানে যে আণবিক

শক্তি শিল্পজগতে বিপ্লব আনবেই—ফলে তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে। কাজেই তারা আণবিক শক্তিকে শুধু একটা মারাত্মক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চায়—সমাজের কল্যাণে সাধারণের স্বার্থে তার ব্যবহার ব্যহত করতে চায়। নিজেদের সমাজদ্রোহী বাসনার এর পরিপূরক হিসেবেই আণবিক বোমার ব্যবহারে একচেটিয়া কর্ত্তৃত্ব কায়েম রাখতে চায়। ফলে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে দেখা দিয়েছে মহাসংকট—একদিকে রয়েছে সাধারণ মানুষ—যারা চায় বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করতে—অন্যদিকে আছে মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের দল—যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে চায় বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে। এই বিশ্বব্যাপী সমস্যার সমাধান হবে সেদিন যেদিন কায়েমী স্বার্থের হবে বিনাশ—জনসাধারণের হাতে আসবে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব।

অনিল সেন

দর্শন ও সাহিত্য

দর্শন কাকে বলে?

ছোট ছেলেদের মুখে প্রশ্নের অন্ত নাই। আকাশ কেন নীল, গাছের পাতা সবুজ কেন, দিনরাত্রি কেন হয় এমনতর হাজার হাজার প্রশ্ন। আমাদের মানুষ-জাতির আদিপুরুষেরাও এমন হাজার হাজার প্রশ্ন নিয়া ভাবনায় পড়িয়াছিলেন। সখ করিয়া নয়, তাঁহাদের না ভাবিয়া উপায় ছিল না। বাঁচিতে হইবে যে, এবং না ভাবিয়া বাঁচাই অসম্ভব ছিল। মানুষজাতির সেই অন্ধকারময় আদিযুগের সঙ্গে আমাদের যুগের তুলনা হয় না। এখন আমরা অনেক প্রশ্নের উত্তর পাইয়া গিয়াছি, প্রকৃতির অনেক কলাকৌশল আমাদের মুঠার মধ্যে। কিন্তু সেই যে আদি মানুষ গাছ হইতে মাটিতে নামিল, হিংস্র জন্তুর সঙ্গে রুক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই সুরু করিল তাহার কাছে বিশ্বজগত ছিল যেন নূতন অঙ্কের বই। ভুল ভ্রান্তি করিতে করিতে, ঠেকিয়া শিখিতে শিখিতে আমাদের আদিপুরুষদের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষ দুনিয়ার রহস্যের চাবিকাঠি এক একটী করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। আদিকালের মানুষেরাই দর্শনের গোড়াপত্তন করিয়াছেন খেয়াল খুসীমত নয়, টোল মক্তবের ছাত্র পড়াইবার জন্য নয়। নিতান্ত বাঁচিবার তাগিদেই তাঁহাদিগকে দেখিতে হইয়াছে, বুঝিতে হইয়াছে। ইহাই দর্শনের মূল।

অনেককাল পরে সভ্যমানুষেরা সেই গোড়ার কথা ভুলিতে বসিয়াছে। এখন কোন কোন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন দর্শনের মূল হইতেছে বিস্ময়—পৃথিবীর অনেক কিছু আশ্চর্য্য মনে বলিয়াই মানুষের দর্শন সেই আশ্চর্য্য বিষয় বুঝিতে চাহিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিলেন দর্শনের মূল হইতেছে ভয় বা কৌতূহল। ভয় অবশ্য কিছুটা ছিলই, কারণ পৃথিবীর রহস্য বুঝিবার চেষ্টা না করিলে যে দুর্ভোগ দুর্গতি ও অপমৃত্যুর ভয় আছেই। নদীতে বন্যা কেন হয়,

শীত নিবারণ কি ভাবে করা যায়, প্রকৃতির নিকট হইতে দরকার মত খাদ্য কি করিয়া সংগ্রহ করা যায়—এই সবই জানার তাগিদ ছিল এবং আছে ঃ জীবনধারণের জন্যই দর্শন।

এখন আমরা অনেকে দর্শনের গোড়ার কথা ভুলিয়া গিয়াছি, জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান খোঁজার নেশা জমিয়া গিয়াছে। তাই অনেকের কাছেই মনে হয় দর্শন একটা হেঁয়ালি মাত্র। উহা কেবল মাত্র পণ্ডিতদের কারবার; সাধারণ লোকের কাজে লাগে না। ঠিক সেই জন্য আমরা সাধারণ লোকেরা দার্শনিক বলিতে অনেক সময় খামখেয়ালী কাণ্ডজ্ঞানহীন আপন ভোলা লোককেই বুঝি। সেই যে পণ্ডিত ফুটন্ত ডাল উথলাইতে দেখিয়া ভয়ে দিশাহারা হইয়াছিল এবং পরে তাহার ব্রাহ্মণীকে দেবী বলিয়া স্তবস্তুতি করিয়াছিল—দার্শনিক বলিতে আমরা অনেকটা ঐ রকম পণ্ডিতের কথাই ভাবি।

আসলে কিন্তু আমরা সকলেই অল্প বিস্তর দার্শনিক। কারণ জগত ও জীবন সম্বন্ধে কোন না কোন একটা ধারণা আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। এই ধারণা অবশ্য সকলেরই খুব পরিষ্কার নয়। কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করে জগতের অর্থ এই, জীবনের উদ্দেশ্য এই। কেহ বা পিতামাতা গুরুজন শাস্ত্রবাক্য হইতে মোটামুটি একটা জ্ঞান বিশ্বাস গড়িয়া নেয়। সব দর্শনেরই অবশ্য ভাল মন্দ আছে। আমি যদি ভাবি যে আমার নিজের সুখের জন্যই পৃথিবী চলিতেছে সে-ও একটা দার্শনিক মত। আবার আমি ভাবিতে পারি যে সকলের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল। হিটলার দাবী করিয়াছিলেন, পৃথিবীর উপরে জার্মান জাতির প্রভুত্ব ঈশ্বরের বিধান। আপত্তি উঠিবে, ইহার প্রমাণ কি? ঠিক কথাই, সব দার্শনিক মতকেই প্রমাণ প্রয়োগের পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা সব সময় করা হয় না। কারণ অনেক দার্শনিক বলেন, যাহা দিব্য জ্ঞান তাহার প্রমাণ কেবল মনের মধ্যে—গান্ধীজী যেমন বলেন অন্তরের বাণী—অন্তরের বাণীর প্রমাণ অন্তরে, বাহিরের জগত হইতে উহার প্রমাণ দেওয়া যায় না।

তাহা হইলে দেখা যায়, দর্শন সম্বন্ধে দুটী দল ভাগ হইয়া যাইতেছে। এক দল বলিবেন, সকল বিষয়ে কি বিজ্ঞানের প্রমাণ প্রয়োগের রীতি চলে? যাহা পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়া জানা যায় ব্যাখ্যা করা যায় বিজ্ঞান কেবল তাহা নিয়াই কারবার করে। জগত ও জীবনের এমন অনেক দিক আছে যাহা কেবল মাত্র অনুভূতি দিয়াই জানা যায়, যাহার প্রমাণ-প্রয়োগ বিজ্ঞানের এলাকাভুক্ত নয়। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহারা হইলেন অধ্যাত্মবাদী বা পরমার্থবাদী। অর্থাৎ তাঁহারা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা নিয়াই সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা দেখিতে চান যে জগত ও জীবনের মূলে একটা আধ্যাত্মিক বা ঐশ্বরিক শক্তি আছে। এই শক্তিই জগতকে ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, চালাইতেছে।

অন্য দিকে যাঁহারা বস্তুবাদী বিজ্ঞানে বিশ্বাসী তাঁহারা প্রশ্ন করিবেন—কোথায় সেই আধ্যাত্মিক শক্তি? জগতের চলাফেরার রীতি, জীবন-মরণ, ঋতু পরিবর্ত্তন, সবই তো প্রকৃতির স্বাভাবিক শক্তিতে চলিতেছে। চেতন ও অচেতন পদার্থের উপাদানগুলি জানা যাইতেছে, উহারা কি ভাবে মিলিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, নূতন বস্তু সৃষ্টি করিতেছে তাহাও ক্রমে ক্রমে জানা যাইতেছে। কাজেই আধ্যাত্মিক শক্তির, ঈশ্বরের লীলার কোন চিহ্নমাত্র দেখিতেছি না।

দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যায় মোটামুটি দুই ভাগ—অধ্যাত্মবাদী ও বস্তুবাদী। আবার ইহার উপরেও অন্যরকম বিভাগ আছে। কোন দর্শন আস্তিক্যবাদী অর্থাৎ ঈশ্বর এবং পরলোকে বিশ্বাসী। আবার কোন দর্শন নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বর এবং পরলোকের প্রমাণ নাই বলিয়া বিশ্বাস করে না। বস্তুবাদী দর্শন মাত্রেই নাস্তিক। বস্তুবাদের মতে বস্তুই জগতের মূল, বস্তুর নিজের শক্তিই জগতের নানা উপাদান সৃষ্টি করিয়াছে, উপাদানগুলি মিলাইয়া মিলাইয়া চেতন অচেতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। কোটী কোটী গ্রহ নক্ষত্র হইতে একমুষ্টি ধূলা পর্য্যন্ত সব কিছু একই বস্তুজগতের নানা উপাদানে তৈয়ারী। এই বস্তু জগতকে জানিবার, বুঝিবার, কাজে লাগাইবার কৌশল শিখাইতেছে বিজ্ঞানের হাত কলমে পরীক্ষা প্রমাণ প্রয়োগ। জপতপ করিয়া কিম্বা যোগবলে এই বস্তু জগতকে বুঝিতে হয় না, বুঝিতে পারাও যায় না। একশত বৎসরের আগের কথা। ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লাস সৌর জগতের জন্মকথা আলোচনা করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। নেপোলিয়ন গ্রন্থখানি পড়িয়া লাপ্লাসকে জিজ্ঞাসা করেন, ইহার মধ্যে কোথায়ও ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করা হয় নাই কেন? লাপ্লাস উত্তর দেন, সৌরজগতের জন্মকথা ব্যাখ্যা করিতে ঈশ্বরের দরকার হয় নাই।

বস্তুবাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের তফাৎ এইখানেই। বস্তুবাদ জগত ও জীবনকে ব্যাখ্যা করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। বিশ্বজগতের অন্তরে ঊর্দ্ধে বা পশ্চাতে কোন অদ্ভুত নিরাকার শক্তি (যাহাকে অনেকে বলেন আত্মা, চৈতন্য, মহাশক্তি, ঈশ্বর, ইত্যাদি) কাজ করিতেছে না, বস্তুজগত চলিতেছে স্বাভাবিক নিয়মে, নিজের শক্তিবলে ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, নূতন উৎপাদন সৃষ্টি করিতেছে। এক সময় ধারণা ছিল বস্তু নিতান্তই জড়পদার্থ, পরমাণু রহস্য আবিষ্কার হইবার পর এখন সকলেই মানিবেন যে বস্তুর মধ্যেই রহিয়াছে অসীম শক্তির পুঞ্জ। য়্যাটম বোমার মহামারী কাণ্ড দেখিয়া আর কি সন্দেহ থাকে যে বস্তুজগত ঈশ্বর কি পরমাত্মা বা অধ্যাত্ম শক্তির ফরমায়েস মত চলে?

তবে কি অধ্যাত্ম বিষয় কিছুই নাই? শেষ পর্য্যন্ত সবই কি পরমাণুর যোগ-বিয়োগের খেলা? অধ্যাত্ম বিষয় আছে বৈ কি। মানুষের মন, তাহার বৈচিত্র্য ভাবনা ধারণা সৌন্দর্য্যবোধ এইগুলি জীবনের আধ্যাত্মিক বিষয়। তবে এইগুলি বস্তুজগতের বাহির হইতে আসে নাই,

কোন কল্পিত স্বর্গলোক হইতে পৃথিবীতে নামিয়া আসে নাই। মানুষের মনই বল কি আত্মাই বল সবই মানুষের দেহের উপর নির্ভর। দেহের বিচিত্র সংগঠন, মস্তিস্ককোষের ক্রিয়াকলাপ হইতেই মন, আত্মা, ভাবনা ধারণা সব কিছুর উৎপত্তি।

দর্শনের গোড়ার কথাও হইল এই,—বস্তুই মূল, না চৈতন্য, পরমাত্মা ইত্যাদি। বিজ্ঞান দেখাইতেছে কোটী কোটী বৎসর এই বিশ্বজগতে প্রাণ বা মনের চিহ্ন মাত্র ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, আদিকালে পৃথিবীতে জীবনের কোনো চিহ্ন ছিল না।···পৃথিবীর সুরু থেকে দেড়শো কোটী বছর যখন পার হোলো তখন অশান্ত আদি যুবার মাথা কুটে মরা অনেকটা থেমেছে।···পৃথিবীতে সৃষ্টির কারখানাঘরে তোলপাড় চলেছিল প্রাণহীন পদার্থ নিয়ে। তার উপকরণ ছিল মাটী, জল, লোহা পাথর প্রভৃতি, আর সঙ্গে সঙ্গে ছিল অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস। নানারকমের প্রচণ্ড আঘাত তাদেরই উল্টপালট করে জোড়াতাড়া দিয়ে নদী পাহাড় সমুদ্রের রচনা ও অদল বদল চলছিল। এমন সময় এই বিরাট জীবহত্যার মধ্যে দেখা দিল প্রাণ, আর তার সঙ্গে মন।

তাহা হইলে দেখ বিশ্বজগতের বংশাবলীতে প্রাণ ও মনের আবির্ভাব অনেক পরে। আবার এই প্রাণপ্রবাহে মানুষের আবির্ভাব আরও পরে। বিশ্বের মূলতম উপকরণ পরমাণু, ইহারই বিচিত্র সংযোগে তৈয়ারী হইল সূক্ষ্ম জীবানুকোষ। কোটী কোটী জীবানুকোষের সহযোগে দেখা দিল প্রাণিজগত। এই প্রাণিজগতের ভাঙ্গাগড়া রূপান্তরের ইতিহাসও দীর্ঘ। মানুষ আসিয়াছে এই রূপান্তরের পথ বাহিয়া। কাজেই প্রাণ, মন, চৈতন্য সবই বস্তু জগতের ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাসে আবির্ভূত হইয়াছে বস্তুর মূল উপাদানগুলির যোগ-বিয়োগের ফলে। অধ্যাত্মবাদীরা যখন বলেন চৈতন্যই মূল, ইহাই জগতের গোড়ার কথা, তখন বস্তু জগতের রূপান্তরের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস অস্বীকার করেন। দেহকে বাদ দিয়া চৈতন্য মন, প্রাণ কোথায়ও দেখা যায় নাই। যাঁহারা বলেন চৈতন্য, মন বা প্রাণ স্বাধীন (অর্থাৎ বস্তু জগতের উপর নির্ভর করে না) এবং বিশ্বজগতের ইতিহাসে বস্তুর অগ্রগামী তাঁহারা হইলেন অধ্যাত্মবাদী। আর যাঁহারা বলেন বস্তুই মূল, চৈতন্য মন প্রাণ বস্তুর বিভিন্ন উপাদানের মিলনে জন্মাইয়াছে তাঁহারা বস্তুবাদী।

দর্শনের এই মূল তত্ত্ব নিয়াই বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের বিরোধ।

মোটকথা হইল, দর্শনের সমস্যাগুলির চাইতে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়াই মত-বিরোধ বেশী। কি মানিব এবং কি মানিব না, কি বিশ্বাস করিব অথবা করিব না, সত্য অনুসন্ধান করার উপায় কি এইগুলি নিয়াই বিবাদ প্রবল। কেহ বলিবেন পিতৃপিতামহরা যাহা মানিয়া গিয়াছেন, মহাপুরুষেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই মানিব। অথচ পিতৃপিতামহরা, মহাপুরুষেরা

সকলেই এক কথা বলেন নাই, আবার এক এক যুগে তত্ত্বকথার এক এক রকম মোড় ঘুরিয়াছে। ঘুরিয়াছে বলিয়াই মানুষের সভ্যতা অগ্রসর হইয়াছে, জ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। শীতলা এবং ওলাবিবিকে মানিয়া বসিয়া থাকিলে রোগপ্রতিষেধক আবিষ্কার হইত না। কেহ কেহ রফা করিবেন, বস্তুজগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও মানিব, আবার অলৌকিক পরমার্থও মানিব। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই দিক খুলিয়া ধরিয়াছে আরও একটী জটিল বিভাগ। ইহাকে বলে জ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সত্য সন্ধান কি ভাবে অগ্রসর হয় তাহারই বিচার। প্রত্যক্ষই কি একমাত্র সত্য না যাহা ইন্দ্রিয় দিয়া গ্রহণ ও প্রমাণ করা যায় না এমন একটি অলৌকিক জগতও আছে? বিজ্ঞান অবশ্য অলৌকিককে নির্ব্বাসন দিয়াছে, যাহা এক কালে মনে হইয়াছে ভুত-প্রেতের প্রভাব বিজ্ঞান তাহাকে স্বাভাবিক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে, মানুষের কাজে লাগাইয়াছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসেই জ্ঞানতত্ত্বের জবাব—বিশ্বজগতকে স্বাভাবিক ভাবে জানা যায়, বোঝা যায় এবং যাইতেছে।

অধ্যাত্মবাদীরা ইহা পুরাপুরি স্বীকার করেন না; প্রতিদিনের জীবনে অবশ্য স্বীকার করেন, বিজ্ঞানের শরণ নেন। তবুও তত্ত্ববিচারের সময় বলেন যে বস্তুজগতই মুলসত্য নয়, মূল সত্যকে জানিতে হয় অন্তর দিয়া। ধর্ম্ম, লোকাচার, বহুযুগের সামাজিক সংস্কার অধ্যাত্মবাদীকে সমর্থন করে। অপর পক্ষে বিজ্ঞান, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা, প্রমাণ প্রয়োগ বস্তুবাদীকে আগাইয়া নিয়া চলে।

সরোজ আচার্য্য

তোমাদের বই লেখা

তিনটে বই-এর কথা বলছি। প্রথমটার পরে দশবছর কেটেছে শেষেরটা রচিত হতে। লেখকরাও থাকে হাজার হাজার মাইল দূরে। মনে করো না যে তিনজন মাত্র লেখকদের কথা বলব তোমাদের। কারণ যারা বই তিনটে লিখেছিল তাদের সংখ্যা হবে কমপক্ষে দুশো। এদের অর্দ্ধেকেরও বেশী লোকজনদের চেনে কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রায় সত্তর হাজার করে ছাপানো হয়েছে তাদের লেখা বই আর সারা রাশিয়ার ছেলে মেয়েরা ওই বই পড়ার জন্য পাগল।

কিন্তু ওসব হিসেব নিকেশ রেখে দাও···সে হল এগারো বছর আগের কথা। সুদূর সাইবেরিয়ার ইর্কুটস্ক সহরের এক স্কুলের সাহিত্য চক্রের সভ্য হচ্ছে সোনিয়া। বয়স তার মাত্র তের; বুদ্ধিতে কিন্তু কম যায় না। সেই পরামর্শ দিল অন্য সবাইকে যে তাদের পাইওনীয়ার দলের জীবন নিয়ে বই লিখতে হবে। সবাই সায় দিল এ প্রস্তাবে।

সবাই মিলে হাজির হল চক্রের পাণ্ডা কবি ইজন মোলচান সিরিস্কার কাছে। বসে বসে এই তরুণ সাহিত্যিকরা ঠিক করে ফেলল তারা— তাদের বই কি ভাবে লেখা হবে, কি কি অধ্যায় থাকবে, কে কি লিখবে সব।

ভূমিকায় লেখকরা স্বীকার করেছে— "লেখা যে কি কঠিন কি বলব? ভেবে দেখুন যে আমাদের ব্যাকরণের বিদ্যের দৌড় দেখে দুজন বুড়ো তো হেসেই অস্থির হতেন।"

রোজ সন্ধ্যেয় লেখাপড়া করে তারা একসঙ্গে মিলে যতটুকু লেখা হত তার সম্বন্ধে নিজেরা আলোচনা করত। কোনও ভুল থাকলে শুধরে নিত। আলোচনা হতে হতে মারামারি হবারও উপক্রম হত কোন সময়! লেখকদের নিয়ম ছিল নিছক সত্যি ছাড়া তারা কিছু লিখবে না! এক লাইনও কেউ বানিয়ে মিথ্যে করে লিখতে পারবেনা।

সাহিত্য চক্রের বৈঠকের ঠিক এক বছর পরে ইর্কুটস্কের ছাপাখানায় একটি পাণ্ডুলিপি এল "খ্যাঁদা নাকী বৈঠক।" তার আগে সোবিয়েটের শিশুদের অকৃত্রিম বন্ধু ম্যাক্সিম গর্কী সে পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছিলেন। পাইওনীয়রদের বইটি পেয়ে সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক একটি সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন তাদের। তিনি তাতে তরুণ সাহিত্যিকদের সাবধান করে দেন যে তারা যেন -

এতে গর্ব্বিত না হয় কিংবা একে অন্যকে হিংসে না করে। গর্কী তাদের শিখিয়ে দিলেন যে চারদিকে, রোজ কি হচ্ছে তা যেন তারা আরও ভাল করে লক্ষ্য করে, নিজেদের বিষয়ে যেন আরও সজাগ থাকে, আর খাটুনী করতে পেছুপা না হয়।

"খ্যাঁদানাকী বৈঠক" লেখা হয় দশ বছর আগে। ১৯৪৪ সালের পাইওনীয়ারদের কাছে এর অনেক কিছুই অদ্ভুত মনে হয়।

এর এক বছর পরের কথা। গর্কী তখন ক্রাইমিয়ায় থাকেন। তাঁর কাছে চিঠি এল একেবারে উত্তরের দেশ সুমেরু অঞ্চলের ইগার্কা থেকে। সাইবেরিয়ার একটা বড় বন্দর হচ্ছে ইগার্কা। সেখানকার প্রায় দুহাজার ছেলে মেয়ে মিলে লিখেছে তাদের জীবনের কথা দেশের কথা; শেষে জানিয়েছে যে ইগার্কার ছেলেদের পড়াশুনো আর জীবন নিয়ে তারা বই লিখবে। গর্কীর যুক্তিপরামর্শ পেয়ে তারা কটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছিল। এই ধর, "খাঁদা নাকী বৈঠকের অনুসরণ করা কতটা ঠিক হবে?" "অধ্যায় ভাগ করা হবে কি করে?" "তারা কি ইগার্কার সব কটি স্কুলের বর্ণনা দেবে না একটাকেই কেন্দ্র করে লিখবে?" গর্কী তাদের এক লম্বা চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি একটা খড়সাও তৈরী করে পাঠান। সেই চিঠি ছাপিয়ে ইগার্কার প্রত্যেক স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কি করে দুরন্ত সাহস আর দায়িত্বের পরিচয় দিতে হয়, জ্ঞান আহরণের আর কাজ করার আনন্দের বিষয় তিনি যা লিখেছিলেন ইগার্কার প্রত্যেকটি ছেলেই মন দিয়ে তা পড়ল। এই ভাবে ১৯৩৬ এর প্রথমে সুমেরুর ছেলের গর্কীর বইএর কল্পনা নেয়। যারাই একটু লিখতে পারে তারাই চাইল নিজেদের সখের বিষয়ে লিখতে। কেউ চাইল কুকুর নিয়ে লিখতে কেউ ঠিক করল উড়োজাহাজে টানা শ্লেজের কথা, কেউ চাইল বন্দরের কাজের বিষয় লিখতে। উদীয়মান লোকদের মধ্যে ছিল শিকারী, ছেলে, পর্য্যটক আর ইঞ্জিনিয়ার। কেহ বাদ যায় নি। একসঙ্গে লিখতে লিখতে সবাই তারা আরও ঘনিষ্ঠ হল। আলাপ পরিচয় হল আরও গাঢ়, বাগানের চড়ুই পাখি খরগোস শিকার করে কাঠবেড়ালী খেদানো সব কিছু থেকেই তারা লেখবার উপাদান পেল। এমনি করে দেখতে দেখতে সপ্তাহ ছেড়ে মাস কাটতে লাগল। অন্য শহরে স্কুলের ফল জানবার জন্যে তারা এগারোটা টেলিগ্রাম পাঠালো ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে। তাদের দেশে জলবায়ু কেমন, সেখানের ছেলেমেয়েরা মে মাস কি করে কাটালো এই সব তখন তারা জানতে চাইল। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ মনীষি রোঁমা রোঁল্যা, সুইজারল্যাণ্ডে। এরা তাঁকেও টেলিগ্রাম করল।

১৯৩৬ সালের জুন মাসে ইগার্কার ছেলেরা খবর পেল গর্কীর মৃত্যুর। গর্কীর এই সব তরুণ বন্ধুদের মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। অনেকে বই লেখা বন্ধ করে দিতে চাইল। —কি হবে আর লিখে? যিনি ভালবাসতেন তিনিই যখন নেই—

কিছু দিন পর তাদের টেলিগ্রামের উত্তর আসতে লাগল। খার্কভ, স্বের্ডলভস্ক, ওডেসা থেকে এল শত শত চিঠি। সবাইরই এক প্রশ্ন—কবে তাদের বই *শেষ হচ্ছে?*

সুইজারল্যাণ্ড থেকে এলো রেঁালার চিঠি, 'আমার আদরের মেরু ভালুকের খোকন সোনারা, এক মনে কাজ করে যাও, যত বাধাই আসুক কখনো ভেঙে পড়ো না যেন। বাধা বিপত্তি আসবেই। তাকেই জয় করতে হবে। জয়ের ভেতর দিয়েই তোমরা বড় হয়ে উঠ্‌বে!'

ইকুটস্কের খাঁদা-নাকীদের কাহিনী লিখতে যা সময় লেগেছিল "আমরা সব ইগার্কার" লিখতে লাগে তার দ্বিগুণ। কাজ কত বড় দেখতে হবে তো। এর উদ্দেশ্য আলাদা, লেখবার বিষয় অনেক বড়-লেখকদের খাটুনিও অনেক বেশী। কোন একটা স্কুল নিয়ে নিয়ে তো এবার লেখা হচ্ছে না। সমস্ত ইগার্কা শহর থাকছে এতে। শুধু উপরি উপরি ছু-চারটে কথা নয়; কি করে এই সহর গড়ে উঠল তার ইতিহাস থাকবে এতে।

সোভিয়েটের লোক এসেছিল বন্দর গড়ে তুলতে। কেউ একা, কেউ ছেলে বৌ পরিবার সঙ্গে করে। যে একশো চল্লিশ জন মিলে "আমরা সব ইগার্কার" লিখেছিল তাদের অনেকেই কাঠের কল, বিরাট অট্টালিকা, থিয়েটার, স্কুল গজিয়ে উঠতে দেখেছে সেই বরফের দেশে। তাদের চোখের সামনে সাইবেরিয়ার সবচেয়ে বড় নদী ইনিসীর তীরে গড়ে উঠেছে এই সহর। তারা চাক্ষুষ দেখেছে হিম আর তুষারের সঙ্গে যুদ্ধ করে কি ভাবে গড়ে উঠেছে ইগার্কা। তাই তারা এত ভালবাসে ইগার্কাকে।

গোটা বইটা ছাপিয়ে আছে এই দরদ। কি ঘটনার দিক থেকে, কি দৃষ্টিভঙ্গী আর রচনা বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে "আমরা সব ইগার্কার" একটি অনবদ্য বই হয়েছে। ছেলে বুড়ো সবাই পড়ে আনন্দ পাবে।

সুমেরুর গাছপালা, জীবজন্তু, আর জলবায়ু সব কিছুরই খবর আছে এতে। ইগার্কার বর্ণনাও খুব সুন্দর। দেশের আর্থিক কাঠামোতে ইগার্কার কি স্থান তাও বোঝান আছে খুব সহজ করে। সহজ সরল ঘটনা দিয়ে সোভিয়েটের ছেলেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছে এই সব। ১৯৩৯ সালের নিউ ইয়র্কের "বিশ্ব মেলায়" হাজার হাজার লোক সোভিয়েট প্যাভিলিয়নে বইটি দেখেছিল!

দ্বিতীয়টির তো কথা হল। কিন্তু এবার কি? এবার শোনো তৃতীয়টির কথা!

১৯৪০ সালে উরাল অঞ্চলের কেন্দ্রের স্বের্ডলভস্ক শহরের ছেলেরা ঐ অঞ্চলের সবাইকে চিঠি লিখে জানালো যে তারা সবাই মিলে দেশের বিষয়ে বই লেখবে।

কাজটা বড় সহজ নয়। উরাল প্রদেশের তিনটে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল স্বের্ডলভস্ক, চেলিয়াবিনস্ক, মলোটোভ। শত শত শহর আছে এখানে, হাজারে হাজারে পঞ্চায়েতী খামার, গ্রাম আর

লোকের বসতি। খাঁদা-নাকী বৈঠকে বলা হয়েছিল মাত্র তিরিশ জনের গল্প। "আমরা সব ইগার্কার" ছিল একটী শহরের কথা। প্রায় দুহাজার ছেলের অক্লান্ত পরিশ্রমে বইটি লেখা হয়েছিল। আর উরালে আছে দু'হাজার স্কুল—প্রায় দশ লক্ষ ছেলে তাতে পড়ে। ভেবে দেখো ব্যাপারখানা কি ভীষণ।

ছোটরা কিন্তু ভয় খেয়ে পিছিয়ে আসে নি। তারা নিজিদের দেশ নিয়ে বই লিখবে—একি কম গৌরবের কথা? দেখতে দেখতে দাবাগ্নির মত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল বই লেখার প্রস্তাব। রোজ প্রায় দুশো করে চিঠি আসতে লাগল স্বের্ডলভস্কে। কোথাও বল্গাহরিণের পিঠে চড়ে, ট্রেনে, উড়োজাহাজে করে এমনকি পায়রার পায়ে বেঁধে এল সে সব চিঠি। যারা বই লিখবে সেই সব খুদে সাহিত্যিকরাও থলে বোঝাই চিঠি পাঠাতে লাগল। স্কুলের ছুটি হলে শয়ে শয়ে ছেলে তো হেঁটেই চলে এল স্বের্ডলভস্কে—সব কথা গুছিয়ে বল্‌তে। আস্তে আস্তে এবার হট্টগোলের ভেতর থেকে বইএর রূপ ঠিক হতে লাগল। তারপরে আরম্ভ হল মজার মজার কাহিনী খোঁজা, দু' বছর আগে ইকুর্টস্কের সাহিত্যিকরা যে লেখা ছেড়েছিল—তা আবার আরম্ভ করল স্বের্ডলভস্কের ছেলেরা।

বই লিখতে যাই দরকার হক না কেন আমরা তা করবই—এই ছিল তাদের বুলি তাদের বাধা দেয় কার সাধ্য! জনমানবের চিহ্নহীন তাইগা-র গহন অরণ্য, পাহাড়ে ভয়ঙ্কর পাগলাঝোরা। লক্ষ লক্ষ রক্তপিপাসু মশার কামড় কিছুই তাদের হতোদ্যম করতে পারে নি!

বাস্কিরিয়ান ছেলে সামিল কামালোভ চাইল "সালাভ ও উলাইয়েভ" সম্বন্ধে কিছু লিখতে তিনি ছিলেন ১৭৭৩-১৭৭৪ সালের বিখ্যাত চাষীবিদ্রোহের নেতা এমেলিয়ান ইগাচকের ডান হাত। উলাইয়েভ সম্বন্ধে তার জ্ঞানের মাত্রা হচ্ছে ক্লাশের বইএর প্রবন্ধটি। তাই সম্বল করে সে দুমাস ধরে বেরিয়ে পড়ল পায়ে হাঁটা পথে। উলাইয়েভ যে সব জায়গায় ছিলেন সেই সব জায়গায় সে গেল হাঁটতে হাঁটতে। বাস্কিরের একটা ছোট গ্রাম থেকে সে লিখল—প্রায় একমাস ধরে আমি হাটছি। একজোড়া জুতো এর মধ্যে ক্ষয়ে গেছে। আমার কিন্তু মন এতটুকুও দমে নি। এমন মজার লাগছে ছুটিটা! বুড়োদের ধরে ধরে কত মজার মজার গল্প শুনছি। বাড়ি ফিরে বাস্কিরের গৌরব সালাভাভ উলাইয়েভ সম্বন্ধে সামিল এক চমৎকার প্রবন্ধ লিখল।

শুধু সামিলই নয়! অনেকেই বেরিয়ে পড়ল এদিক সেদিক থেকে হাজারো রূপকথা যোগাড় করতে। বইটিতে একটী পুরো অধ্যায় লেখা হয়েছে এসব নিয়ে 'উরাল—সোনার

মাটি।'—তার নাম দেওয়া হয়েছে অতীত দিনের সত্যি কাহিনী। চৌদ্দ বছরের একজন ছেলে লিখেছে 'ইয়ের মাক' নামে একজন সেনাপতির কাহিনী। ভয়ংকর আইভানের যুগে তাগিদের তীরে তিনি সে যুগের ত্রাসসঞ্চারী তালগাটের সৈন্যদলকে হারিয়ে উরাল দখল করেছিলেন।

অতীতের রূপকথা শুনতে লাগে কবিতার মত। কিন্তু আজকের উরালের কাহিনীও কম কৌতূহল জাগায় না সবার মনে। পরের অধ্যায়গুলোতে রয়েছে সেই সব কথা। সোলিকামস্ক অঞ্চলে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পটাসের লবণ পাওয়া যায়। তার বর্ণনার পরেই পাঠক চলে আসবে একেবারে লাল বক্সাইটের কারখানায়। 'আগুনের দেশ' সেটা, সব কিছুই লাল—আগুনের শিখার মত। বাড়ী ঘর লাল, গাছপালা লাল—রাস্তাঘাট লাল—সূর্য্যের আলোয় চোখ ঝলসে যায় সে লালের বন্যায়! কয়েক পাতা পরেই আছে যে এই বক্সাইট থেকেই আমরা পাই পৃথিবীর সবচেয়ে হাল্কা ধাতু—এ্যালুমিনিয়ম। চারজন মিলে একটী প্রবন্ধে লিখেছে কি করে খাদের জল থেকে তামা বের করা হয়। আগুন পোহাতে পোহাতে দুজন ছেলের কথাচ্ছলে বলেছে কালো মাইকা ম্যাজিকের কথা। আগুনে পোড়ালেই কেমন করে ওটা কেঁপে ওঠে আবার একটু পরেই হয়ে যায় সোনালী। বড়দিনের সময় গাছ সাজাতে হলে কলো মাইকা না হলে চলেনা তাদের। লোকে কি করে প্লাটিনাম ধাতুর নাম শুনেছিল—কি করে যুগ যুগ ধরে কারিকররা মরকত মণিমুক্তা কাটতে শিখেছিল—সে সব কিছুই বাদ যায় নি।

এ সবের পরেই আছে এক মিউজিয়ামের বর্ণনা। ১৯২০ সালে লেনিনের পরামর্শে এটি স্থাপিত হয়েছিল ইলমেন পর্ব্বতের পাশেই। উরালে যা পাওয়া যায় এমন প্রায় দেড়শ ধাতু সংগ্রহ করা আছে এখানে।

শেষের অধ্যায়গুলোতে আছে মজার মজার গল্প। যেমন ধর "রোমাঞ্চক জীবনী", "এ্যাডভেঞ্চারের মুলুকে।" এতে উরালের খুদে সাহিত্যিকরা পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ানোর গল্প লিখেছে।

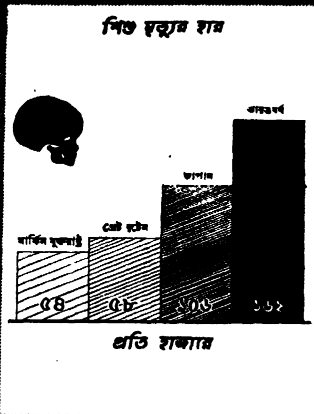
তের বছরের ভ্লাদিমির মস্কভ লিখেছে তার পোষা প্যাঁচার বাচ্চার হাসির কাহিনী। প্যাঁচাটার ধারণা ছিল যে বাড়ীর যত মুরগীর বাচ্চা যেন তার জন্য ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয় একদিন ভ্লাদিমিরের এক বন্ধুর পায়রার বাচ্চারও এই একই দুর্গতি হল। তখন বাধ্য হয়ে ভ্লাদিমির প্যাঁচাটাকে আবার আটকে রাখতে লাগল।

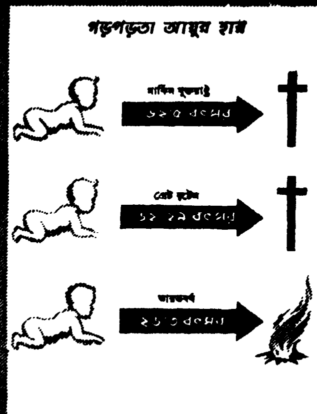
যারা এই দুটো লিখেছিল তারা সব আগের বই দুটোর লেখকদের এক বয়সী। কিন্তু তবু এদের লেখা হয়েছে ঢের ভাল। লেখার সঙ্গে এতে তাদের আঁকা অসংখ্য ছবিও আছে ঃ ফটো, ড্রয়িং, পেন্টিং সবই আছে। এমন কি ভাস্কর্য্যও বাদ নেই।

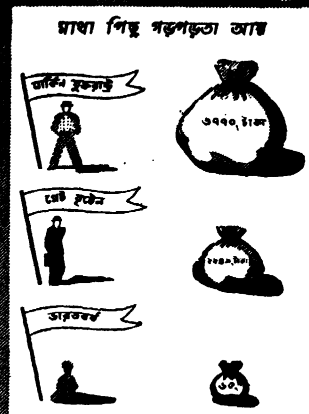
সোভিয়েট জার্মান যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বোঝা চেপে আছে উরালের ঘাড়ে। আগের যুগের সে বেপরোয়া জীবন আর নেই। ফ্যাসিস্টদের আক্রমণে জীবনের সব আনন্দ যেন উবে গেছে। কিন্তু উরালের ছোট ছেলেমেয়েরা দেশপ্রেম ভোলে নি। তারা হাজার মন লোহা যুগিয়েছে লালফৌজের গোলা তৈরী করতে।

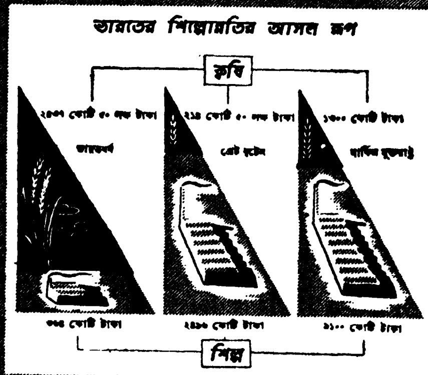
দেশপ্রেমের চরম স্বাক্ষর হচ্ছে তাদের সবাইএর লেখা বইটি "সোনার পৃথিবী" উরাল।

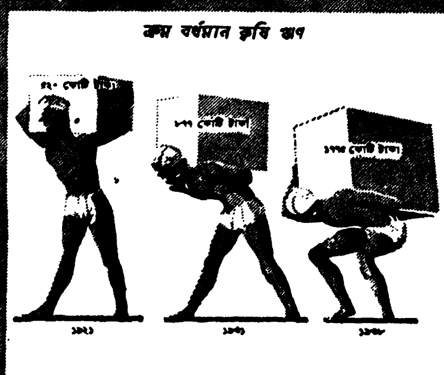
গিরীণ চক্রবর্ত্তী


শিশু মৃত্যুর হার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ্রেট বৃটেন
জাপান
ভারতবর্ষ
৫৪
৫৮
১৬২
প্রতি হাজারে


গড়পড়তা আয়ুর হার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ্রেট বৃটেন
ভারতবর্ষ


মাথা পিছু গড়পড়তা আয়
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ্রেট বৃটেন
ভারতবর্ষ


ভারতের শিল্পোন্নতির আসল রূপ
কৃষি
ভারতবর্ষ
গ্রেট বৃটেন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
শিল্প


ক্রম বর্ধমান কৃষি ঋণ

সোনার ভারত

সোনার ভারত

রূপকথায় আমরা অনেকেই এক "সোনার দেশের" কথা পড়েছি—সোনার পাহাড়, রূপার পাহাড়—তার পারে সেই "সোনার দেশ।" তার রাজভাণ্ডারে সোনার তাল, মণি মাণিক্য হীরা জহরতে ঝাঁপি বোঝাই। কিন্তু আমরা পড়ি—সেই সোনার দেশে মানুষ নেই, সব খালি। রাজপ্রাসাদে রাজা নেই, হাতীশালে হাতী নেই, ঘোড়াশালে ঘোড়া নেই, হাটবাজারে দোকান-পাট শূন্য। রাক্ষসের কবলে পড়ে সোনার দেশ হয়েছে শ্মশান।

এ কিন্তু রূপকথার গল্প নয়, এমন সোনার দেশের কথা আমরা জানি। কোথায় সে দেশ জানো? আকাশের মত উঁচু পাহাড়ের আড়ালে সে রাজ্য। অনন্ত সমুদ্রের পরীখা দিয়ে ঘেরা সে দেশ। প্রকাণ্ড সেই দেশ—যেন ছোট এক পৃথিবী। কত তাতে নদী, কত তাতে বন, কত পাহাড়, আর কত বা সমতল ভূমি! সে দেশের খনিতে সোনা, সে দেশের ক্ষেতে সোনা, সে দেশের বনে সোনা, সে দেশের মনে সোনা!

আরও কি জানো—সে দেশের মানুষ কত অদ্ভুত আর অসংখ্য? কোটি কোটি মানুষ তারা; পৃথিবীতে এত মানুষের দেশই আর বুঝি নেই! আর অদ্ভুতও তারা তেমনি—কেউ ক্ষেতে ফসল ফলায়, কেউ খনিতে কারখানায় খাটে, আবার কেউ থাকে বনের ধারে, কেউ পাহাড়ের গায়ে। কারো রঙ্ শ্যামলা, কারো রঙ্ গোরা; কারো কেশ মেঘবরণ, কারো কেশ পিঙ্গল; কারো চুল কুঞ্চিত, কারো চুল হালকা; কারো নাক খাঁড়ার মত খাড়া, কারো নাক চ্যাপ্টা; কারো মুখ গোল, কারো মুখ দীঘল;—এমনি কত বিচিত্র তারা দেখতে! আরও বিচিত্র তাদের পোষাক, বিচিত্র তাদের খাদ্য, বিচিত্র তাদের ধর্ম, বিচিত্র তাদের ভাষা আর জাতি। গোটা পৃথিবীর মানুষ যেন সেদেশে এসে ঠাঁই পেয়েছে—বলতে পেরেছে, "আমরা সকল মানুষই ভাই!"

কিন্তু সে দেশ তবু শ্মশান—সব উজাড় হয়ে গিয়েছে রাক্ষসের রাজত্বে—সোনার পাহাড়ের পাশে জমছে হাড়ের পাহাড়; রূপার নদীর সঙ্গে বইছে রক্তের নদী; কোটি কোটি মানুষের গলায় আঁটা দাসত্বের ফাঁস।

এই দেশের নাম ভারতবর্ষ—আমাদের সোনাকী হিন্দুস্তান। দেশ তো নয়—এ যেন এক মহাদেশ, এত বড় দেশ। রুশিয়া বাদ দিলে গোটা ইউরোপ এর সমান। আর জাতি তো নয়—আমরা এক মহাজাতি—পৃথিবীর প্রতি ৫ জন মানুষে একজন ভারতবাসী—শুধু কি তাই? কত বিচিত্র জাতির দেশ না এই ভারতবর্ষ!

মহাজাতির দেশ

এই তো আমরা বাঙালী এই ভারতবর্ষে হাজার বছর ধরে সুখে দুঃখে এক রকমে গড়ে উঠেছি, আমাদের ভাষা এক—বাঙলা ভাষা, আমাদের দেশ এক—বাঙলা দেশ; এক ধরণের কৃষিপ্রধান জীবন যাত্রায় আমরা জীবন কাটাই; চিন্তায়-ভাবনায়, সাহিত্যে-শিল্পেও আমরা এক—এ সবকেই বলে আমাদের "বাঙালী সংস্কৃতি।" এসব কারণে আমরা বাঙালীরা রাজনৈতিক হিসাবে এক "নেশন।" এমনি আর ১৭।১৮টি "নেশন" আছে ভারতবর্ষে। যেমন বাঙালী, অসমিয়া, ওড়িয়া, বিহারী, হিন্দুস্থানী, রাজস্থানী, পশ্চিম পাঞ্জাবী, মধ্য পাঞ্জাবী, কাশ্মিরী, পাঠান, বালুচি, সিন্ধী, গুজরাতী, মরাটী, তামিল, অন্ধ্র, কন্নড়ী, কেরলী ইত্যাদি। এ সব "নেশনকে" নিয়ে আমাদের "ভারতীয় মহাজাতি," এ যেন এক একান্নবর্তী পরিবার—সকলেরই স্বাধীনতা আছে। ছোট যদি চায় সে ভিন্ন হতে পারে, আবার বড় যদি জোর খাটাতে যায় তা হলে এই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাবে।

আমরা যেমন এক "মহাদেশের মানুষ", তেমনি আমরা এক মহাজাতির দেশ।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন

কিন্তু সোনার ভারত তবু শ্মশান—এ দেশেও শহরে সোনার পাহাড়ের পাশেই ফুটপাতে আজ মড়ার সার, সব গ্রামে সোনার ফসলের মধ্যেই কৃষকের হাড়; এদেশে মজুরের, কারীগরের, দোকানীর, পশারীর, পণ্ডিতের, পড়ুয়ার দেহে না আছে হাড় না আছে মাঁস, বুকে না আছে রক্ত, না আছে শক্তি।

কেন এমন হল? এখানে কি রাক্ষস এসেছে? না। রাক্ষস একালে আর আসে না—এ কালে বসে রাক্ষসের রাজত্ব! রাক্ষস দেশে এলে রাজ্য দেশ উজাড় করে চলে যেত। কিন্তু একালের রাক্ষুসে শাসনে কি হয় জানো? দেশে শাসকেরা চালায় শোষনের রাজত্ব; মুনাফার শিকার। বিদেশ থেকে তারা এসে চেপে বসে দেশে দেশের ধন দৌলত লুঠ করে গ্রাম বাজার দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সব দখল করে নেয়; আরম্ভ হয় মুনাফার শিকার। দেশের শিল্প বাণিজ্য তারা সব ধ্বংস করে, তাঁতশালে তখন তাঁত বন্ধ হয়, কুমোরের চাকও আর ঘুরতে চায় না। বিদেশের বণিকেরা তাদের মাল দিয়ে দেশের হাট-বাজার ছেয়ে ফেলে। তাঁতী, কামার, কুমোর সব ব্যবসা খুইয়ে কৃষিকাজ করতে লাগে, ভিড় জমে কৃষিতে। অত জমি কই? কৃষিরই কি আর সুদিন তখন থেকে? রাক্ষুসে শাসনে মুনাফার শিকার চলে সেখানেও অথচ কে করে কৃষির অবস্থার খোঁজ? সেকালের নদী নালা পুকুর বাঁধ হেঁজে মজে যায়, ফসলের ক্ষেত সেচ পায় না, সার পায় না, বীজ পায় না, ফসল কমতে থাকে। কৃষকের হাড় গুঁড়িয়ে খাজনা কুড়োয় রাক্ষুসে রাজত্বের দালালরা। দেশের সওদাগর বণিক তাদের ব্যবসা হারিয়ে জমিদারী মহাজনী করতে লাগে, রাক্ষসের দালালি না করে উপায় কি আর তাদের? ব্যবসা করবে? নতুন রকমের কল-কারখানা খুলবে? যন্ত্রপাতি বসাবে? না। এই রাক্ষুসে নিয়মে তা হবারও উপায় নেই। কল-কারখানা বিদেশীরাই একচেটিয়া করে রাখবে তাদের মুনাফা শিকার ছাড়বে কেন? আমাদের ক্ষেতের তুলোয় আমাদের কাপড় বুনব আমরা, আমাদের ক্ষেতের পাটে আমাদের চটকল চালাব আমরা, আমাদের খনির কয়লায় আমাদের কল আমরা চালাব; আমাদের চা-বাগানে

আমরা চায়ের চাষ করব,—কফি বাগানে কফি, রবারের ক্ষেতে রবার,—নদীর জলে জাহাজ, দেশের মাটিতে রেল আর মোটর, দেশের আকাশে বিমান আমরা আমাদের দেশে চালাব, লাখ লাখ ভাই-বোন আমাদের কাজ পাবে, কাজ করে কলে কারখানায়, খনিতে, সমুদ্রে—সাধ্য কি তার? বিদেশীর মুনাফার শিকারের আসল পথই হল এই। এ দেশে কল-কারখানা তারা গড়তে দেবে না, এই হল এই রাক্ষুসে শাসনের আর এক নিয়ম।

কিন্তু রাক্ষুসে শাসনের সব থেকে মারাত্মক নিয়ম কি জানো। তারা তো সংখ্যায় কম। রাক্ষুসে শাসনের ও মানুষ শোষণের কারবারে তারা এদেশ থেকেই দালাল জুটিয়ে নেয়। শিকারী বাঘ শিকার করে শেয়ালদের মড়া হরিণের এক আধখানা হাড় ছুঁড়ে দেয়; বিদেশী মুনাফা শিকারীরাও তাদের রাজত্বে তেমনি এই দেশী দালালদের এই মুনাফার ছিঁটে ফোঁটা দেয়—তারাই কেউ পায় ছোট বড় 'ইনাম,' রাজত্ব, কেউ পায় জমির দালালী, কেউ পায় ধর্মের দালালী পর্যন্ত। কেউ রাজা মহারাজা, জমিদার তালুকদার, কেউ বড় মোহান্ত নয় বড় মৌলভী! এ সব দালালদের দিয়েই দেশের মধ্যে বিদেশীরা বাড়িয়ে তোলে অনৈক্য, ভেদ-বিভেদ, কারণ দেশের মানুষ একত্র হলেই এই রাক্ষুসের রাজত্ব শেষ হয়ে যায়—ক'জন আর বিদেশীরা এ দেশে? সাধ্য কি তারা দেশের মানুষের এমন হাড়-মাস শুষে খায়। এদেশে ৪ হাজার জনে তারা মাত্র একজন। তাই তারা দেশের মধ্যেই অনেক "বিভীষণ" তৈরী করে এমনি লুঠের প্রসাদ দিয়ে। এই দালালপোষা নীতি হল সব চেয়ে মারাত্মক কৌশল। এ জন্য একে বলা উচিত "শয়তানী শাসন।"

এই 'রাক্ষুসে রাজত্বের' ও 'শয়তানী শাসনেরই' নাম "সাম্রাজ্যবাদ।" সাম্রাজ্যবাদই একালের 'রাক্ষস'। ৩ হাজার মাইল দূরের ৪৷৷০ কোটি মানুষের এক দ্বীপ, তার রক্তশোষক ধনীরাই এদেশের ৪০ কোটি দেশের মানুষের এমন রাক্ষুসে রাজা। তাদের এই রাজত্বেরই নাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে শোষণের রাজত্ব বসিয়েছে। তারই কৌশলে মুনাফার শিকারে বিদেশীর সঙ্গে দেশী দালালেরাও যোগ দেয়,—সোনার পাহাড়েরর কাছেই ওঠে রূপোর পাহাড়; আর সোনার ভারত শ্মশান হয়, মানুষের হাড়ের পাহাড়ও উঁচু হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

দেশের রূপ

দেশের দিকে তাকালে এ কথা এক মুহূর্তে বুঝতে পারা যায়। ভাসা ভাসা চোখে দেখলেও কিছু না কিছু দেশের এই রূপ চোখে পড়বেই।

প্রথমেই দেখি আয়ের হিসাব, কেননা আয় যেমন মানুষের অবস্থাই তেমনি হবে তো।

ভারতবর্ষের মানুষের আয়ের হিসাব নিলেই চমকে উঠতে হয়। পৃথিবীতে সভ্য দেশের মধ্যে এমন গরীবদেশ বুঝি আর নেই। মোটামুটি সবাই মনে করে, আমাদের মাথা পিছু আয় বৎসরে ৬২৲ থেকে এই যুদ্ধের সময়ে ৬৯৲ টাকা হয়ে থাকবে। অর্থাৎ আমাদের মাথা পিছু আয় এখন মাসে ৫৷৷০ টাকার উপর। কিন্তু ৬৲ টাকা নয়। অবশ্য শহরের মানুষের যা মাথা পিছু আয় গ্রামের মানুষের (শতকরা ৯০ জনই গ্রামের মানুষ) মাথা পিছু আয় তারও অর্ধেক, তা হয়ত গড়ে মাসে ৩৷০ টাকা হবে।

"রুজির" পরেই প্রথমে আসে "রুটির" কথা :

অনেক লোকই এদেশে অনাহারে মরে, তা তো জানিই। কিন্তু যারা খায় তারাই বা খায় কি? জেলখানার কয়েদিদের যে খাবার দেওয়া হয়, তাতে মানুষ কোনো রকমে বেঁচে থাকতে পারে—এই হল ডাক্তারদের মত। জেলে যাদের পরিশ্রম নেই সে কয়েদিরা কম খাবার পায়, যাদের পরিশ্রম বেশি তারা একটু বেশি খাবার পায় বাইরে যারা কলকারখানার শ্রমিক তারা গুরু পরিশ্রম করে, সাধারণ চাষীর থেকে তারা ভালো খায়। কিন্তু তবু এই কল-মজুরের খাদ্য জেলের বিনাশ্রম কয়েদির খাদ্যের থেকে নিকৃষ্ট, মোটের উপর মাসে শতকরা ৭।৮ সের কম। শুধু পরিমাণ নয়, পুষ্টিকর খাদ্যের দিক থেকে দেখলেও তাই দেখব। ডাক্তারদের মতে এই পুষ্টি বোঝা যায় 'কেলোরির' হিসাব থেকে বা খাদ্যের তাপসৃষ্টির হিসাব দিয়ে। কারণ শরীরের তাপ না থাকলে জোর থাকে না। ভারতবাসীর শরীরের পক্ষে মাথাপিছু ৩,০০০, কিংবা অন্তত ২,৮০০ কেলোরির খাদ্য না হলে নয়—এই হল ডাক্তারদের কথা। বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মাদ্রাজী কোনো শ্রমিকই সে খাদ্য পায় না।

ভাতের পরেই কাপড়ের কথা :

খাওয়া কমিয়েও মানুষের কিছু না কিছু পরতে হয় : মেয়েদের তো একটু বেশি কাপড়ই লাগে। যুদ্ধের আগে মানুষের মাথা পিছু কাপড় ব্যবহার ছিল কি, তাই দেখি। ১৯২৯এর বিভিন্ন দেশের হিসাব এই :

ভারত—১৬·১ বর্গগজ

জাপান—২১·০ বর্গগজ

মালয়—৩০·০ বর্গগজ

আমেরিকা—৬৪·০ বর্গগজ।

তারপর এখন ঘরদুয়ারের কথা :

মাথা গুঁজবার ঠাঁই অবশ্য সকলের নেই—শহরে অনেকে ফুটপাতে শোয়। তবু একটা কিছু ঘর দুয়ার চাই। সহরের বড় বড় প্রাসাদে হয়ত ঘরের পর ঘর খালিও পড়ে থাকে কিন্তু কলকাতার গরীবের বস্তি, মজুরের লাইন, বোম্বাই-র চৌল, মাদ্রাজের চের, কানপুরের মজুরমহল্লায় গেলে দেখব এক একটি ৫ কি ৬ হাত কাঠুরিতে ৫।৭ জন থেকে ১০।১২ জন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে, ছাগল মুর্গী নিয়ে থাকে। কোথায় কল কোথায় পাইখানা। গ্রামের চাষী গোলপাতার তালপাতার কোনো একটা ছাউনি পেলেই বেঁচে যায়। রেলে যেতেও কি পথের দুপাশে শহর গ্রাম আমরা দেখি না। শেষে উঠে স্বাস্থ্য—আয়ুর প্রশ্ন। যারা আধপেটা খায় ওরকম বস্তিতে থাকে, হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে—তাদের শরীরে থাকবে কি? তাদের রোগ হলেই বা চিকিৎসা হবে কোথা থেকে? আর বাঁচবেই বা তারা কতদিন এ রকম শরীর নিয়ে। দু'দশ জন ভালো খেয়ে পরে আছে, বাড়ি গাড়ি আছে, হয়ত বাঁচেও তারা বেশ। কিন্তু অধিকাংশই যেখানে রোগী, সেখানে দেশে তখন নোংরাও জমে, বড় লোকদেরও নানা রোগে ধরে, আর দেশের আয়ু কমে, মৃত্যু বাড়ে। তাই দেখি—গড়ে আমাদের আয়ু ২৩ বছর আর গড়ে বিলাতের মানুষের আয়ু প্রায় ৫৭ বৎসর। অনেকেই তো দেখি আমাদের বাপ দাদা পিতামহ, পিতামহী বেঁচে আছেন। তার অর্থ আরও অনেকেরই ছোট ভাই বড় দাদা, অনেক আগেই মরে গিয়েছে। কারণ আমাদের ১০০ জনের মধ্যে ৫ বছর না হতেই আবার মরে ৪৫ জন! হাজার করা প্রতি বছরে ১ বছর বয়স্ক কত শিশু মরে জানো? আমেরিকায় মরে ৪৮টি, ভারতবর্ষে ১৬৭টি। অবশ্য গরীবের শিশুরা মরে আরও বেশী—প্রায় দেড়গুণ।

রোগ তো লেগেই আছে। ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা, আমেশায়, টাইফয়েড, আর যক্ষা এ সব হল ভারতবাসীর বড় শত্রু। গরীবে ঔষধপত্র কিনতে বা ডাক্তার ডাকতেও পারে না। ডাক্তারই বা পাবে কই? গ্রামে অনেকখানেই ডাক্তার নেই; প্রতি ৯ হাজার লোকে ভারতবর্ষে ১জন ডাক্তার। তারাও পশারের দায়ে বড়লোক রোগীই চায়; গরীবকে দেখে কি হবে?

সুতরাং আসল কথা যা তা হচ্ছে এই—আমরা বাঁচিই না। মরার জন্য আমাদের যত তাড়া।

দেশের মানুষ

ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ জন লোকই গ্রামে থাকে। আরও শুনে থাকবে—আমাদের শতকরা ৭৪ জনই 'কৃষি নির্ভরশীল' 'কৃষিজীবী'; জানোই তো ক্রমে ক্রমেই দেশের লোক বাধ্য হয়ে বেশি বেশি কৃষিতে এসে জুটেছে। অথচ, 'শিল্পজীবী' বা কল-কারখানার কাজ করে মাত্র শতকরা ৫ জন বা ৪।।০ জন– এদের ও সংখ্যা কেন বাড়ছে না বরং কমেছে, তাও জানো। শতকরা ১৪ জন ব্যবসাপত্র, দোকান পশার, মাল চলাচলের কাজ করে। আরও ৭ জন ঘরের চাকর-বাকর, মালি, বেয়ারা। আর সরকারী চাক্‌রে, উকিল মোক্তার ডাক্তার মাষ্টার প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা কজন তারা, জানো? শতকরা মাত্র ৩ জন।

কিন্তু একথা জান্‌লেও বেশি কিছু বোঝা যায় না। "কৃষিজীবি" বা "কৃষির উপর নির্ভরশীল" বল্‌লে বর্ধমানের মহারজা ও ঢাকার নবাবের মত 'জমিদারদেরও' বোঝায় এবং ছোট বড় 'তালুকদারদের'ও বোঝায় এরা কেউ কৃষি কাজ করে না। আবার 'কৃষিজীবী বল্‌তে সত্যই যারা কৃষি কাজ' করে, নিজের হাতে নিজের জমি চাষ করে, তেমন ছোট ও মধ্যম "কৃষকদেরও বোঝায়; যারা জন খাটিয়ে বা বর্গা দিয়ে জমি চাষ করে এমন বড় বড় জোতদারদের বোঝায়; আবার বোঝায় সেই গরীবদেরও যাদের জমি নেই, হয়ত তারা পরের জমিতে বর্গাদার কিংবা পরের জমিতে ক্ষেতমজুর মাত্র। শিল্পজীবী বলতেও তেমনি বোঝায় টাটা বিড়লা ইস্পাহানীদের মত কারখানার মালিকদের। বোঝায় টাটাদের স্যার আদ্রেশির, মাসানিদের মত ম্যানেজার ইঞ্জিনীয়ারদের; আবার বোঝায় তাদের কল-কারখানার গরীব মিস্ত্রী ও মজুরদেরও। তা হলে সকল কৃষিজীবি ও সকল শিল্পজীবির অবস্থা একরূপ নয়। কারণ তাদের সকলের আয় এক নয়।

পরিবর্দ্ধিত আয়ের এই উঁচু নিচু তফাৎ কি রকমের তার একটা মোটামুটি হিসাব ছিল যুদ্ধের আগে (এপ্রিল, ১৯৩৯এ) এরূপঃ

এ দেশের ৬ হাজার পরিবারের আয় বছরে ১ লক্ষ টাকা বা তার বেশী
„ ২ লক্ষ ৭০ হাজার „ „ গড়ে ৫ হাজার টাকা
„ ২ „ ৫০ „ „ „ „ ১ „ „
„ ৩ কোটি ৫০ লক্ষ „ „ „ „ ২০০ টাকা
„ বাদবাকী সকল „ „ „ „ মাত্র ৫০ টাকা বা তার কম।

এই সব ধাপ থেকে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা আমরা বুঝতে পারি। মোটামুটি এ দেশের মানুষ তিনটি প্রধান শ্রেণীতে পড়েঃ

আয়ের উচ্চতম স্তরে হল "উচ্চশ্রেণী" সকলের চূড়ায় বসে আছে "দেশী" রাজা-রাজড়ারা; তাদের

দলেই অন্ত বিত্তবান্ মালিকেরা। সব শুদ্ধ এরা মাত্র ২০।২৫ লক্ষ বড় লোক—জমিদার, মহাজন প্রভৃতি "কৃষিজীবী" এবং খুব অল্প কয়েকজন কল-কারখানার ব্যবসাপত্রের মালিক, "শিল্পীজীবী", এদেরই বলা হয়—"কায়েমি স্বার্থ।"

"মধ্যবিত্ত শ্রেণীর" স্থানটা হল মধ্যস্তরে। প্রায় দেড় কোটি লোক এ স্তরে আছে; যেমন, তালুকদার, জোতদার প্রভৃতি জমির স্বত্বভোগী; দোকানী পশারী প্রভৃতি ব্যবসায়ী; হাকিম, উকিল, ডাক্তার, মাষ্টার, কর্মচারী, কেরাণী প্রভৃতি চাকরে ও নানা 'ভদ্র' পেশার 'বুদ্ধিজীবী' ভদ্রলোক; আর কল কারখানার ম্যানেজার, কর্মচারী, ওস্তাদ কারিগর, মিস্ত্রি, মাঝারি আয়ের ইঞ্জিনীয়ার, টেকনিশিয়ান প্রভৃতি "শিল্পিজীবী" চাকরে। এদের পরস্পরের মধ্যে আয়ের ও অবস্থার তারতম্য যথেষ্ট; সে অনুসারে আবার অভ্যন্তরীণ স্তর-বিভাগও হয়; যেমন উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবর্তী মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত।

সকলের নিচের স্তরে নানা গরীবেরা—তাকেই বলে 'নিম্ন শ্রেণী'। আসলে এই স্তরই হল "জনতার স্তর"। এ দলেই পড়ে কোটি কোটি গরীব "শিল্পজীবী" ও "কৃষিজীবী।" তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য অবশ্য শ্রমিকেরা বা কল-মজুরেরা। এই "শ্রমিক শ্রেণী" হল "বিত্তহীন শ্রেণী"ঃ পরিশ্রমই হল এদের একমাত্র সম্বল। এদের মতই শ্রমজীবী ও গরীব বলে এই নিম্নস্তরে পড়ে গ্রামের গরীবেরা—যেমন ৭ কোটি গরীব কৃষক, আর পুরনো আমলের তাঁতী, মাঝি, কামার, কুমোর, মিস্ত্রি প্রভৃতি, এবং নতুন আমলের নানা শিল্পের গরীব মিস্ত্রী, কারিগর, বিড়িওয়ালা, ফেরিওয়ালা, রিক্‌সওয়ালা, মোটরের ড্রাইভার, কন্‌ডাক্‌টার প্রভৃতি। এরাই দেশের পনের আনা লোক—এরাই আসলে "দেশের মানুষ।" এরাই পরিশ্রম করে ফসল ফলায়, কলে মাল তৈরী করে, খনি থেকে কয়লা তোলে, যান বাহন চালায়, এক কথায় এরাই "উৎপাদক শ্রেণী", এরাই সৃষ্টি করে, এরাই জোগায়। তাই সত্যকারের "দেশ সেবক" এরাই; অন্যেরা তো আসলে "দেশ-শোষক"—দেশকে কিছুই তারা দেয় না, দেশ থেকে কেবল শুষে নেয়। দেশের স্বার্থও আসলে তাই দেখ। এই উৎপাদক-শ্রেণীর কিসে ভালো হয়, কর্ম্মশক্তি ও শ্রমশক্তি বাড়ে। দেশের স্বার্থ কথাটা শুন্‌লেই বিচার করে দেখা দরকার এই শতকরা ৯৫ জন শ্রমিকের, কৃষকের, কারিগরের এবং বাকী ৩ জন শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীর তাতে কি লাভ, কি ক্ষতি। কারণ, এরাই তো আসলে দেশ; এরাই দেশের আসল শক্তি 'জনশক্তি'। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বড় লোকর তো রাক্ষুসে শাসনের দালাল, দেশের পীড়ক আর শোষক।

"দেশী" রাজা ও দেশী প্রজা

এই পীড়নের ও শোষণের রাজত্ব সব চেয়ে বেশী চলেছে ভারতবর্ষের কোন অংশে জানো? সে অংশ হচ্ছে "দেশী" রাজ্য, "দালাল রাজাদের" রাজত্ব।

বাঙলা দেশে দেশী রাজ্যের কথা আমরা বেশি শুনি না। গোটা ভারতবর্ষের কিন্তু ছ আনা অংশ জুড়েই দেশী রাজ্য। আমরা শুনি কোচবিহার, ত্রিপুরার নাম; বড় জোর মনে করি মণিপুর, ভূটান ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি দেশী রাজ্যের নাম। তা' ছাড়া খবরের কাগজে মাঝে মাঝে অন্য রাজাদের কথাও পড়ি। যেমন এখন শুনি কাশ্মীরে সমস্ত কাশ্মীরী শেখ আবদুল্লার নেতৃত্ব "ডোগ্‌রা রাজের" বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, মধ্য ভারতের ছোট্ট রাজ্যে রতলামে আর একবার প্রজাদের বিরুদ্ধে গুলি চলেছে। পাঞ্জাবের ফরিদকোটের রাজা কদিন আগে পণ্ডিত জওরলালকে গ্রেফ্‌তার করে বসল। গোয়ালিয়রের দরবার জানুয়ারী

মাসে বিড়লাজীর কলের সামনে তার ধর্মঘটী মজুরদের 'রক্তগঙ্গা' বইয়ে দিল। হায়দরাবাদের নিজামের রাজ্যে প্রজা সমিতি বে-আইনী; পদ্মজা নাইডু জানিয়েছেন মেয়েদের উপরও চলেছে অত্যাচার; তবু কথনো সেথানে মুখ খুলবার কারও সাধ্য নেই; অন্য দিকে ৭৮ খানা গাঁয়ের মানুষ খাজনা বন্ধ করে দিয়েছে। বড়োদার গাইকবাড় বিলাতে বসে বসে ঘোরদৌড়ের নতুন ঘোড়া কিনছেন লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে; ইন্দোরের রাজা আমেরিকায় নতুন কাকে বিয়ে করেছেন বা তালাক দিয়েছেন। ছোট, বড়, মেজো, সেজো, নানা শ্রেণীর এরূপ সাড়ে পাঁচ শ "দেশী" রাজার রাজত্বের মোটামুটি অবস্থাটা এসব থেকেই বুঝতে পারি। তবু তো মৈশুর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, হায়দরাবাদ, বরোদা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভুপাল এসব হচ্ছে উন্নতিকামী রাজ্য। বাদবাকী অধিকাংশ রাজ্যের অবস্থা তা হলে কি? সেথানে পুরনো হালে পাত্রমিত্র সামন্ত আর বাঁদী-বেগম বাঈজী নিয়ে ডুবে থাকে রাজবাহাদুর; আর তারা কেউ কেউ আবার তার সঙ্গে বিলিতী উপসর্গও জুটিয়ে নেয়। বিলাতী থানাপিনা, ঘোড়া, কুকুর, সাহেব, মেম, ইয়ার, জুয়াড়ী নিয়ে বিলাতেই আডডা গাড়ে—রাজ্যের টাকা ওড়ায়। তবু তারাই আবার ধর্মরাজ। আসলে ধর্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। বড় রাজারাও কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, দু চার জন শিখও। আর প্রজাদের মধ্যে দেশী রাজ্যের ১০০টি প্রজার ৭৮টি হিন্দু, ১৪ জন মুসলমান—বাকী কিছু শিখ ও কিছু সেই আদিম জাতির সরল মানুষ।

এসব রাজ্যের শাসনটা কেমন করে চলে? প্রত্যেক বড় রাজ্যে আছে একজন ব্রিটিশ "রেসিডেণ্ট"। ছোট রাজাদের 'জোট' বেঁধে তার উপরে রাখা হয় একজন করে ব্রিটিশ "এজেণ্ট", আসলে এরাই হল শাসনকর্তা, "দেশী" রাজ্যের রাজারা দালাল মাত্র। এরা দেখে, রাজ্যটা যেন সাম্রাজ্যবাদের গোলামথানা হয়ে থাকে। তা থাক্‌লে রাজাই হল রাজ্যের সর্বেসর্বা, প্রজাদের 'দণ্ডমুণ্ডের কর্তা'; অধিকাংশ জায়গায় রাজ্যের রাজস্ব থেকে প্রজাদের ধনপ্রাণ সবেরই মালিক রাজা। শুনেছ বোধ হয় পৃথিবীর সব থেকে বড় ধনী মানুষ নাকি নিজাম বাহাদুর! হবেই তো। 'দেশী' রাজ্যের যা আয় তা রাজারই প্রায় খাস তহবিলে যায়। যেমন ধরো ব্রিটেনের রাজা মোট রাজস্বের ১,৬০০৲ টাকায় ১৲ টাকা নিয়ে খরচ চালায়, ইতালির রাজা (ইতালি প্রায় হায়দরাবাদের মতই বড়) রাজস্বের ৫০০৲ টাকায় ১৲ টাকা দিয়ে চালাত, জাপানের সম্রাট নিত আরও বেশি, ৪০০৲ টাকায় ১৲ টাকা। কিন্তু নিজাম বাহাদুরের ও গাইকবাড়ের দরকার হয় ১৫৲ টাকায় ১৲ টাকা (অর্থাৎ ইতালির রাজার তুলনায় প্রায় ৩০ গুণ) কাশ্মীর, বিকানীরের ৫৲ টাকার ২৲ টাকাই রাজাদের খাশতহবিলে যায়। ত্রিবাঙ্কুরের দরবার পায় সব চেয়ে কম, ১৭৲ টাকায় ১৲। অবশ্য, এসব খাতাপত্রের জানাশোনা হিসাব—তা ছাড়াও যেমন খুশী রাজ্যের টাকা 'দেশী' রাজারা নানা ভাবে নেয়ই। প্রজাদের ভাগ্যে তা হলে জোটে কি? শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসার জন্য কি তারা পায়? এ কথাটা বুঝবার মত, কারণ আমাদের প্রত্যেক ৪ জন ভারতবাসীর মধ্যে ১টি ভাই এই দেশী রাজ্যের প্রজা—তার কথা আমরা ভুলেই যাই।

দেশী রাজ্যের প্রজা মানে কি, জানো? হয়ত সে আদিবাসী ক্রীতদাস। কারণ কোনো কোনো রাজ্যে দাসপ্রথা এথনো আছে। কিংবা হয়তো সে ক্ষেতের চাষী, কিন্তু জমিতে তার দাবী নেই; ফসল তার কেড়ে নেয় জায়গীরদার, বা সামন্ত বা সর্দার-একজনের পর একজন—রাজা পর্যন্ত। কিংবা সে "সাধারণ প্রজা" 'রাজ্যের' কাজে বেত খেতে খেতে "বেগার" খাটছে, সে ৬০ বছরের বুড়ীই হোক্ কি ৭ বছরের শিশুই হোক্। যত খুসী তার উপরে খাজনা কিংবা ট্যাক্স বসাবে রাজা, যেভাবে খুশী তা আদায়ও করবে। যথন খুশী

তাকে জেলে পুরবে, যতদিন খুশী তাকে জেলে রাখবে—হোক্ সে যত বড় জ্ঞানী বা মানী লোক। সে সাধারণের সভা করতে পারবে না, সমিতি স্থাপন করতে পারবে না, খবরের কাগজও বের করতে পারবে না। আর ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন? সে প্রশ্নই ওঠেনা। মৈশুরে তার একটু সামান্য চেষ্টা আছে। লোক ভুলানোর জন্য হায়দরাবাদে, কাশ্মিরে, বরোদায়, ত্রিবাঙ্কুরে, কোচিনেও সেরূপ ঠাট আছে, আসলে 'আইন সভা'র কোনো আইন করবার ক্ষমতা নেই। অন্যান্য দেশী রাজ্যে 'দেশের মানুষের' কোনো নামগন্ধও নেই।

জমিদার ও মহাজন

"দেশী" রাজাদের পরেই সাম্রাজ্যবাদের বড় দালাল হল এদেশের জমিদার, মহাজন প্রভৃতি। তারা খাজনা আদায়কারী, জমির "খাজনা-ভোগী"। কিছুই তাদের করতে হয় না, কেবল সরকারকে তারা 'রাজস্ব' জোগায়, আর সেই রাজস্ব বাবদ প্রজাদের মেরে-কেটে আদায় করে অনেকগুণ বেশি খাজনা ও বে-আইনী পাওনা। এ কাজটাও বাঙলা দেশে আবার জমিদারেরা প্রায়ই নিজেরা করে না। জমিদারেরা হয়ত বরাদ্দ দেয় তালুকদার বা পত্তনিদারের উপর; পত্তনিদার বরাদ্দ দেয় দর-পত্তনিদারের উপর; দর-পত্তনিদার সে-পত্তনিদারের উপর—এমনি করে হয়ত নিচেকার আসল চাষী ও উপরের জমিদারের মধ্যে তৈরী হয় গোটা কুড়ি "মধ্যস্বত্বের" ধাপ। সেই 'মধ্যস্বত্ববান্‌রা' অনেকেই চাষের নামগন্ধ জানে না; জমিদার তো প্রায়ই চোখেই দেখে না তার জমিদারী। তবু তারাই জমির মালিক হয়, খাজনা ভোগ করে। যে চাষী চাষ করে তার হয়ত জমির উপরও দাবী নেই, ফসলের উপরও পুরো মালিকানা থাকে না। জমির উপরেই বা তাহলে তার কি দরদ থাক্‌বে; কৃষিরই বা কি উন্নতি হবে?

এ ব্যবস্থা ইংরেজ প্রচলন করেছিল ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে। ইংরেজ রাজা হয়ে খুব চড়া হারে রাজস্ব ধার্য করে। তা আদায় করবার জন্য তারা তখন জমিদারী বন্দোবস্ত দেয় তাদের কুঠির মুন্সি, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি-নানা দালালদের। চুক্তি ছিল, তারা বরাবর মত তখন থেকে জমির মালিক হবে, বছরে মোট প্রায় ৩ কোটি টাকা তারা "রাজস্ব" জোগাবে,—এ "রাজস্ব" আর বাড়বে না, হবে "চিরস্থায়ী"। আর এই দালালি বাবদ জমিদাররা আরও মোট ৩০ লক্ষ টাকা প্রজাদের থেকে খাজনা আদায় করবে। জমিদারের এই আয় কিন্তু বাড়তে পারবে। সে আয় বাড়তেও লাগ্‌ল। আজ বাঙলা দেশের জমিদাররা আদায় করে কম পক্ষে ১৬॥০ কোটি টাকা, নজরানা, দস্তরির কথা ছেড়ে দিলেও। অর্থাৎ বাঙলা দেশের ১ একর (প্রায় ৩বিঘা) চাষের জমিতে সরকারের 'রাজস্ব' যদি হয় ১৷০, কৃষকের থেকে তাহলেও আদায় হয় ৬৸৶০। এত উঁচু হারে খাজনা জোগাতে পারে না বলে কৃষক মহাজনের কাছে জমি বন্ধক দেয়, আর শেষে একেবারে জমি খোয়ায়। দ্বিতীয় এক রকমের জমিদারী প্রথা আছে তা সাময়িক। কয়েক বছর পরে পরে সাম্‌নেকার ক' বৎসরের মত সরকার এরূপ বন্দোবস্ত করে জমিদারদের সঙ্গে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় সরকারেরও রাজস্বও বাড়ে, জমিদারেরও আদায় বাড়ে, মরে কেবল চাষী! অযোধ্যার তালুকদারেরা, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইএর অনেক মালগুজার, পাঞ্জাবের অনেক 'মালিক' এরূপ 'অস্থায়ী' জমিদার।

জমির তৃতীয় আর এক রকমের বন্দোবস্তও আছে। সে বন্দোবস্তও সাময়িক। তবে তাতে জমিদার নেই, সরকার সরাসরি বন্দোবস্ত করে রায়তদের সঙ্গে। আসামে, বোম্বাইতে, মাদ্রাজে, এরূপ বন্দোবস্তই

হয়েছে। রায়তের সঙ্গে কয়েক বছরের মত চুক্তি হয়। তারপর নতুন চুক্তিতে আরও খাজনা বাড়ে। একে বলে রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত কিন্তু সেসব জমিরও পাঁচ আনা আজ সেসব দালালরাই দখল করে বসেছে, যাদের আমরা বাংলায় বলি মহাজন। সেখানে 'চাষী' আর সত্যই মালিক নয়।

ভারতবর্ষে কৃষকের শোষক হল মোটামুটি এই তিন দল: *প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদী সরকার,* তার রাজস্বের চাপেই কৃষকের প্রাণ বেরিয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ নানা রকমের জমির মালিক—"জমিদার," "তালুকদার," "মালগুজার", "মধ্যস্বত্ববান্" "খাজনা-ভোগী,"—তাদের চাপ আরও বেশি। তৃতীয়ত, ছোট বড় নানা মহাজন সাউকার;—কোথাও কোথাও আবার জমিদাররাই হয় এরূপ মহাজন। মহাজনদের সুদের হার সর্বনাশী, টাকায় এক আনা থেকে তা টাকায় আট আনা পর্যন্ত যা খুশি হয়, চক্রবৃদ্ধি হারে তা বাড়ে। বছর ১৫ পূর্বে (১৯৩৭) মনে হয়েছিল—ভারতবর্ষের কৃষকদের মোট ঋণ হবে প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা, এখন ধরা হয় প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা, বাঙলা দেশের কৃষকের ঋণের পরিমাণ (১৯২৯এ) অনুমান করা হয়েছিল প্রায় ১০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ যা দেশের বছরের ফসল তার মোট দাম যা তার থেকেও বেশি হল এই ঋণের পরিমাণ। তা হলে তা শোধ হবে কি করে? এরপরে তো জমিদারের খাজনা, সরকারের রাজস্ব আর চাষীর খাওয়া-পরা।

কৃষক

গত দশ বছরে অনেক প্রদেশেই এই মহাজন ও সাউকারদের হাত থেকে কৃষককে বাঁচাবার নামে নানা আইন পাশ হয়েছে। তাতে গরীব কৃষকের যতটা লাভ না হোক্ লাভ হয়েছে বড় কৃষকের আর খাজনা-ভোগীদের—তারাই সেই জমি হাত করেছে, মহাজনদেরও ঠকিয়েছে। কারণ, কৃষক ঋণ না পেলে চাষই করতে পারে না; জমি তখন সে ছেড়ে দেয়। মহাজনের হাতে না গিয়ে সে জমি যায় বাংলা দেশে জোতদারদের কাছে অথবা অ-কৃষক খাজনাভোগীর হাতে।

এই জোতদাররা হচ্ছে বড় বড় 'কৃষক'। বাংলা দেশে নিজেদের তারা বলে 'কৃষকপ্রজা'। রুশিয়ায় তাদেরই এককালে বল্‌ত 'কুলাক,' আসলে এরা হচ্ছে 'কৃষক-খেকো' কৃষক। ভারতবর্ষে অন্যত্রও তারা আছে। ১০০ বিঘার উপরে যাদের জমি তাদেরই বল্‌তে পারি এ স্তরের কৃষক। অনেকের হাতে ১০।১৫ হাজার বিঘা জমিও আছে। ক্রমে জমির খানিকটা তারা হয়ত চাষ করে; খানিকটা বর্গা দেয়; খানিকটা হয়ত ক্ষেতমজুর দিয়ে চাষ করে। 'বর্গাদার' আর 'ক্ষেতমজুর' হচ্ছে ভূমিহীন চাষী।

বাংলাদেশের প্রায় তিন আনা জমি বর্গা চাষে আছে, বর্গাদারই পরিশ্রম করে ফসল করে; জোতদার বসে বসে পুরো ফসলের অর্ধেকটা নেয়। অথচ চাষের খরচপত্র দিয়ে বর্গাদারের ভাগ্যে মোট ফসলের সিকি ভাগও জোটে না। তারা তা হলে খায় কি? পরে কি?

শতকরা অন্তত ১০জন কৃষিজীবী ছিল বর্গাদার। এখন হয়ত তাদের সংখ্যা আরও বেড়েছে। দুর্ভিক্ষে তারাই মরেছে বেশি। তখন তাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৮ জন। ক্ষেতমজুরের অবস্থা কিন্তু আরও ভয়ঙ্কর। যুদ্ধের কাজের চাহিদায় তার মজুরী এক-একখানে বেশ বেড়েছিল—কিন্তু তখন খাদ্যের অভাবে তার পরিবার মরত। আর যুদ্ধের আগে তার মজুরী ছিল ৵০ বা ৵১০ পয়সা আর এক বেলার খোরাকী। দুর্ভিক্ষে তারাও মরেছে হাজারে হাজারে।

কিন্তু বাংলার সাধারণ ভূমিবান্ কৃষক কি নেই? নিশ্চয়ই আছে। এক সময়ে (জোতদারদের নিয়ে) এই ভূমিবান্ কৃষকরাই ছিল শতকরা ৬০ জন কৃষিজীবী। আজ তাদের মধ্যেকার গরীব কৃষকদের জমি গিয়ে পড়েছে জোতদারদের হাতে। মাঝারি কৃষকও অনেকে হয়েছে গরীব কৃষক। আর দুর্ভিক্ষে গরীবেরা আবার মরেছেও। 'ক্ষেতমজুর,' 'বর্গাদার' ও এই গরীব কৃষকদের নিয়ে বলা যায় বাংলার শতকরা ৫১ জন চাষীর হাতে এখন জমি নেই, অথবা সে জমি বাঁচবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ৫ জনের কৃষক পরিবারের খোর-পোষের জন্য ১৫ বিঘা জমি নাকি দরকার। এদের ১০ বিঘা জমিও নেই। জোতদারদের অনেকের হয়ত ২ হাজার বিঘাও আছে।

অবস্থাটা আরও পরিষ্কার হবে বললে যে বাংলাদেশে ৬লক্ষ খাজনাভোগীদের ৫ লক্ষের আসলে জমি থেকে মাসিক আয় মাত্র ১২॥০ টাকা। আসলে ৫০ হাজারই মোট খাজনাভোগী। তার‌ও মধ্যে বর্ধমান ময়মনসিংহ ও কাশীমবাজার প্রভৃতি ৯টি পরিবার বাংলার ৫আনি জমির মালিক। তারা রাজস্ব দের ১কোটি টাকা, নীট মুনাফা রাখে ৩ কোটি টাকা—মাথা পিছু তাদের আয় ২ লক্ষ ২॥ লক্ষ। আর তাদের চাষীদের আয় ৪৩৲ টাকা। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে এই ৪৩৲ টাকা থেকেই সে তার জমিদার, জোতদারের মত সমান হারে নুনের, তামাকের ট্যাক্স দেয়, চড়া দরে দেশলাই কাপড় কেনে!

গ্রামের গরীব

তা হলে কৃষক বাঁচে কি করে? বাঁচে না, এইটাই সত্য কথা। তবু বাঁচতে চেষ্টা করে প্রাণপণে. এটাও তেমনি সত্য কথা। কৃষক পরিবারের ছোট-বড় মেয়ে পুরুষ সবাই পথ খোঁজে কি করে দু'মুঠো খাবার জুটবে, কি করে কিছু রোজগার বাড়বে? তারা ছাগল, গরু, হাঁস, মুর্গী পালে। সময় পেলেই হোগলা, মাদুর, ডালা, ধামা বোনে, 'মুচি হলে চামড়া সাফ করে, ধোপা হলে কাপড়-চোপড় ধোয়, মিস্ত্রী হলে কাঠের কাজ করে, ঘরামোর কাজ করে, মাঝি হয়, গরুর গাড়ী চালায়। মেয়েরা বাড়ি বাড়ি ধান ভানে, ধানকল থাকলে কাজ করে, সুতো কাটে, মানে গ্রামের পুরনো ব্যবসা, বৃত্তি, কারিগরী যা কিছু পায়, তাই আঁকড়ে ধরতে চায়।

কিন্তু এ সবে কি হবে? আমরা তো জানি—দেশের শিল্পী ও কারিগরদের মেরেই সাম্রাজ্যবাদ তার আসন গেড়েছে। সে সব কারিগররাই বরং লাখে লাখে কৃষক হয়ে গিয়েছে। তাই কৃষক আবার এ সব শিক্ষা, কারিগরী, যানবাহনের কাজে কি পাবে? বিশেষ কিছু পায় না। গ্রামের গরীবদেরও আজ বাঁচবার পথ নেই।

যারা গ্রামে থাকে প্রাণের দায়ে তারাও ক্রমে বোঝে তাদের সংগঠিত না হলে পথ থাক্‌বে না। তাদের নিজেদের দাবীদাওয়া নিয়ে লড়াই না করলে বাঁচা সম্ভব হবে না। তাই এদেশে কৃষক সমিতি এই গরীব কৃষক গ্রামের গরীবদের নিয়ে গড়ে উঠছে। তারা ভাত কাপড়ের লড়াই চায়—সাম্রাজ্যবাদীর শোষণ ঠেলে ফেলে বাঁচতে চায়।

তবু তো এত মানুষের পোষণ কৃষিকাজে সম্ভব নয়। যারা একটু উদ্যোগী তারা এ কথা বুঝে বা না বুঝে শহরে গঞ্জে কাজ খোঁজে, বোম্বাই-কলকাতায় যায় কলের মজুর হতে—নাম মাত্র মজুরি দিয়েই কলের মালিকরা পায় তাদের দেহ জল-করা মেহনৎ।

শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও বণিক-ব্যাপারী

আমরা সবাই জানি—এ যুগটা হচ্ছে শিল্পের যুগ।

কিন্তু গোড়ার কথাটা আমাদের আরও বেশি করে মনে রাখা দরকার: সাম্রাজ্যবাদের নীতি হল পরের দেশের শিল্প ধ্বংস করা—একশ বছর চলে আমাদের পুরনো শিল্প ধ্বংসের কাজ। তারপরে ৬০ বছর চলে ব্রিটেনের একচেটিয়া মুনাফা শিকার—কল-কারখানা সবই তাদের, চা-বাগান, কয়লার খনি সব তাদের একচেটিয়া। আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল তখন বিলাতী মালের ব্যবসা করাতে, আর দেশী কাঁচামালের ফড়েগিরি করা। ১৯০৫এ বাংলা দেশের "স্বদেশী" ব্যবসা দাঁড়াতে পারল না। তারপরে বাঁধ্‌ল প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪)। সে সুযোগে আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্য দেশী বনিকেরা, মহাজনরা কিছু কিছু গড়ল (১৯২১-৬)—কিছু কিছু স্বদেশী পুঁজিপতি, শিল্পপতিও হল। কিন্তু সে যুদ্ধের মুনাফার স্বাদ পেয়ে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরাই এ দেশে তখন কারখানা ফাঁদতে লাগ্‌ল। তারা ফেঁপে উঠ্‌তে লাগল আরও বেশি, দেশী মালিকেরা তবু স্বদেশীর জোরে বাড়তে লাগ্‌ল। ১৯৩১-৭ ব্যবসায়ে মন্দা এল, আমাদের দেশের শেষ সোনা, দানা পর্যন্ত চালান গেল—প্রায় ৩১৫ কোটি টাকার সোনা তখন শেষ হল। তারপরে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বে দেশী মালিকের সুবিধা হল। এল এই যুদ্ধ। তখন মানুষ-মেরে আমাদের নামে বিলাতের খাতায় প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা জমা হয়েছে। আমাদের শিল্পপতিরা এখন সেই টাকাটার লোভেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করবার পথ খুঁজছে। কিন্তু এই যুদ্ধ কালে কি আমাদের দেশে শিল্প-বাণিজ্য বেড়েছে? আমরা হয়ত দেখছি যুদ্ধের কত বড় বড় কারখানা, রেলের ওয়ার্কশপে কত ভিড়, 'কৃষ্ণডেল্ট টাউন', 'ওয়াশিংটন টাউন'; মোটরের বিমানের কারখানা, ঘাঁটি, মেরামতের ওয়ার্কশপ, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা জানি, যুদ্ধকালে আমাদের দেশে শিল্পের যন্ত্রপাতি আনানো নিষেধ হয়ে গিয়েছিল, এখনো যন্ত্রপাতি আস্‌ছে না। এ যুদ্ধে মার্কিন মুলুকের যন্ত্রপাতি দেড়গুণ হয়েছে; বোমা খেয়ে খেয়েও ব্রিটেনের সোয়াগুণ হয়েছে কিন্তু আমাদের পুরনো যন্ত্রপাতি শুধু ক্ষয়ই হয়েছে, কিছুই বাড়েনি যন্ত্রপাতি না বাড়লে কল কারখানা বাড়ে কি করে? তাই যুদ্ধ শেষ হতেই এ দেশের নানা কারখানা আফিস বন্ধ হয়েছে, প্রায় ৭০ লক্ষ শ্রমিক ও কর্মচারী বেকার হয়ে পড়েছে।

তা ছাড়া, আধুনিক শিল্পের দিক থেকে দেখলে আমাদের দেশের শিল্প ব্যবস্থার এখনো বনিয়াদই নেই। "গুরু শিল্প" অর্থাৎ ভারী রাসায়নিকের কারখানা আর যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা না তৈরী করলে শিল্পের বনিয়াদই গঠন হয় না। সে সব কারখানা ভারতবর্ষে এখনো স্থাপিত হয় নি।

এমন কি, এই যুদ্ধকালেও আমাদের শিল্পের মোট উৎপাদন পর্যন্ত বাড়েনি, বরং একটু কমেছে। যুদ্ধের মাল হয়ত তখন ৪।৫ গুণ তৈরী হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য মালের কারখানা আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কয়লা নেই; বিদ্যুৎশক্তি কলগুলি বেশী পেত না বলে চটকলে সুতাকলে পর্যন্ত তখন কাজ কমেছে; খনিতে কম কয়লা উঠেছে অথচ তবু এসব কলকারখানার মালিকদের মুনফা তখন প্রায় শতকরা ২০০।৩০০ টাকা হিসাবে আগেকার থেকেও বেশি হয়েছে।

এদেশের কলের মালিকদের মুনাফা বরাবরই অন্য দেশের মালিকদের মুনাফার থেকে বেশি। মুনাফার শিকারের জন্যই তো দেশটা। তাই ১৯১৯-২৮পর্যন্ত এই হিসাব দেখি এরূপ।

বিটেনের	ব্যবসা	পত্রে	মালিকের	মুনাফা	ছিল	গড়ে	১০॥০%
মার্কিনের	”	”	”	”	”	”	১০·৬%
ভারতবর্ষের	”	”	”	”	”	”	১৭%

যুদ্ধ বাধলে কিন্তু এই হারের মুনাফায়ও আর দেশী মালিকের মন উঠল না। মালিকের খাতাপত্রের হিসাব থেকেও আমরা দেখি ১৯২৮এ যে কোম্পানির মোট বার্ষিক লাভ ১৷৷০ কোটি টাকা, ১৯৩৯এ (যুদ্ধের আগে) যার ভাল হয়েছে ২ কোটি টাকা, ১৯৪২এ তাদের মুনাফা দাঁড়াল ১১কোটিতে অর্থাৎ ৫০০ ভাগ বেশি, ১৯৪৩ তা হল ৭০০ পার্সেণ্ট, তারপর আর লেখা জোখা নেই।

দু একটা প্রধান শিল্পের হিসাব নিই ১৯৩৯ থেকে।

(১) রেল—প্রায় সবটা খাশ সরকারী কারবার, ১৯৩৪-৯এর ৮ বছরে তাদের মোট গ্রোস্ লাভ হয়েছিল ২৭৪ কোটি টাকা ; ১৯৩৯-৪৫ এই ৬ বছরে লাভ হয়েছে ৪৭৮ কোটি টাকা।

(২) চটকল—বারো আনাই বিলেতী মালিক। ১৯৩৯এ তাদের ১ হাজার টাকা পুঁজিতে লাভ হয়েছিল ১০৮ টাকা, ১৯৪০এ ৬৪৩৲ ; ১৯৪১এ ৬৬৭টাকা, ১৯৪২এ ৯৬৮ টাকা, ১৯৪৩এ ১ হাজার ২ টাকা! ৬ বছরে মুনাফার অঙ্ক ৯ গুণেরও বেশি বেড়েছে।

(৩) কাপড়ের কল—প্রায় বারো আনা স্বদেশী মালিকের। তারা স্বদেশীয়ানার নাম করে যুদ্ধের কাপড় জুগিয়েছে ইরানে, ইরাকে, মিশরে ; দেশের মাবোন্‌দের রেখেছে উলঙ্গ। এদের হাজার টাকায় ১৯৩৯এ মুনাফা হত ৬০৮৲ টাকা, ১৯৪০এ যুদ্ধে হঠাৎ কমল, হল ৪৪৩৲, তারপর ১৯৪১এ ১২৪৯৲, ১৯৪২এ ১৯০৪৲ টাকা ১৯৪৩ থেকে ৩,৯২১৲ তারপরে আরও বেড়ে গেল—দেশেও যখন বস্ত্রাভাব বাড়ল।

(৪) "ইঞ্জিনীয়ারিং"—এর মালিকদের মধ্যে বড়রা প্রায়ই সাহেব। তাদের ১৯৩৯ এই মুনাফা ছিল—হাজারে ৪ হাজার টাকা ১৯৪৩এ তা হয় ৯ হাজার ৬৩৭৲ টাকা। এমনি লাভ করেছে চা (বেশির ভাগই বিদেশী মালিক) কয়লা, চিনি, (বেশির ভাগ স্বদেশী মালিক)। শিল্প হিসাবে দেখলে বোঝা যায় এই ৬ বছরেই মালিকের নীট্ মুনাফার হার পাটশিল্পে হয় ৯ গুণ, বস্ত্রশিল্পে হয় ৬ গুণ, চা-এ ৩ গুণ, চিনিতে ১৷৷০ গুণ, ইঞ্জিনীয়ারিং এ ২ গুণ! মোটের উপর এসব শিল্পের নীট মুনফা ৩৷০ গুণ হয়ে যায়! উৎপাদন যখন বাড়েনি, বেড়েছে তখন তাই জিনিসের দাম জিনিসের দাম, যখন এত বাড়ল তখন দেশের সাধারণ মানুষ আর কি করে চিনি কিনবে কাপড় কিনবে? বিশেষতঃ এর ওপরে আবার চোরাকারবারীরা লেগে গেল মুনাফা লুঠতে। অনেক শিল্পপাতি নিজেরাই চোরাকারবারে নামল—বিড়লা, সিংঘনিয়া, থাপা, ইস্পাহানিদের নাম তো সবাই জানে, সাহেবদের নাম বলতে নেই। মুনাফার ব্যাপারে দেশী আর বিদেশীতে ভেদ নেই। হিন্দু মুসলমানও নেই।

এখানেই বলতে হয় বণিক ব্যবসায়ীদের কথা। চোরাকারবারে ছোট বড় মেজ সেজো এই ব্যবসায়ী বেণেরাই ঠিকাদার, আড়ৎদার, হিসাবে জোতদারদের মতো মানুষ মেরেছে, মুনাফা লুঠেছে। এই ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেশী বিদেশী শিল্পপতিরা হাত মিলিয়েছে, এরাও আবার দেশী বিদেশী শিল্পপতিদের জাতে উঠেছে,

টাকার জোরে তাদের সঙ্গে নানা ব্যাংক ফেঁদেছে, ইনসিওরেন্স কোম্পানি করেছে, খবরের কাগজ বের করেছে কারখানাও বসিয়েছে।

গত ২৫ বছরে স্বদেশী শিল্পপতি মুনাফায় মোটা হয়েছে। শিল্প বাণিজ্যের গতি এখন কোন দিকে যাচ্ছে তাই বোঝা উচিত।

প্রথম কথা: ভারতবর্ষে শিল্পের উন্নতির অবকাশ যথেষ্ট, কিন্তু শিল্পোন্নতি বেশি হয় নি! যা শিল্পোন্নতির বনিয়াদ যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা, ভারী রাসয়ানিক কারখানা—এদেশে আমরা তা মোটেই গড়িনি। কোনো কোনো মূল শিল্পে এখনো প্রায় হাতই পড়ে নি—তার মধ্যে প্রধান হল জলজ বিদ্যুতের শিল্প, বনজ শিল্প প্রভৃতি।

দ্বিতীয় কথা: খাপছাড়া ভাবে কয়েকটা শিল্প আমাদের দেশী মালিকরা হাত করেছে—যেমন, বস্ত্র শিল্প চিনি লোহার কারখানা, কয়েকটায় তারা দাঁত ফুটিয়েছে মাত্র—কয়লা, চা, চট্‌কল, ইঞ্জিনীয়ারিং রাসায়নিক, আর ব্যাংকের পুঁজির কারবারে, কিন্তু এসবের আসল শাঁস এখনো সাহেবদের সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে।

তৃতীয় কথা: এই মুনাফার বহর দেখে আমাদের দেশী রাজারা (গোয়ালিয়র, ভুপাল, ইন্দোর প্রভৃতি) শিল্পে নামছে। দ্বারভঙ্গার মহারাজা, ময়মনসিংহ, কাশিমবাজার প্রভৃতির জমিদাররাও এদিকে আস্‌ছে—একই কালে তারা হচ্ছে জমিদার শিল্পপতি পুঁজিপতি—মানে দেশের সব রকমের কায়েমি স্বার্থবান দালালরা স্বার্থ সংবন্ধে একত্র হচ্ছে।

চতুর্থ কথা: বিদেশী পুঁজিপতিরাও ইতিমধ্যেই স্বদেশী বনে যাচ্ছে, তাদের কারবারে স্বদেশী মালিকদের ছোট অংশীদার করে নিচ্ছে যেমন এণ্ড্রু ইউল এর সঙ্গে আছে মারোয়াড়ী ওঙ্কারমল জাটিয়ারা অক্টেভিয়াস মিল ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের অনেক শেয়ারের মালিক দ্বারভাঙ্গার মহারাজা; অসলার কোম্পানি বাড়াড়ী চিন্নুনীদের নিয়ে ভারতীয় কোম্পানি হচ্ছে, ম্যাক্‌লিয়ডও তা হতে যাচ্ছে। স্বদেশী মালিকের কারবারেও নিজে অংশ কিন্‌ছে, এমন কি অনেকে এখন কারবারের বেশি শেয়ার প্রায় দেশী লোকদের বিক্রী করে দিচ্ছে (টিটাগড় পেপার মিলের ও উচ্চ কলগুলোর শেয়ার আজ দেশী লোকের হাতে।) অর্থাৎ স্বদেশী মালিক ও সাহেব মালিক এক সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে—মুনাফার শিকারে সঙ্গী হচ্ছে। তাই বিড়লারা ন্যাফিল্‌ডের মোটর চালাচ্ছে হিন্দুস্থান ১০ নাম করে, অন্যেরা মার্কিন মালিকদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। তা হলে বেশ বুঝ্‌তে পারছি এসব বড় বড় দেশী মালিকের কুইট্‌ইণ্ডিয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা কি রকম—স্বদেশীয়ানা কি রকম? সাম্রাজ্যবাদের শোষণের শেয়ার পেলে তারা সাম্রাজ্যবাদকেও চালাবে স্বদেশী বলে—যেমন হিন্দুস্থান টেন চলে স্বদেশী মোটর বলে।

পঞ্চম কথাটিও খুব অর্থপূর্ণ: এসব স্বদেশী বিদেশী কত মালিক আমরা দেখি কিন্তু আসলে আমরা জানি না যে দেশের বড় বড় কারখানা অল্প কয়েকটি বড় বড় মালিক চক্রের হাতে চলে গিয়েছে, আর সেই সব মালিক চক্রও আসলে হচ্ছে পুঁজিপতি-চক্র—ব্যাংক, বীমা-কোম্পানী, প্রভৃতি পুঁজি লগ্নীর মালিক। যেমন ধরো যুদ্ধের আগে বড় মালিক চক্র ছিল এণ্ড্রু ইয়ুল, শ' ওয়ালেস্‌, জার্ডিন স্কিনার, ডানকান ব্রাদার্স। দেশীদের মধ্যে টাটা, বিড়লা, মার্টিন, ডালমিয়া কোম্পানি, জে, কে, ইণ্ডাস্ট্রিজ ও ইস্পাহানিরা তখনো উঠ্‌ছিল। ৩০টি এরূপ চক্রে ৮০০টি প্রধান কারখানা, খনি, চা-বাগানের কর্তা হয়েছিল। আরও মজা। ৭৫ জন মালিক আসল কোম্পানিগুলির ১ হাজার ডিরেক্‌টারি ভাগজোখ করে নিত। তারও

মধ্যে আবার ১৫ জনই ৬০০ ডিরেক্টরি করে। এই ১৫ জন ও এই বড় বড় মালিকরা আসলে হচ্ছে ব্যাংক ইনসিওরেন্স কোম্পানি প্রভৃতিরও কর্তা,—সেই সব পুঁজি মালিকানার জোরেই তারা শিল্প কলের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠেছে।

এই সব ব্যাংক ইনসিওরেন্স কোম্পানি কাদের? বাঙলা দেশের গলিতে গলিতে আমরা ব্যাংক দেখে যেন ভুল না করি। ভারতবর্ষের বড় বড় ব্যাংক বা পুঁজির মালিক প্রায় বারো আনাই সাহেব, সাম্রাজ্যবাদ তা দিয়েই তো রক্ত শুষে খায়। এবার যুদ্ধের সুযোগে দেশী মালিকেরা মানুষ মারা টাকায় কয়েকটা বড় ব্যাংক ও ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট করেছে, তাতে এখন হয়ত ৬ আনা পুঁজির মালিকানা স্বদেশী মালিকদের হাতে আসছে। বলা বাহুল্য এসব ব্যাংকেও বাঙালী মালিকের কোনো ঠাঁই নেই। তাহলে বিলিতী সাহেব আর স্বদেশী ভাইরা এক সঙ্গে মিশেছেন, এমন কি বড় বড় ব্যাংকগুলোতে ইস্পাহানি আদমজী আর বিড়লা গোয়েঙ্কা এক সঙ্গে বসেই মুনাফা তোলেন।

শ্রমিক

শিল্পের যা মুনাফা বা লাভ অধিকাংশ শিল্পজীবী আজ তা চোখেও দেখে না; শতকরা সাড়ে ৯৯ জন বা ৯৯ জন আধুনিক শিল্পের শিল্পজীবী হচ্ছে শ্রমিক, তাদেরই পরিশ্রমে মুনাফা সৃষ্টি হয়। শ্রমিকের এই শ্রমের যে মূল্য থেকে শ্রমিক বঞ্চিত হয় তারই নাম মালিকের মুনাফা।

দেশে যখন লক্ষ লক্ষ ভূমিহারা গরীব বেকার কাজের খোঁজে ঘুরে মরছে, মালিকদের পক্ষে তখন তাদের শোষণ ও বঞ্চনা করারও সুবিধা বেশি। নাম মাত্র মজুরীতেই তারা শ্রমিকদের যত খুশি খাটাতে পারে। আবার কলের মুনাফা যত বেশি হোক শ্রমিকদের তার থেকে কিছু দিতে হয় না। কিন্তু বাজার খারাপ বলে মুনাফা কম হলে শ্রমিকদের ছাঁটাই করতে মজুরী কাটতে নানা ভাবে এদের পিসে মারতে মালিকের কোনো বাধা নেই।

১৯৩০-৮ পর্যন্ত ব্যবসা মন্দ চলে; তখন থেকে শ্রমিকের 'রুজির' অঙ্কটা দেখলে এ সত্যটা বুঝবে।

বোম্বাইর কাপড়ের কলে ১৯৩০এ ছিল শ্রমিকের ৫৪৲ টাকা রুজি ১৯৩৪এ তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৫৲ টাকায়—কারণ বাজার মন্দা।

টাটার লৌহকারখানায় বেতন বেশি—সেখানে সাধারণ মেয়ে মজুরের মাসে বেতন হত তখন ১৩৷৶০; পুরুষদের ১৭৷০; আর ওস্তাদ ফিটারের বেতন মিলত মাসে ৬৪৷/০।

কয়লার খনিতে ঝরিয়ায়ই ভালো মজুরী। ১৯৩৬এ খনির নিচেকার মেয়ে মজুরের দৈনিক মজুরী ছিল ।/৫ পাই; আর ওস্তাদ পুরুষ মজুরের মজুরী ॥/৯ পাই। এ বেতন পরে আরও কমে। ১৯৩৮এ সরকারী রিপোর্টে দেখি অদক্ষ মামলী মজুর 'হপ্তা' পাচ্ছে ২৶৪ ও মেয়ে মজুর 'হপ্তা' পাচ্ছে ১৷/২ পাই, গড়ে মজুরের হপ্তা ছিল ২৷৶০ (দৈনিক আয় তাহলে ।/১০ মত)।

চা-বাগানের অবস্থা বরাবরই সঙ্গিন: ১৯২১ সালে সে বেতন ছিল মাসে ৮৲, ১৯২৯এ তা ১৩৲ টাকায় ওঠে। কিন্তু তারপরে কমে। ১৯৩৬এ দেখি কাছাড়ের চা-বাগানে পুরুষের মাসিক বেতন প্রায় ৫৸০ আনা; মেয়েদের ৪৷/০ আনা; বালকদের ২৸/৭পাই।

মোটামুটি এই ১৯৩০-৮র মধ্যে শ্রমিকের "আসল তলব," ৬০ বৎসর আগে—১৮৮০র পরে—যা "আসল তলব" ছিল তার থেকেও বেশি কমানো হয়। অথচ এ সময়ে মেহনতের তোড় বেড়ে যায়, মালও অনেক বেশি তৈরী হয়।

শ্রমিকেরা তাহলে করে কি? নানা ভাবে সুদখোর কাবুলিয়ালা ও ক্ষুদে মহাজনদের থেকে ধার করে, বারো আনা শ্রমিকেরই এই দশা। সুদের হার হত প্রায়ই মাসে ১ টাকায় এক আনা, বৎসরে শতকরা ৭৫ টাকা। কাজেই খাওয়াপরা আরও কমাতে হয়। জেলের কয়েদিও তার থেকে ভালো খায়। কলে কাজ না করে চুরি করলেই বরং এদেশের শ্রমিক ভালো খেতে পারে।

এ অবস্থায় তা হলে শ্রমিকরা বাঁচে কি করে? আবার সেই পুরনো উত্তরই মনে করতে হবে—বাঁচে না, মরে। মুনাফার শিকার আসলে মানুষ শিকার ছাড়া কিছু নয়। পেটে ভাত নেই, জন্তু জানোয়ারের মত বস্তিতে লাইনে বাস, পৃথিবীর এমন পচা নরক আর নেই এমন রোগ-জর্জর মানুষ আর নেই, তবু মুনাফার শিকারে মালিক মজুরী কাটে, যখন খুশি ছাঁটাই চালায়! কাজের সময় বাড়ায়, নতুন কল বসিয়ে খাটুনির তোড় বাড়ায়,—ফলে এ দেশের কলে সব চেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু মজুরের সে জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করা প্রায়ই অসম্ভব হয়। তার ওপরে শ্রমিকের চাকরি কিছুতেই পাকা হবে না, কাজের ঘণ্টা কম্‌বে না, চাকরিতে গ্রেড হবে না, যত বছর কাজ হোক্ মজুরী বাড়বে না, স্বাস্থ্যের জন্য বাসগৃহের জন্য বন্দোবস্ত হবে না, মেয়ে মজুরের প্রসবকালীন ছুটি ও ভাতা সহজে মিল্‌বে না, অসুখ হলে কারও উপায় নেই, বুড়ো বয়সের বা অক্ষমতার সময়ে পথ নেই, মরতে বসলেও আসলে কেউ ওষুধ পায় না, ডাক্তার পায় না, ছুটিতো পায়ই না। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড মজুর বস্তীতে লেগেই থাক্‌বে; ম্যালেরিয়া, আমশায় তারা ভুগবে, যক্ষায় তাদের ধরবে, তাদের বাচ্চাগুলো জন্মাতে না জন্মাতে মরবে; দুধের অভাবে, খাদ্যের অভাবে তারা টিং টিং-এ রিকেটি হবে; তাদের আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মজুর-রা যাবে কাজে;—তারও পরে আছে ম্যানেজারের লাথি, পুলিশের লাঠি; মেয়ে-পুরুষের দেহের রক্তে তবু তৈরী হবে মুনাফার সোনার পাহাড়, আর পাশেই জমে শ্রমিকের হাড়ের পাহাড়। কারখানায় পাশেই কি আমরা অনেকখানে দেখি না মালিকের, ম্যানেজারের কুঠি, বাগান, আর অন্যদিকে মজুরের বস্তি—খাটালের মত যা ময়লায় নর্দামায়, কাদায়, নোংরায় ধোঁয়ায় তলিয়ে আছে?

তা বলে ভুলে যেন না যাই সরকারী কাগজপত্রে শ্রমিকের জন্য ভালো ভালো আইন কানুন আছে; সরকারী তদারক কর্মচারী আছে, মোটা মাইনের জোরে কমিশনার আছে, তার সহকারী আছে, ডজনে ডজনে; ফ্যাক্‌টরি ইন্‌স্পেক্‌টর আছে; শ্রমিকের ক্ষয় ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের আইন আছে, আদালত আছে; স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার কথাও আছে; বাসস্থানের কথাও হয়, খাটুনি কমাবার কথাও ওঠে। আর মালিকেরই শ্রমিক-দরদ কম? তারা খাতাপত্র খুলে দেখাবে—তারা এজন্য বড় মাইনের শ্রমিকহিতৈষী (ওয়েলফেয়ার অফিসার) কর্মচারী রেখেছে; কিছু কিছু শ্রমিকদের জন্য নিজেদের শ্রমিকবস্তি তৈরী করেছে, কিংবা সে প্ল্যান করেছে; মজুরের জন্য কোথাও বা কুস্তির আখড়া করেছে; খেলার মাঠ করেছে; হয়ত ক্লাব বসিয়েছে; তাতে হয়ত রেডিও আছে, থিয়েটর জলসা হয়; হাসপাতাল আছে, তাতে ডাক্তার ও ঔষধপত্রও রয়েছে, এমন কি শ্রমিকের ছেলের জন্য দু একখানা পাঠশালা ও স্কুল বসিয়েছে, মিলের কাছাকাছি দোকান-পশরার

বন্দোবস্ত করেছে—অবশ্য নিকটেই দেখব মিলেরই পোষা লোকের তাড়িখানা আছে, পেটোয়া সর্দার গুপ্তচররা দোকান ফেঁদে বসেছে। যাই হোক্, কোন শ্রমিকের এ দশা, জিজ্ঞাসা করলেই শুনব—"ওরা অশিক্ষিত, ছোটলোক। সুখে থাকতে চায় না, স্বাস্থ্যের কথা বোঝে না; নোংরা থাকা ওদের অভ্যাস; ভালো কোয়ার্টার দিলেও ভাড়া দিয়ে নেয় না, সস্তা বস্তিতে থাকে; হপ্তা নিয়েই ওরা ঢোকে তাড়িখানায়, মেয়ে-পুরুষ হল্লা করে, রোজ কামাই করে, খাটতে চায় না, দেশে পালিয়ে যায় দুদিন পরে; কাজে ফাঁকি দেয়, তাই ওদের তলব কাটা যায়—এক কথায়, নিতান্ত দায়ে পড়েই মালিককে তার কারখানা বজায় রাখতে হয়েছে,—শুধু 'দেশের স্বার্থে।' তার ওপরে নানা রকমের বদ্‌মায়েস লোকের কুবুদ্ধিতে ওরা করে ধর্মঘট!"

ধর্মঘট! আজ তো দেশের চারিদিকেই ধর্মঘট! গান্ধীজী ধর্মঘটে আপত্তি করেছেন; জিন্না সাহেবও বল্‌ছেন...এ সব ঠিক হচ্ছে না। জওহরলালজী বল্‌ছেন, শ্রমিকদের বোঝা উচিত 'দেশের স্বার্থ' আগে। কংগ্রেসের শ্রমিক মন্ত্রী নন্দা বোম্বাইতে শ্রমিকদের শাসাচ্ছেন, অমলনেরে গুলি চালিয়ে মারছেন ৬ জন শ্রমিককে; মান্দ্রাজের প্রধান মন্ত্রী প্রকাশম ৪০টি ধর্মঘটী গ্রেফ্‌তার করেছেন, ইউনিয়ন অফিস ভাঙছেন; গুলি চালিয়ে মেরেছেন ৬ জন রেলশ্রমিককে, উড়িষ্যার মন্ত্রীরা ধর্মঘট বে-আইনী করার পক্ষপাতী। ইউ-পির শ্রমিক মন্ত্রী কাটজু জেলায় জেলায় সাহেব কর্তাদের বলেছেন ডাকধর্মঘটের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে; প্রধান মন্ত্রী লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসী সদস্যকেও ধর্মঘটে উস্কানি দেবার জন্য গ্রেফ্‌তার করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরাই এতদিন ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর লাঠি চালাত, মাঝে-মাঝে বন্দুকও ব্যবহার করত। বিড়লাজীর পক্ষে গোয়ালীয়রে দেশী রাজারা গুলি চালিয়েছে; কলকাতার পুলিশও বিড়লাজীর পক্ষে কেশোরামের গেটে লাঠি চালায়, নারায়ণ গঞ্জে ঢাকেশ্বরীর দুয়ারে "স্বদেশী মালিকের" সপক্ষে গুলি চালিয়ে সেদিনও পুলিশ মারল ৬ জন শ্রমিক নেতাকে। আজও কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বে সেই বন্দুকই রাজত্ব করছে...অমলনেরে, গোল্‌ডেন রকে... ধর্মঘট দমন করতেই হবে। সাম্রাজ্যবাদী চায় না, জাতীয়তাবাদী চায় না, সাম্প্রদায়িকতাবাদী চায় না—তবুও ধর্মঘট, তবু ধর্মঘট; তবু ধর্মঘট!

যুদ্ধের পরে এই এক বৎসর এই হল শ্রমিক জগতের অবস্থা—ধর্ম-ঘট।

কিন্তু যুদ্ধের মুনাফা ও যুদ্ধের মজুরী কেন এমন হল? প্রথমত যুদ্ধের আগে শ্রমিকদের মজুরী ও আসল তলবের অবস্থা আমরাও দেখেছি। দ্বিতীয়ত যুদ্ধে মালিকদের মুনাফার বহর যে ২গুণ ৩গুণ থেকে ৯ গুণ ওঠে তাও দেখেছি। আজ মুনাফার সে বহর রয়েছে, কিন্তু তার উপর ট্যাক্‌স নেই, তাও জেনেছি। তৃতীয়তঃ যুদ্ধকালে ১৲ টাকার জিনিষ যে ৩৲ টাকা হল। (কোল্‌কাতায় সূচক দর ১০০ তখন বোধ হয় ২৮৯ বোম্বায়েতে ২৩০, কানপুরে ৩০৬), তা আমরা সবাই জানি, এখনও যে সেই চড়া দামই চলছে, তাও দেখি। এখনো জিজ্ঞাসা করতে পারি...সেই ১৯৩৯এর খেতে-না-পাওয়া শ্রমিকের তলব যুদ্ধকালে বেড়েছিল কি হারে? এখনই বা তার রুজি রুটির অবস্থা কি? প্রথম কথা, যুদ্ধকালে প্রায় কোনো শিল্পেই শ্রমিকের "মূল বেতন" বাড়েনি; নগদ তনখা বেড়েছিল, কারণ তখন আরো মাগ্‌গি ভাতা পেত, সস্তা রেশন পেত, দু'একখানা 'যুদ্ধ বোনাস' বা 'যুদ্ধ ভাতা' পেত। মোটামুটি বিপদ বেশী বলে ডাকের রেলের ও লোহার কারখানায় মজুরদেরই এ সব সামরিক সুবিধা বেশি জুটেছিল। মাগ্‌গি ভাতা মোটামুটি বেশি পেয়েছে রেলের শ্রমিকেরাই। তবু ১৲টাকার জিনিষ যখন ৩৲ টাকা মাগ্‌গি হল, রেলের শ্রমিকেরা মাগ্‌গি ভাতা

বাবদ তখন টাকায় মোট ।০ আনাও পায় নি। তবু যে শ্রমিকেরা যুদ্ধকালে বেঁচে রইল তার কারণ তারা তখন সস্তা রেশন পেত, চোরা-কারবারীর কবলে পড়েনি, তাই টিকে রইল। 'মূল বেতন' কারো বাড়েনি; এমন কি সমস্ত ভাতা কুড়িয়ে-কাড়িয়েও তাদের 'আসল বেতন' জিনিষ পত্রের মাগ্‌গি দামের তুলনায় সর্বত্রই কম রয়ে গেল। এখনো তাই রয়েছে। ''নয়া দিল্লীতে" এই এপ্রিলের প্রথম দিকে একটি সরকারী খাদ্য প্রদর্শনী হচ্ছিল, ''শ্রমিকদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্যের নমুনাও" তাতে ছিল। বিলাতের শ্রমিকনেতা রজনী পামদত্ত তা দেখতে গিয়ে জানতে চাইলেন, দিল্লীর ১জন শ্রমিক তার স্ত্রী ও ৩টি ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরূপ অবস্থায় ''আবশ্যকীয় ন্যূনতম খাদ্য" খেলে তার মাসিক খাই-খরচ কত পড়বে। হিসাব করে সরকারী কর্মচারীরা জানালে...১৩০৲। পামদত্ত বলছেন, বিড়লাজীদের ''দিল্লীর কাপড়ের কলের ১জন ওস্তাদ শ্রমিক দিল্লীতে যুদ্ধকালীন ভাতা প্রভৃতি নিয়ে খুব বেশি রুজি করলেও রুজি করেন মাসে মোট ৬০৲ টাকা। অদক্ষ শ্রমিক ৩০৲ টাকার মত পান; কেউ আবার গড়ে ২০৲ টাকাও পান।" তা হলে শ্রমিকের মজুরী না বাড়ালে সে বাঁচবে কি করে ?

কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতেই কি হল ?...মালিকেরা অতিরিক্ত মুনাফাকর থেকে এখন রেহাই পেয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে তারা 'যুদ্ধভাতা' বন্ধ করেছে; রেশন কমানো হয়েছে, সস্তা রেশন বন্ধ হয়েছে; 'মাগ্‌গী ভাতা' কাটার চেষ্টা চল্‌ছে; নানা ফিকিরে হপ্তার 'তন্‌খা' কাটছে; প্রতিশ্রুতি-দেওয়া বোনাস্ আটকে রাখছে তা থেকে ঠকাবার জন্য পাকা শ্রমিকদের অস্থায়ী (''বদলী") শ্রমিক করে দিচ্ছে; টাইমের গোলমাল করেছে (আগষ্টমাস থেকে সরকারী নিয়মে হপ্তা হয়েছে ৪৮ ঘণ্টা, বিলাতে অবশ্য তা ৪০ ঘণ্টা, তাই এক ঘণ্টার মজুরী মালিকেরা বন্ধ করতে চায়,) 'ওভারটাইমের' জবরদস্তিও তারা করেছে : এমন কি, পুরনো দিনের গালিগালাজ, মারধোর, জোর-জুলুমও সমানে চলেছে...আর সব চেয়ে বেশি চলেছে ছাঁটাই।... এই দুর্দিনে তাই শ্রমিকও আর বাঁচবার পথ দেখে না; মরীয়া হয়ে সেও রুখতে চায়, মালিকের এই আক্রমণ; সেও বাঁচবার চেষ্টা করে। এই বাঁচবার পথ সে বুঝেছে সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন; আর সে বুঝেছে তার শেষ হাতিয়ার ধর্মঘট। শ্রমিকের রুজির লড়াই ও রুটির লড়হেয়ের এই হল একমাত্র উপায়, ট্রেডইউনিয়ন ও ধর্মঘট। আর এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই শ্রমিক আবার বুঝতে পারছে এই মুনাফার শিকার বন্ধ করতে হলে এই রাক্ষুসে শাসনই শেষ করতে হবে, শ্রমিকের রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে করতে হবে, আর তার জন্য গড়তে হবে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি।

কেন বুঝবে না ? শ্রমিক কি ক্ষুধা পেলেও ক্ষুধা বুঝ্‌বে না ? না, চোখে দেখেও দেখ্‌তে পায় না... তার তৈরী মালে মুনাফা হচ্ছে। অন্তত যে কারখানায় যে-কাজ করে সে-কারখানায় খবরও তো সে পায়;... মালিকদের দেখে, দেখে তাদের সোনার পাহাড়, মুনাফার বহর।

প্রধান প্রধান শিল্পগুলির এই ক বছরের মুনাফাখোরীর কথা মনে রেখে তাদের শ্রমিকের যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরেকার অবস্থার তুলনা করলে আমরা তা দেখতে পারি।

(১) বাঙলার চটকলের মুনাফা হয়েছে শতকরা ৯০০ হিসাবে।

আর চটকলের আধা-দক্ষ শ্রমিকের মাসে রুজি হচ্ছে ৩৫৲, অ-দক্ষদের রুজি ২০৲ টাকারও কম। মাগ্‌গিভাতা সবাই পায় ৮৲ টাকা—এমনি অবস্থা সোয়া তিন লক্ষ শ্রমিকের।

(২) কাপড়ের কলের মুনাফা হয়েছে শতকরা ৬০০ হিসাবে।

(৩) লৌহ ইস্পাতের কারখানায় গড়ে লাভ শতকরা ২০০ হিসাবে। টাটার কারখানায় মজুর সব চেয়ে বেশি মজুরী ও বোনাস পায়। গড়ে শ্রমিকদের সেখানে মাসিক আয় ৩৫৷৵০ ; শতকরা ২৪ জনের শ্রমিকের আয় অবশ্য মাসে ১৫৲-২০৲ ; আরও ২৫ জনের ১৫৲-২০৲।

(৪) খনির মালিকের লাভ হয়েছে শতকরা ৩২৫ হিসাবে। খনির মজুরের ভাতা শুদ্ধ গড়ে আয় হয় মাসে ৩৭৲ টাকা, খাটুনি তার ৯ ঘণ্টা। আর তার জীবন তো পশুর জীবন।—২ লক্ষ শ্রমিকের এই অবস্থা।

(৫) চা-বাগানে মালিকদের লাভ হয়েছে শতকরা ৩০০ হিসাবে। ভালো চা-বাগানেই পুরুষ মজুরের মাসে বেতন ১২৲ ; মেয়েদের ৯৸০ আনা, বালকদের ৪৷৵০ ; পুরুষ ও মেয়েরা সস্তা রেশন বাবদ পেত ১৸০ আনা।

(৬) রেলের মোট মুনাফা হয়েছিল ৫৮৮ কোটি টাকা। বড় মাইনের বড় সাহেবদের ছেড়ে দিলে তার ৩ লক্ষ গরীব শ্রমিকের মাইনে ১৬৲ টাকারও কম, তা ছাড়া দক্ষ কারিগরদের মাইনে ২০৲-২৮৲ টাকা ; জুনিয়র কেরানীর মাইনে ৩০৲-৬০৲ টাকা।

(৭) ডাক বিভাগের লাভ ১৯২৯ এ ছিল ১৯ লক্ষ, ১৯৪৫ এ তার লাভ হয় ১০ কোটি টাকা। আর 'বড় সাহেবদের' বেতন ছেড়ে দিলে কলকাতায় কেরাণীর মূল বেতন হয় ৫৫৲, হরকরার ২৪৲ টাকা, প্যাকারের ১৬৲ ; মফঃস্বলে কেরাণীর ৩৫৲, হরকরার ১৮৲ ; প্যাকারের ১৪৲, এক্‌সট্রা ডিপার্টমেণ্টাল গ্রামের ডাকঘরের পোষ্ট-মাষ্টারদের মাইনে ১০৲।১২৲ টাকাই আছে।

তাই তো দেশের শ্রমিকের সঙ্গে আজ ধর্মঘটের পথে এসে দাঁড়াল হাজার হাজার কেরাণী, কর্মচারী, মাঝারি অবস্থার মিস্ত্রি, কারিগর—দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বড় অংশ! দেশের নেতারা আপত্তি করছেন কিন্তু দেশের গরীবেরা আজ শোষণ সইতে আর রাজী নয়।

মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী

দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যারা গরীব ও মাঝারি অবস্থার তারাও বিদ্রোহ করছেন। এ খুবই স্বাভাবিক—পাঠশালার ইস্কুলের মাষ্টার, ব্যাংকের, ইনসিওরেন্স কোম্পানীর, সওদাগরী আপিসের, এমন কি সরকারী আপিসের কেরানী—এদের সংসার চলাতো দূরের কথা, প্রাণই রাখা দায়। বাঁচতে হলে বিদ্রোহ এদের করতেই হবে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরাই এদেশে শিক্ষিত। তারাই "বুদ্ধিজীবী"—তারাই বরঞ্চ সরকারী দপ্তর চালায়। তারাই আবার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন তৈরী করছে। নিজেদের "ভদ্রলোকী" গুমরে তারা এতদিন শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনকে তবু বিশ্বাস করত না। আজ যে এই বুদ্ধিজীবীদের চক্ষু খুলছে, তার কারণ যুদ্ধে তাদের মধ্যবিত্তদের অনেকেরই একেবারে বনিয়াদ ধসে পড়েছে। যুদ্ধের ওস্তাদ কারিগর, টেকনিশিয়ান হিসাবে তাদের অনেকে শ্রমিক শ্রেণীর কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে। আর যুদ্ধ থামতেই হাজারে হাজারে এসব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেরাণী, কারিগর, কর্মচারী এখন বেকার হয়ে পড়েছে। ইম্পীরিয়াল ব্যাংকের কেরাণীরা ধর্মঘট করে তাই লেখে এই প্রচারপত্র :

"ব্যাংকের বার্ষিক খরচ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর......৪ লাখ টাকা......ভগবান্
সেক্রেটারি ট্রেজরার......১ লাখ ,, ...অতিমানব
অফিসার পিছু ......২৫ হাজার ,, ...ভদ্রলোক
কেরাণী পিছু ......১ হাজার ,, ...পশু
চাপরাশি পিছু ......৪ শত ,, ...পতঙ্গ'

চোখের সাম্‌নে এই "ভগবানদের" লীলাখেলা দেখেও 'পশু' ও 'পতঙ্গদের' কি চেতনা হয় না?

হস্তি পিপিলিকার কথা

আশ্চর্য ব্যাপার এই—এ দেশের সরকারী আফিসের উঁচু বেতনের আর নীচু বেতনের যে তফাৎ তত বড় তফাৎ আর পৃথিবীতে অন্য কোথাও নেই। লাট-বেলাটদের মাইনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের থেকেও বেশি। অন্য রকম একটা হিসাব ধরি:

ব্রিটেনে নিম্নতম শ্রমিকের বেতন ১৲ টাকা হলে উচ্চতম কেরাণী পায় ৩০৲
ভারতবর্ষে ,, ,, ১৲ ... ... কেরাণী ,, ২৪০৲

ব্রিটেনে নিম্নতম কেরাণী ১৲ পেলে উচ্চতম কর্তৃপক্ষ পায় ৩২৲
ভারতবর্ষে ,, ,, ১৲ .... ১৩৩৲

এরূপ পার্থক্যের কারণ অবশ্য আমরা জানি—সাম্রাজ্যবাদ এদেশ শাসন করে এক আমলাতন্ত্রের বা নোকরশাহীর মারফতে। বড় আমলাদের দাপট তাই এদেশে বেশি। লুঠের অংশও তারা পায়।—তারাই হল রাক্ষুসে শাসনের ডালকুত্তা। মানুষ শিকারের মেশিন। তাদের চোখে তাদের সহযোগী কেরাণী চাপরাশি সত্যই পশু ও পতঙ্গ।

কিন্তু এই নোকরশাহী লুঠ ও দাপট দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানদেরও পেয়ে বসে, এমন কি দেশের কৃতী সন্তানদেরও লোভ থাকে ওরকম পদ ও প্রতিষ্ঠায়, আর ও রকম উপেক্ষা থাকে তাদেরই সহকর্মী গরীব কেরাণী ও নিম্ন কর্মচারীদের উপর। এই তো বিহারে পিয়াদারা এই দুর্মূল্যের দিনে ৪০৲ টাকা মাইনে চাইতে, কেরাণীরা ৬০৲-১০০৲ বেতন চাইতে আমাদের দেশী মন্ত্রীরা ক্ষেপে গেলেন। অথচ দুর্মূল্যতারই জন্য নিজেদের মাইনে ৫০০৲ থেকে ১,৫০০৲ না করলে এই মন্ত্রীদেরই চলে না! গরীবের বন্ধু গান্ধীজীও মন্ত্রীদের এ নীতি সমর্থন করলেন। তিনি বল্‌লেন কারণ, পিঁপড়ের আর হাতীর খোরাক তো সমান নয়। এতদিন শাদা নোকরশাহীকেই আমরা জানতাম "হাতী", আর নিজেদের ভাবতাম হয়ত পশু-পাখী, কিন্তু এবার শুনছি আমাদের নেতারাও "হাতী" জাতীয়, আর আমাদের গরীবেরা—কাজের বেলা হয়ত পশুই, খাদ্যের বেলা পিঁপড়ে। মুনাফাবাদের সমর্থন করতে গেলে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিরও এমনি বুদ্ধির বিকৃতি ঘটে। যারা দেশের আসল মানুষ—যারা জমি চষে, যারা হাতুড়ি পেটে, যারা কলম পেষে,—তারা আর মানুষ বলেই গণ্য নয়,—তারা "পিঁপড়ে," আর নেতারা "হাতী"। যাদের পরিশ্রমে তৈরী হয় সাম্রাজ্যবাদের সোনার পাহাড়, দেশী মালিকের রূপোর পাহাড়, "নোকরশাহীর" বদলে "দালালশাহী" এলেই বা তাদের কি? তাদের হাড়েই তখনো উঁচু হয়ে উঠ্‌বে হাড়ের পাহাড়।

সোনার ভারত যে শ্মশান এর পরে তা কি বুঝতে বাকী থাকে?—ক্ষেতে আর সোনার ফসল ফলে না,

মজুর-কারিগরের হাতে আর কাজ জোটে না,—কল যাচ্ছে ক্ষয় হয়ে, কারখানা রয়েছে থেমে; আর বুদ্ধিজীবিদের বুদ্ধি রয়েছে চোখ বুজে, ডানা গুটিয়ে। তবু কি সংশয় আছে—রাক্ষস আসে নি দেশে?

অথচ সত্যই সোনার দেশ আমাদের। আবার ভাবি—কত বিশাল আমাদের দেশ! কত সম্পদ তার বনে নদীতে পাহাড়ে খনিতে। কত বিরাট আমাদের জন শক্তি, আর কত অফুরন্ত তাই আমাদের শ্রমশক্তি। এখনো এ দেশ 'আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।' কিন্তু মুনাফা শিকার না থাম্‌লে এই মানুষ-শিকার শেষ হবে না, এ দেশ শ্মশানই হবে। আমরা দেখছি নাকি—দেশের মানুষের রুজি নেই, রুটি নেই, কাপড় নেই, ঘর নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, আয়ু নেই, প্রাণ নেই! ধান জন্মে, গম ফলে, মুনাফার চোরা-কারবারীর হাত ভরে উঠে কোটি কোটি টাকায়,—আর চাষী মরে অনাহারে পথের পাশে। পাট জন্মে, আখ জন্মে, চটকলের মুনাফা বাড়ে, কলের মজুর ছাঁটাই হয়, আর পাট-চাষী আখ-চাষী মরে শুকিয়ে। চা-এ কোটি কোটি টাকা লাভ হয়, কিন্তু চায়ের কুলি মরে গোলামি করে। কাপড়ের কলের আয় বাড়ে, তার শ্রমিক মরে মুখে রক্ত ওঠে। কয়লার মালিকের মুনাফা বাড়ে, ইঞ্জিনীয়ারিংএর মালিক ফেঁপে ওঠে; কিন্তু দেশের কল বাড়ে না, কারখানা বাড়ে না,—বাড়ে দুর্ভিক্ষ, বাড়ে মৃত্যু, বাড়ে মহামারী।—এমনি এই রাক্ষুসে শাসনের ফাঁস!

সোনার ভারতের শতকরা ৯৫ জনই মরে গোলামি ও গরীবীতে—এই রাক্ষুসে শাসনের ফাঁস গলায় পরে। কিন্তু বাকী ৫জন বাঁচে সেই ফাঁসির দড়ি পাকিয়ে, আর সাম্রাজ্যবাদীর দালালি করে। তাদের অনেককেই আমরা চিনেছি—কিন্তু "শয়তানী শাসনের" সকল চরদের আমরা তবু চিনে উঠতে পারি নি। আমরা দেখি—সাম্রাজ্যবাদের খাশ চর হল তার সৈন্য আর নোকরশাহী; এরাই তার প্রথম বাহিনী। তার দ্বিতীয় বাহিনী হল "দেশী রাজারা"; তৃতীয় বাহিনী জমিদার মহাজন প্রভৃতি অন্য "কায়েমি স্বার্থ।" চতুর্থ বাহিনী তৈরী হচ্ছে আমাদের দেশী পুঁজিদার ও মুনাফাখোরদের সঙ্গে বিলিতী পুঁজিদার ও মালিকদের মিলন ঘটিয়ে। কিন্তু "পঞ্চম বাহিনী?"—তাদের আমরা এখনো চিনি না—তারা আছে আমাদের মধ্যেই মিশে—তারা হল "ধর্মের দালাল।" তারাই ভাইএর বিরুদ্ধে ভাইকে লাগায়, গরীবের মনে বিষ ঢেলে দেয় গরীব ভাইয়ের বিরুদ্ধে; আর রাক্ষুসে শাসনকে করে পাকা, গরীবি আর গোলামীকে করে কায়েম, দেশে টেনে আনে মনুষ্যত্বের মড়ক।

কিন্তু রূপকথার রাক্ষসেরও প্রাণকৌটোর খোঁজ মিলে যায় শেষ পর্যন্ত। আর শেষ পর্যন্ত আসে সেই রাজপুত্র—এক ডুবে যে গোপন কৌটো তুলে আনে, টেনে বের করে রাক্ষসের সেই প্রাণের ভোমরা। আর তার পরে?—জেগে ওঠে সোনার রাজ্যের ঘুমন্ত মানুষ।

সে রাজপুত্র কি সোনার ভারতে আসে নি? আমরা কি দেখি নি এ কালের সেই রাজপুত্রকে। পক্ষিরাজের পিঠে নয়, তিন ঝাণ্ডার তলে চলেছে সে—হাতুড়ী হাতে, কাস্তে হাতে, কলমও তার সাথী—খোঁজ পেয়েছে সে কোন্ সমুদ্রের তলে লুকুনো রয়েছে এই রাক্ষসের প্রাণ। সেই জন-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমাদের সেই বিপ্লবী রাজকুমার—এক ডুবে সে তুলবে এবার সেই গোলামীর কৌটো, ছিঁড়বে গরীবীর ভোম্‌রা—আর তারপর?—

চল্লিশ কোটি মড়ার দেশে ফুটে উঠ্‌বে চল্লিশ কোটি প্রাণ।—সোনার দেশে জীইয়ে উঠবে সোনার মানুষ!

গোপাল হালদার